Written strictly in accordance with the New Syllabi approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, for Class X of Multipurpose and Higher Secondary Schools of West Bengal. [Vide Circular No. HS/1/58 dated the 7th March, 1958 and No. HS/6/59 dated 25. 7. 59]

ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড : মধ্যযুগ

MEDIEVAL INDIAN HISTORY

• •

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, এম. এ., এল. এল. বি.,
পি.আর.এস, ডি. লিট্, শাস্ত্রী, গ্রিফিথ স্কলার, মোয়াট গোল্ড মেডালিস্ট,
স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডালিস্ট, মিশর রাজকীয় কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক, Ghosh Travelling Fellow to
Egypt, Iran and Afghanistan কলিকাতা বিশ্ব
বিদ্যালয়ের ইস্‌লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক
প্রণীত

প্রকাশ মন্দির
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬নং কলেজ রো : কলিকাতা-৯

প্রকাশ মন্দির হইতে শ্রীসুশীলকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ—১৯৫৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৫৯

তৃতীয় মুদ্রণ—১৯৬০

মূল্য: তিন টাকা চুরানব্বই নয়া পয়সা মাত্র।

কাত্যায়নী মেশিন প্রেস, ৩৭।১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬
হইতে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION

WEST BENGAL.

HIGHER SECONDARY COURSE

History of India (1206—1757 A. D.)

History of Marathas up to 1761 A. D.

For Class X

CHAPTER XII

Establishment of the Sultanate at Delhi—Kutubuddin—Iltutmish—his contribution to the development of the Sultanate—fiction of Khilafat. Mongol invasion (1221 A. D.). Nobility versus the State. Raziyya.

Balban's measures against the Turkish nobles—tackling of the internal troubles and the Mongol menace. Tughril's rebellion in Bengal—Bughra Khan's Governorship of Bengal. Balban's contribution to the Sultanate.

CHAPTER XIII

Balban's weak successors up to Jalaluddin Firuz Khalji. Early career of Alauddin. The problems of State—Turks, Rajputs, Mongols, Nobles. The Deccan Campaigns of Malik Kafur. Alauddin's economic measures—revenue policy—price control. The conception of secular sovereignty in a theological age. Nature of Khalji imperialism. Historian Barni, poet Amir Khusrau and saint Nijamuddin Aulia.

The Tughluq Dynasty comes in on the crest of reaction of the Nobility. Muhammad Bin Tughluq—his intellectual attainments—a bundle of contradictions (?)—Logical measures but impatient and incompetent execution. Rebellions. Ibn Batutah—Firuz Shah—conflict with Bengal—Sind fiasco—theological reaction—revival of jaigir—beneficent measures, Invasion of Timur (1398 A. D.)

CHAPTER XIV

Disintegration of the Sultanate—the Sayyads and the Lodis. Bengal under Iliyas Shah, Raja Ganesh and Hussian Shah. Bahmani Kingdom. The rise of the Five Sultanates of the Deccan.

CHAPTER XV

The Vijayanagar Empire—Political History—Talikota (1565 A. D.). Administrative system and economic conditions—art and culture.

Kingdom of Orissa—The Choda Gangas—Puri and Konarak. Pratap Rudradeva and Vaisnavism. Decline.

The warring principalities of Assam—the appearance of Ahoms (early 13th century A. D.). Struggle with Sultans. Biswa Singh founds Cooch Behar. Internal feuds.

CHAPTER XVI

Impact of Islam on India—orthodox reaction—Raghunandan of Bengal. The way of synthesis. Hussian Shah, Adil Shah and Zainul Abedin. The Bhakti cult and Sufism. Ramananda Kabir, Chaitanya, Mira Bai, Namdeva and Nanak. Influence on, vernacular literature. Development of Indo-Saracenic style of art.

CHAPTER XVII

The Mughals—their early history. Occasion of their invasion of India. Panipat (1526 A. D.). War with Rajputs. Khanua (1527 A. D.). Babur's character. His memoirs. Humayun's failure to consolidate military occupation. Sher Shah—revenue and administrative measures. Restoration of the Mughals.

CHAPTER XVIII

Expansion of the Mughal Empire. Akbar, the Great Mughal —conquests and annexations. Rana Pratap. Conquest of Bengal and Orissa. Bara Bhuiyas of Bengal. Akbar and the Deccan, Akbar's Religion—personality.

Jahangir and Nur Jahan. Conquest of Mewar. Struggle against Ahmadnagar. Set-back in Kandahar.

Shah Jahan's rebellion. Mahabat Khan's coup. Religious electicism but beginning of persecution of the Sikhs. Tujuk-i-Jahangiri. Shah Jahan's North-West Frontier and Central Asian Policy. His Deccan policy. War of Succession. The Mughal Empire at zenith.

CHAPTER XIX

Aurangzeb—his character. Anti-Hindu measures. Bigotry. Hindu revival—Satnami rebellion. Sikhs, Rajputs and Marathas.

Career of Shivaji—estimate of his character and contributions. The Deccan ulcer. Policy towards the Shia Sultans.

Decline begins. Weak and corrupt successors, disruption of administration. The Peshwas. Last battle of Panipat (1761 A.D.)

CHAPTER XX

Mughal Administrative system—Mansabdari. Social and economic conditions. Todar Mall's settlement. Murshid Kuli Khan's settlement in Bengal.

The refined but extravagant Nobility. Decadence. Accounts of foreign travellers—Bernier, Tavernier, Manucci, Roe etc.

CHAPTER XXI

Mughal Art and Architecture—blending of Hindu and Muslim styles. Fathepur Sikri.

Islamic and Italian styles—Taj, Agra Fort and Itimad-uddowla, Mughal, Rajput and Pahari (especially Kangra) schools of painting. Further development of vernacular literature.

ভূমিকা

ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়-এর **দ্বিতীয় খণ্ড** তথা **মধ্যযুগ** প্রকাশিত হইল। ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগে প্রধানত মুসলিমদের আধিপত্য। সুতরাং অনেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগের পরিচয় প্রদানের অবসরে মুসলিম যুগেরই বিষয় অবতারণা করেন। এইরূপ পরিচয়ের মধ্যে নানা ত্রুটী রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কুতুবউদ্দীন আইবক কর্তৃক ভারতে স্থায়ী মুসলিম রাজ্য স্থাপনের পূর্বে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরবী, গজনী, ঘুরী, আফঘান, তুর্কী, মোঙ্গল বিভিন্ন প্রবাহে প্রায় পাঁচ শত বৎসর ভারতবর্ষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে মুসলিমগণ রাজ্য জয় করিয়াছে, ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে, মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। মুসলিম রাজত্ব আরম্ভের পূর্বেই প্রাচীন যুগেই তথাকথিত মুসলিম যুগ আরম্ভ হইয়াছে। অন্যদিকে মুসলিম যুগ শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্রিটিশ যুগের সূচনা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য-অধিকার লাভ করিয়াছে, কুঠি নির্মাণ করিয়াছে, সৈন্যদল গঠন করিয়াছে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং কোথায় যে ব্রিটিশকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান যুগ আরম্ভ, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

মধ্যযুগের কতকগুলি বিশেষত্ব রহিয়াছে—ঘটনার স্পষ্টতা, ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং প্রামাণিক গ্রন্থের বহুলতা। অবশ্য মুসলিম মোল্লগণ রচিত ইতিহাসের প্রধান দোষ এই ছিল যে, তাঁহারা ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য তাঁহারা বিধর্মী হিন্দুর গৌরবকাহিনী উহ্য রাখিয়া গিয়াছেন। অবস্থা বিশেষে কাফের বা বিধর্মী হত্যা ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত এবং স্বর্গলাভের উপায়। মোল্লাদের মতে—যে যত বেশী কাফের বধ করিবে তাহার পক্ষে স্বর্গের পথ তত বেশী সুগম হইবে। এই নীতি গ্রহণ করিয়া মোল্লা ঐতিহাসিকগণ কাফের-হন্তারূপে তাঁহাদের সুলতান, প্রভু বা সৈন্যাধ্যক্ষের গুণ-কীর্তন করিতেন। মথুরাতে মামুদ গজনভী পনর লক্ষ কাফের হত্যা করিয়াছিলেন—মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কোন নগরেই পনর লক্ষ লোকের বসতি ছিল না।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেক বাদশাহের দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ছিল। দরবারী ঐতিহাসিক ছিলেন সুলতানের অনুগ্রহপুষ্ট; সুতরাং তাঁহারা বাদশাহের গুণ কীর্তন করিয়াছেন এবং দোষ গোপন করিয়াছেন। দরবারী

ঐতিহাসিকগণের সংবাদগুলি সাধারণ ভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও সর্বথা নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। ইওরোপীয় ধর্মযাজক, বণিক ও পর্যটকগণ মধ্য যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিবেশিত সংবাদ বৃত্তি অনুরূপ এবং প্রায়ই জনশ্রুতির ভিত্তিতে রচিত। তাঁহারা মুঘল রাজপরিবার সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক কুৎসা রটনা করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের অনেকেই অন্তঃপুর দূরের কথা—রাজদ্বারেও প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মুসলিম যুগের ইতিহাস রচনা নিরাপদ নহে। ঈশ্বরদাস, সুজন রায় প্রভৃতি হিন্দু ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের রচনা খুব উচ্চাঙ্গের নহে। আবুল ফজলের মত ঐতিহাসিক, দার্শনিক, তথ্য পরিবেশক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আলবেরুণী ঐতিহাসিক ছিলেন না সত্য—কিন্তু দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি আলোচনায় তাঁহার দান অতুলনীয়।

মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজা, বাদশাহ, আমীর প্রভৃতি ভিন্নও বিভিন্ন শ্রেণীর বণিক, দার্শনিক, জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। আমাদের আলোচনায় তাঁহাদের স্থান স্বল্প পরিসর নহে।

বাস্তবিক পক্ষে ভারতে আকবরের রাজত্বকালই বর্তমান যুগের আরম্ভ। এই ইতিহাসের মধ্যে ঘটনার সহিত ঘটনার প্রচ্ছদপট সমভাবেই আলোচিত হইয়াছে; প্রয়োজনবোধে ঘটনার উপাদান সমালোচিত হইয়াছে। নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া ঘটনা ও ঘটনার প্রবাহের মূল্যমান নির্ধারিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে গৃহীত পুরাতন চিন্তার পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রে নূতন চিন্তা ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করা হইয়াছে।

ইতিহাস যে কেবল শৃঙ্খলীভূত ঘটনার সমাবেশ নহে—তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাস জীবন-দর্শন, ইতিহাস সাহিত্য—এই দুইটি তথ্য ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় রচনায় বিস্মৃত হই নাই। যাহাদের উদ্দেশ্যে **ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়** রচিত হইয়াছে তাহারা এই পুস্তক পাঠে আনন্দিত হইলে কৃতার্থ হইব।

এই পুস্তক প্রকাশের জন্য **প্রকাশ মন্দির**-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীসুশীল কুমার বসু যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অত্যন্ত দরদী মন লইয়া তিনি পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সরমা প্রেস ও উহার মুদ্রাকর শ্রীগৌরহরি দাসের সহযোগিতাও প্রশংসনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতি—

মহালয়া
১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার রচিত ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়-এর ২য় খণ্ড তথা মধ্যযুগ (Medieval Indain History) পুস্তকখানির ১ম ও ২য় মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহাই অনুভূত হইতেছে যে, পুস্তকখানি বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী ও সুহৃদসত্তমদের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। এজন্য তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ উচ্চতর মাধ্যমিক ইতিহাসের মানদণ্ড অত্যন্ত উচ্চস্তরে পরিকল্পনা করিয়াছেন। সেই মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমার রচিত ইতিহাসখানির কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। আশা করি পরীক্ষার্থীরা এই পুস্তক পাঠে সহজেই প্রশ্নপত্রের অভিপ্রেত উত্তরদানে সমর্থ হইবে। আমার রচিত ইতিহাসের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকে বলেন যে, আমি কাব্য রচনা করিয়াছি। জানি না, এই সমালোচনা প্রশংসা কিম্বা নিন্দা। আমি মনে করি, ইতিহাস সাহিত্য (কাব্য), ইতিহাসের কঙ্কালের মধ্যে ভাষার প্রলেপ দ্বারা প্রাণ সঞ্চার করা যায়, রস সৃষ্টি করা যায়, ইতিহাসকে সুখপাঠ্য করা যায়। তথ্যান্বেষী জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী আমার রচিত ইতিহাস পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ এবং আনন্দ উপভোগ করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

পূর্ববর্তী মুদ্রণে যে কয়টি মুদ্রাকর প্রমাদ ছিল, এই মুদ্রণে তাহা সংশোধন করা হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

অলমতি বিস্তারেণ
ইতি,
শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

সূচীপত্র

ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র পরিচয়

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

দিল্লীতে দাস রাজত্ব (১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ)

অধ্যায় পরিচয়ঃ ১২০৬ হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনশত কুড়ি বৎসর কালের মধ্যে তথাকথিত দাস রাজগণ এবং তিনটি তুর্ক-আফঘান রাজবংশ ও একটি আরব রাজবংশ দিল্লীর সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিল।

(১) দাসরাজগণ—১২০৬—১২৯০ খ্রীঃ—১১ জন সুলতান (আলবারী তুর্ক)

(২) খলজী বংশ—১২৯০—১৩২০ খ্রীঃ—৬ জন সুলতান (জাতিতে তুর্ক, বসতিতে আফঘান)

(৩) তুঘলক বংশ—১৩২০—১৪১৩ খ্রীঃ—৯ জন সুলতান (মধ্য এশিয়ার কারুণা তুর্কজাতীয় পিতা ও হিন্দু মাতার সন্তান)

(৪) সৈয়দ বংশ—১৪১৩—১৪৫১ খ্রীঃ—৪ জন সুলতান (আরবজাতীয়)

(৫) লোদী বংশ—১৪৫১—১৫২৬ খ্রীঃ—৩ জন সুলতান (সম্পূর্ণ আফঘান)

মোট ৩৩ জন সুলতান—গড়ে ৯ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন রাজত্ব। সাধারণ ভাবে এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ **পাঠান যুগ** বা **তুর্ক-আফঘান যুগ** নামে অভিহিত করেন।

দাস রাজগোষ্ঠী

এই রাজবৃত্তের মধ্যে ১২০৬ হইতে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চুরাশি বৎসরের মধ্যে তিনজন ক্রীতদাস তিনটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উহারা প্রত্যেকেই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ—দাসরাজ কুতুবউদ্দীনের জামাতা ছিলেন ক্রীতদাস ইলতুৎমিস; ক্রীতদাস বলবন ছিলেন ইলতুৎমিসের জামাতা। কুতুবউদ্দীনের বংশের দুই জন সুলতান প্রায় পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার জামাতা ইলতুৎমিস ও তাঁহার চার জন বংশধর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইলতুৎমিসের শেষ বংশধর নাসীরউদ্দীন মামুদ ছিলেন বলবনের জামাতা। তাঁহার দুই জন বংশধর পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই তিন জন ক্রীতদাস প্রতিষ্ঠিত বংশকে **কুতুবী, ইলতুৎমিসী** ও **বলবনী** রাজবংশ নামে অভিহিত করা অযৌক্তিক নহে। দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলেও

বলবনী বংশ বাঙ্গলা দেশে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অন্যদিকে ইসলামের নিয়ম অনুসারে কোন ক্রীতদাস সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে না। ইলতুৎমিস এবং বলবন দুই জনই সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে প্রভু কর্তৃক দাসত্বমুক্ত হইয়াছিলেন। কুতুউদ্দীন বোধ হয় আনুষ্ঠানিকভাবে দাসত্বমুক্ত হন নাই। সেইজন্যই পরবর্তিকালের সুলতানগণ প্রশস্তি পাঠের সময় খুৎবাতে কুতুবউদ্দীনের নাম উল্লেখ করেন নাই। যাহাই হউক, এই তিনটি বংশকে একত্র করিয়া যৌথভাবে **দাস রাজগোষ্ঠী** বা **দাস রাজবৃত্ত*** নামে অভিহিত করা হয়।

কুতুবউদ্দীন আইবক ঃ কুতুবউদ্দীন আইবকের জীবন একখানি তিন অঙ্ক নাটক। প্রথম অঙ্কে কুতুবউদ্দীন বহুবার ক্রীত ও বিক্রীত দাস, দ্বিতীয় অঙ্কে মুহম্মদ ঘুরীর অধীনে দাস-আমীর, তৃতীয় অঙ্কে দিল্লীর স্বাধীন সুলতান।

কুতুবউদ্দীনের জন্মভূমি তুর্কীস্থান; অতি শৈশবে অপহৃত হইয়া তিনি নিশাপুরের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার ক্রেতা ছিলেন একজন সহৃদয় কাজী। কাজী কুতুবউদ্দীনের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কুতুবউদ্দীনকে দ্বিতীয়বার নিশাপুরের বাজারে দাসরূপে বিক্রয় করেন। এই-বার ক্রেতা হইলেন পৃথ্বীরাজ বিজেতা মুহম্মদ ঘুরী।

ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন

কুতুবউদ্দীনের উন্নত দেহ ও বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী মুহম্মদ ঘুরীকে মুগ্ধ করিল। মুহম্মদ ঘুরী প্রথমে কুতুবউদ্দীনকে সৈনিক পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার সাহস ও কর্মকুশলতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অশ্বশালার অধ্যক্ষ (আমীর-

ই-আখোর) পদে উন্নীত করেন। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুহম্মদ ঘুরী তাঁহাকে একটি সৈন্যদলের নায়ক নিযুক্ত করেন। তরাইনের যুদ্ধের পরে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দীনকে বিজিত ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১২১০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নাই।
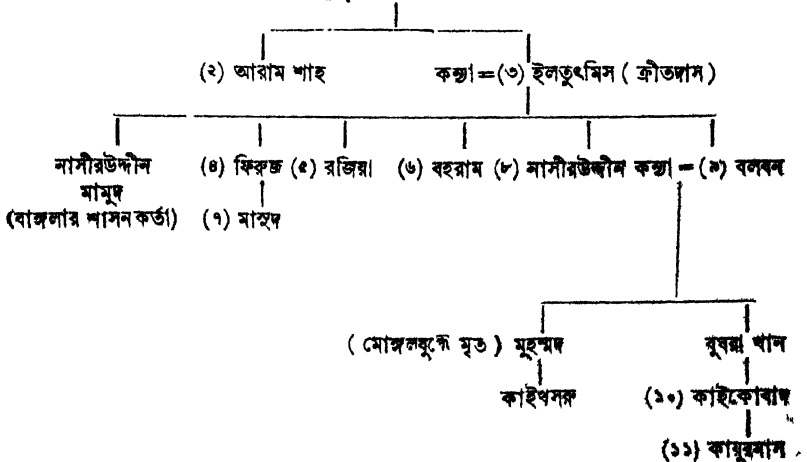
আমীর কুতুবউদ্দীন

আমীর কুতুবউদ্দীন (১১৯২-১২০৬ খ্রীঃ) মুহম্মদ ঘুরীর ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে সর্বপ্রথম আজমীর ও মিরাটের বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর তিনি ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করিয়া দিল্লীতে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। বাস্তবিক পক্ষে কুতুবউদ্দীনই দিল্লীতে ভারতের প্রথম মুসলিম রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলিম রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত দিল্লী ভারতীয় মুসলিম শাসনের রাজকেন্দ্র ছিল। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়া কনৌজের অধিপতি জয়চাঁদকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলীগড়, ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের রাজধানী অনহিলওয়ারা এবং ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বদাউন অধিকার ও লুণ্ঠন করেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী রায় লখ্‌মনিয়াকে পরাজিত করিয়া নদীয়া জয় করেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্লরাজ পরমলদেবকে পরাজিত করিয়া কুতুবউদ্দীন কালিঞ্জর এবং খাজুরাহ অধিকার করেন। বাস্তবিক পক্ষে কুতুবউদ্দীনই ঘুরী সুলতানের প্রতিনিধিরূপে উত্তর-ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করেন। ইহার পরে কোন দাসরাজই উত্তর ভারতে কোন রাজ্য বা রাজ্যাংশ জয় করেন নাই।

মালিক কুতুবউদ্দীন

মৃত্যুর পূর্বেই মুহম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিজিত রাজ্যখণ্ডের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং মালিক উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক মুহম্মদ ঘুরী শত্রু কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হইলে তাঁহার বিশাল রাজ্য বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষগণ ভাগ করিয়া লইলেন। কিরমানের শাসনকর্তা তাইজউদ্দীন ইলদুজ, মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসীরউদ্দীন কুবাচা এবং দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। লাহোরের মুসলিম অধিবাসিবর্গ কুতুবউদ্দীনকে আমন্ত্রণ করিয়া তিন মাসের মধ্যেই সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে কুতুবউদ্দীন কয়েকটি বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অধিকার সুদৃঢ় করেন। প্রথমে তাঁহার কন্যাকে ইলতুৎমিসের সঙ্গে এবং ভগ্নীকে নাসীরউদ্দীন কুবাচার সঙ্গে বিবাহ দেন। পরে তিনি স্বয়ং তাইজউদ্দীন ইলদুজের কন্যাকে বিবাহ করেন। কুতুবউদ্দীনের উপাধি ছিল মালিক এবং সিপাহসালার—সুলতান নহে। তাঁহার প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ ছিল না এবং খুৎবায় (নমাজের পরে রাজ-প্রশস্তি পাঠ) মধ্যেও তাঁহার

রাজ্যলাভ—১২০৬ খ্রীঃ

নামোল্লেখ করা হইত না। বোধ হয়, তখন তিনি দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই। ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘুর রাজ্যের অধিপতি ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ তাঁহাকে রাজনিশান ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন এবং সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় হইতে বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার পরিপূর্ণ সুলতানী জীবন আরম্ভ হয়।

কুতুবউদ্দীন চারি বৎসর রাজত্ব করেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে কোন নূতন রাজ্য বা রাজ্যাংশ জয় করেন নাই। তিনি পূর্ববিজিত রাজ্য সুসংবদ্ধ ও সুরক্ষিত করিবার জন্য সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। তিনি রাজধানী দিল্লীতে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু তিনি লাহোরেই অধিক সময় যাপন করিতেন।

সুলতান কুতুবউদ্দীন

কুতুবউদ্দীন প্রতিদ্বন্দ্বী তাইজউদ্দীন ইলদুজ ও নাসীরউদ্দীন কুবাচার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। ঘনিষ্ট আত্মীয়তা স্থাপন সত্ত্বেও তাঁহাদের বিদ্বেষ ও ঈর্ষা কুতুবউদ্দীনকে নানাভাবে বিব্রত করিয়াছিল। পরন্তু হিন্দুরাজন্যবর্গ মুসলমান বিজেতার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নাই। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে চান্দেল্লরাজ কালিঞ্জর হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বদাউনের দুর্গ অধিকার করিলেন। প্রতিহারগণ গোয়ালিয়র জয় করিল। ইখতিয়ারউদ্দীন বিন্ বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর বাঙ্গলা দেশের হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া দিল্লী সুলতানের বিরোধিতা আরম্ভ করিল।

ভারতের বাহিরে খাওয়ারিজমের শাহ আলাউদ্দীন মুহম্মদ গজনী ও দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কুবাচা এবং ইলদুজ কুতুবউদ্দীনের আধিপত্য অস্বীকার করিলেন। পরন্তু ইলদুজ মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কুতুবউদ্দীন দিল্লী হইতে লাহোরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিলেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত লাহোরেই বাস করিয়াছিলেন।

১২১০ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন চৌঘান বা পলো খেলিবার সময় আকস্মিক ভাবে অশ্বচ্যুত হইয়া আহত হন এবং সেই আঘাতেই তাঁহার জীবন-নাটকের যবনিকা পতন হয়। লাহোরেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

কুতুবউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ সামান্য ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া নানা বিপর্যয় ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কুতুবউদ্দীন স্বয়ং সামরিক প্রতিভাবলে সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম অধিকার স্থাপন করেন। সেনানায়ক-রূপে তাঁহার খ্যাতি অবিস্মরণীয়। অবশ্য তাঁহার শাসন-ক্ষমতা সামরিক ক্ষমতার অনুরূপ ছিল কিনা সন্দেহ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি দুর্গ নির্মাণ করেন, সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, কাজী নিযুক্ত করিয়া মুসলিম ধর্মের গৌরব রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের প্রাচীন রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন

পরিবর্তন সাধন করেন নাই। প্রাচীন প্রথায় প্রাক্তন কর্মচারিগণ মুসলিম বিজেতার পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহ করিত।

কুতুবউদ্দীন কালিঞ্জরে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং দিল্লীর অদূরে একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর কুয়ৎ-উল-ইসলাম (ইসলামের শক্তি) নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। আজমীরে একটি হিন্দুর চতুষ্পাঠী ধ্বংস করিয়া তাহার উপর "আড়াই দিন কা ঝোপড়া" (ষাট ঘণ্টার মসজিদ) নির্মাণ করেন। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের স্তম্ভগাত্রে ও শীর্ষে হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি ও মাঙ্গলিক পদ্ম অদ্যাপিও দর্শককে বিস্মিত করে। সংযুক্তার সহিত বিবাহের স্মৃতি রক্ষার জন্য পৃথ্বীরাজ একটি বিরাট সৌধ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অসমাপ্ত ছিল। কথিত আছে, কুতুবউদ্দীন উহাকে পরিবর্তন করিয়া জাম-ই মসজিদে পরিণত করার জন্য নূতন ভাবে কার্যারম্ভ করেন; কিন্তু তাহা তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কাহারও মতে পরবর্তিকালে ইলতুৎমিস খাজা কুতুবউদ্দীন নামক একজন ফকিরের সম্মানার্থে ইহার নামকরণ করেন **কুতুবমিনার।**
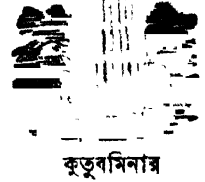
কুতুবমিনার

কুতুবউদ্দীন জ্ঞান ও জ্ঞানীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমসাময়িক লেখক হাসান নিজামী তাঁহার রচিত গ্রন্থ কুতুবউদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে দান করিতেন। ইহার জন্য তিনি লাখ্ বক্স বা লক্ষদাতা আখ্যা লাভ করেন। অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী হত্যা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

কুতুবউদ্দীনের প্রধান কীর্তি হইল ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য স্থাপন। গজনী হইতে তিনি ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ভারতবর্ষে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন। ইসলামের খলিফার সঙ্গে কুতুবউদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাজ্যের কোন সম্বন্ধ ছিল না; গজনীর বা ঘুরের সহিতও কোন সম্পর্ক ছিল না। আরবীয় খিলাফতের অংশরূপে তুর্ক-আফঘানগণ ভারতবর্ষ জয় করেন নাই। খলিফার সংস্পর্শ বিবর্জিত ভারতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন কুতুবউদ্দীনের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

আরাম শাহের সিংহাসনারোহণ

আরাম শাহ (১২১০-১২১১ খ্রীঃ)**:** শিশুরাষ্ট্রের নায়ক কুতুবউদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার তুর্কী-অনুচরবর্গ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ভারতে তুর্কীবিজিত রাজ্য তখন পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল—লাহোর, বদাউন, মুলতান, লখ্নৌতি ও উচ। লাহোরের আমীরগণ কুতুবউদ্দীনের পুত্র, মতান্তরে পালিত পুত্র, অনভিজ্ঞ ... ...

আরাম শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু দিল্লীর আমীরগণ শিশুরাষ্ট্রের সংকটময় মুহূর্তে তুর্কজাতীয় একজন সুদক্ষ সৈনিক এবং অভিজ্ঞ শাসকের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কুতুবউদ্দীনের জামাতা, বদাউনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিসকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। দিল্লীর কোতোয়ালের আমন্ত্রণে ইলতুৎমিস বদাউন হইতে দিল্লীর পথে যাত্রা করিলেন। আরাম শাহ পথে ইলতুৎমিসের গতি প্রতিরোধ করিলেন। এই গৃহবিবাদের সুযোগে উচের শাসনকর্তা নাসীরউদ্দীন কুবাচা প্রথমে মুলতান এবং পরে লাহোর অধিকার করিলেন। রণথম্বর, আজমীর, দোয়াব এবং গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজগণও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গলায় আলী মরদান খলজী দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। গৃহযুদ্ধে লাহোরী আমীরদের সহায়তা সত্ত্বেও আরাম শাহ ইলতুৎমিস কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন। আরামশাহী রাজত্বকাল ছিল মাত্র তিনশত দিন। এই সময়ে তাইজউদ্দীন ইলদুজ দিল্লীর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

আরাম শাহের মৃত্যু

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ) ঃ সম্ভ্রান্ত আলবারী তুর্কবংশের সন্তান ইলতুৎমিসকে শৈশবে তাঁহার অর্থলোভী ভ্রাতৃগণ জামালউদ্দীন নামক একজন দাসব্যবসায়ীর নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। ইলতুৎমিসকে জামাল-উদ্দীন প্রথমে গজনীর বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু উপযুক্ত ধনী ক্রেতার অভাবে তাহাকে দিল্লীর দাসবাজারে কুতুবউদ্দীনের নিকট আশাতীত মূল্যে বিক্রয় করেন। কুতুবউদ্দীন ইল-তুৎমিসের অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইলতুৎমিসের বংশ পরিচয়, পরিহাসপটুতা এবং শিকারে অব্যর্থ লক্ষ্য প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অচিরকাল মধ্যেই ইলতুৎমিস মালিক কুতুবউদ্দীনের পার্শ্বচর নিযুক্ত হইলেন এবং আমীর-ই-শিকার পদে উন্নীত হইলেন। তার পরে প্রথমে ইল-তুৎমিস গোয়ালিয়রের, পরে বারাণ বা বুলন্দশহরের শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইলতুৎমিস কুতুবউদ্দীনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বদাউনের শাসনভার লাভ করেন। পাঞ্জাবে খোক্কার বিদ্রোহ দমনে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পুরস্কার স্বরূপ কুতুবউদ্দীন তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করেন এবং আমীর-উল-ওমারা পদে উন্নীত করেন। ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে বদাউনের শাসনকর্তা দিল্লীর সুলতান পদে অভিষিক্ত হইলেন। "বিগত পরশ্বের রাজপুত্র, গতকল্যকার ক্রীতদাস, অদ্যকার জামাতা, আগামী কল্যকার সুলতান"—তুর্কীস্থানে প্রচলিত এই প্রবাদ ইলতুৎমিসের জীবনে জীবন্ত সত্য।

ইলতুৎমিসের প্রথম জীবন

ইলতুৎমিসের দাসত্ব মুক্তি

তাঁহার সিংহাসন লাভ

ইলতুৎমিস সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যলাভ করেন নাই।

দিল্লীর সিংহাসনের পরিধি তখন দিল্লীর লালকেল্লা হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লাহোরের আমীরগণ ইলতুৎমিসের পক্ষ সমর্থন করে নাই। তাঁহার

প্রতিদ্বন্দ্বী নাসীরউদ্দীন কুবাচা মুলতানের অধিপতি ছিলেন এবং লাহোর অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও বিহারে আলী মরদান খলজী স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গ—বিশেষ করিয়া ঝালোর, আজমীর, গোয়ালিয়র এবং দোয়াব অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাইজউদ্দীন

ইলতুৎমিসের প্রাথমিক সমস্যা
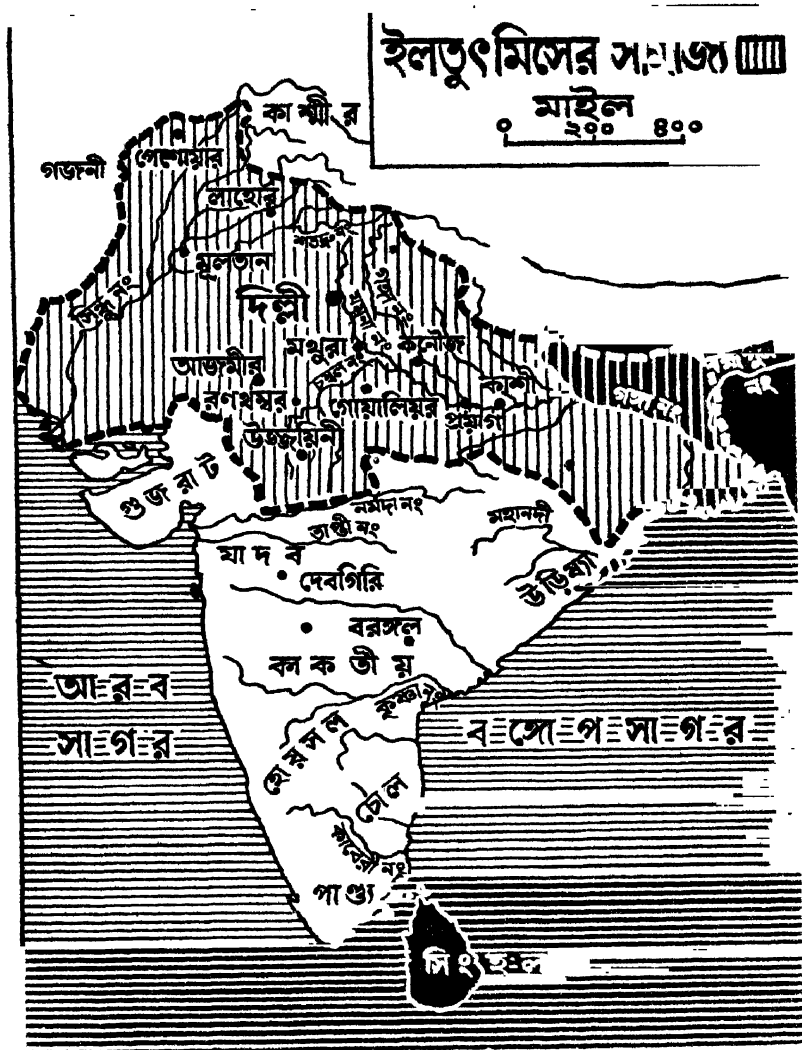
ইলতুজ গজনী হইতে দিল্লীর উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করিলেন। এমন কি, দিল্লীর অভ্যন্তরে আমীরদের একটি প্রধান অংশও ইলতুৎমিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিল।

স্থিরবুদ্ধি, পরম অভিজ্ঞ, দুর্ধর্ষ সৈনিক ইলতুৎমিস স্বীয় বুদ্ধিবলে এবং কুট-নীতি ও সামরিক শক্তি প্রয়োগে তাহার প্রাক্তন মিত্র বর্তমান শত্রু ইলতুজকে ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করিলেন। বদাউনের কারাগারে ইলতুজের মৃত্যু হইল। এইখানে গজনীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। দুই বৎসরের মধ্যে নাসীরউদ্দীন কুবাচা লাহোর হইতে বিতাড়িত হইলেন। লাহোর দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

১২২০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খাঁন তাঁহার শত্রু খাওয়ারিজমের বা খিবার সুলতান জালালউদ্দীন মাঙ্গাবরনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। চেঙ্গিস খান ছিলেন ধর্মে সামানী বৌদ্ধ, জাতিতে মোঙ্গল, ব্যবসায়ে যোদ্ধা। তাহার প্রকৃত নাম **তেমোচিন** —উপাধি চেঙ্গিস, অর্থাৎ পৃথিবীর দাহক। ভারতে তুর্কী রাজ্য স্থাপনের সমকালে চেঙ্গিস খান বহির্ভারতে মোঙ্গল রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। জীবনে নানা বাধা-বিপত্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া মধ্য এশিয়া জয় করিয়া পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কারাকোরাম। সুলতান মাঙ্গাবরনী চেঙ্গিস খানের অসন্তোষ-ভাজন ছিলেন। চেঙ্গিস খান কর্তৃক উপদ্রুত ও অনুসৃত হইয়া মাঙ্গাবরনী দিল্লীর রাজসভায় ইলতুৎমিসের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মাঙ্গাবরনীর পক্ষে হিন্দুস্থানের জল-বায়ু অস্বাস্থ্যকর হইবে এই যুক্তিতে ইলতুৎমিস সেই আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় প্রদান করেন নাই। ইহাতে রাজধর্ম রক্ষিত হয় নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ মোঙ্গল আক্রমণের দুর্দৈব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বুদ্ধিমান ইলতুৎমিস মাঙ্গাবরনীকে আশ্রয় প্রত্যাখান করিয়া বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু রাজোচিত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন।

মোঙ্গল-ভীতি

চেঙ্গিস খান অথবা মোঙ্গল জাতি ভারতবর্ষ জয় করিলে ভারতবর্ষের সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। মৌর্যোত্তর যুগ হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ভারতে শক, কুষাণ, হুন, গুর্জর, পহ্লব প্রভৃতি বহু সভ্য, অর্ধসভ্য ও অসভ্য জাতি ভারতের সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছিল; সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে পাঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ, মারাঠী প্রভৃতি ভারত সন্তানের রক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছিল। তাহারা ভারতের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। মোঙ্গল জাতি ছিল অর্ধসভ্য।

মোঙ্গল বিজয়ের সম্ভাব্য ফল

তাহাদের কোন সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ভিত্তি ছিল না। তাহারা চীন জয় করিয়া চীনের সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া চৈনিক হইয়া গিয়াছিল। জর্জিয়া জয় করিয়া মোঙ্গলগণ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পোল্যাণ্ড জয় করিয়া তাহারা কসাক্ জাতিতে পরিণত হইল। মোঙ্গল জাতি খিলাফত সাম্রাজ্য জয় করিয়া ইসলামের সংস্পর্শে আসিল এবং ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিল। তাহারা যদি ভারত জয় করিয়া ভারতে বাস করিত, হয়ত বা ভারতের সভ্যতা সাময়িক ভাবে বিনষ্ট করিয়া দিত। কিন্তু কালক্রমে ভারতে বসবাস করিয়া ভারতের সভ্যতা ও ধর্ম গ্রহণ করিত এবং ভারতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহারাও ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। ফলে ভারতবাসীর রক্তে নব স্রোত প্রবাহিত হইত। হয়ত ভারতবর্ষে এক নব রাজপুত জাতির সৃষ্টি হইত। মোঙ্গল জাতি ছিল সামানী বৌদ্ধধর্মাশ্রিত। সামানী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতবাসীর ধর্মের সামঞ্জস্য ছিল নিকটতর। অথচ সেমিটিক ইসলামের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের দূরত্ব ছিল দীর্ঘতর। সুতরাং মোঙ্গল জাতির পক্ষে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করা সহজ হইত। ইতিহাস কি হইত, তাহা বিচার করে না; কি হইয়াছে, তাহাই বিচার করে। সুতরাং মোঙ্গল জাতির ভারত বিজয়ের সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে আলোচনা অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত।

মাঙ্গাবরনী ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং তিনি নাসীরউদ্দীন কুবাচার শক্তি খর্ব করিয়াছিলেন। মূলতান এবং সিন্ধু ব্যতীত কুবাচার হস্তে আর কোন ভূখণ্ড ছিল না। ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে কুবাচা ইলতুৎমিসের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য পলায়ন কালে সিন্ধুর জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। মূলতান ও সিন্ধু ইলতুৎমিসের রাজ্যভুক্ত হয়।

মাঙ্গাবরনীর প্রত্যাবর্তনের পর

বন্ধু এবং প্রভু ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খলজীকে রোগশয্যায় হত্যা করিয়া আলী মরদান খলজী বাঙ্গলায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু ইবন বখতিয়ারের বন্ধুবর্গ আলী মরদানকে হত্যা করিয়া বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। হিসামউদ্দীন আইওয়াজ সুলতান ঘিয়াস-উদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়া লখ্নৌতির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি বিহার জয় করিলেন এবং প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য জাজনগর (উড়িষ্যা), ত্রিহুত (মিথিলা), বঙ্গ (মধ্য বাঙ্গলা) এবং কামরূপ হইতে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি লাভ করিলেন। ইলতুৎমিস বাঙ্গলার স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া ঘিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ফলে আইওয়াজ নিহত হইলেন। বাঙ্গলা পুনরায় দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইল। ইলতুৎমিস কর্তৃক নিযুক্ত বাঙ্গলার প্রতিনিধি নাসীর-উদ্দীন বাঙ্গলায় আগমনের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বলকা নামক

বঙ্গদেশে পুনরধিকার স্থাপন

একজন খলজী আমীর লখ্‌নৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশ পুনরায় বিজিত হইল। ইলতুৎমিস বাঙ্গলা এবং বিহারকে দুইটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করিয়া দুই জন শাসক নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের উপাধি হইল **জাবিতান** বা কর্মকর্তা।

আরাম শাহের স্বল্প পরিসর ও দুর্বল রাজত্বকালে কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, রণথম্বর, যোধপুর, ঝালোর, আলোয়ার প্রভৃতি রাজপুত রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি অপসৃত হইবার পর ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস কৌশলে রণথম্বর, ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঝালোর, তার পর বৎসর যোধপুর এবং ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সেনাপতি তাইয়াসিন কালিঞ্জর, জয় করিতে আসিয়া পলায়ন করেন। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে শিশোদীয় (ঘিলোহিৎ) বংশের সন্তান ক্ষেত্র সিং সুলতানকে পরাজিত করেন ও রাজ্যসীমান্ত হইতে দূর করিয়া দেন। সেই বৎসরই সুলতান গুজরাটের চালুক্যদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু পরাজিত হন। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস মালব আক্রমণ করেন এবং বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করেন। কিন্তু তিনি মালব জয় করিতে পারেন নাই।

রাজপুতানা পুনর্বিজয়

পাঞ্জাবের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দোয়াব অঞ্চল আরাম শাহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইলতুৎমিসের রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত মুসলমানদিগকে বিব্রত করিয়াছিল। কথিত আছে যে, এই অঞ্চলের নায়ক পৃথু এক লক্ষ কুড়ি হাজার তুরস্ক সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন। পৃথুর জীবিত কালে দোয়াব অঞ্চল বিজিত হয় নাই।

পাঞ্জাবের খোক্কারদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় ইলতুৎমিস অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। রোগশয্যায় সহজভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মুহম্মদ ঘুরী, কুতুবউদ্দীন, আরাম শাহ, বখতিয়ার খলজী, আলী মরদান খলজী প্রভৃতি প্রারম্ভিক যুগের সকল নেতাই অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলিম ভারতের ইতিহাসে ইলতুৎমিসের স্বাভাবিক মৃত্যুই অস্বাভাবিক।

ইলতুৎমিসের মৃত্যু

ইলতুৎমিসের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ সৈনিকের সাহস এবং রাষ্ট্রনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল ইলতুৎমিসের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইলতুৎমিস ছিলেন দাসের দাস অর্থাৎ ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীনের ক্রীতদাস। কুতুবউদ্দীনের পশ্চাতে ছিল শক্তিমান বীরপুরুষ মুহম্মদ ঘুরীর সমর্থন ও সাহচর্য। ইলতুৎমিসের অগ্রগতির পশ্চাতে ছিল তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা এবং সামর্থ্য। কুতুবউদ্দীনের অসমাপ্ত কার্য প্রকৃতপক্ষে ইলতুৎমিসই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কুতুবউদ্দীনের রাজত্বকালে মুলতান এবং সিন্ধুদেশ হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু ইলতুৎমিস এই হৃত রাজ্যখণ্ড পুনরুদ্ধার করেন। মোঙ্গল ভীতি হইতে তিনি ভারতবর্ষকে রক্ষা

করেন। ভারতে তিনিই প্রথম যথার্থ মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। খলজী-যুগে ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

ইলতুৎমিস সর্বপ্রথম বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে স্বীকৃতিপত্র লাভ করেন। মুসলমানের দৃষ্টিতে নীতিগত ভাবে আল্লা এক, খলিফা এক এবং ইসলাম সাম্রাজ্য এক। সুতরাং খিলাফতের বাহিরে কোন মুসলমান রাজ্য অথবা সুলতানের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য। ইলতুৎমিস খলিফার নিকট হইতে ধর্মসম্মত সুলতান রূপে স্বীকৃতিপত্র লাভ করেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের তুর্কী সাম্রাজ্য ইসলামের অংশ বলিয়া স্বীকৃত হইল। তিনি প্রতিদিন পঞ্চ নমাজ এবং ইসলামের নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করিতেন। তিনি শিয়া মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং দিল্লীতে সামান্য বিদ্রোহের পরে শাস্তি স্বরূপ সহস্র শিয়া মুসলিম নিধন করেন। মুসলিম উলামাদিগকে তিনি 'রাজ্যের স্তম্ভ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন এবং ভীলসার দেবায়তন নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যের পিতল মূর্তি দিল্লীতে আনয়ন করিয়া প্রাচীন হিন্দু সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে অপমানিত করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ ইলতুৎমিসকে ইসলাম ধর্মের ধারক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

ধর্মমত

ভারতে তিনি সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার প্রচলিত রৌপ্য টঙ্কাতেও আরবী অক্ষর মুদ্রিত ছিল।

ইলতুৎমিসের বংশধরগণ ঃ ইলতুৎমিসের পাঁচ জন বংশধর ত্রিশ বৎসর (১২৩৬-৬৬ খ্রীঃ) দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মামুদ মৃত, দ্বিতীয় পুত্র রুকনউদ্দীন ফিরুজ ছিলেন অলস, অকর্মণ্য ও অপদার্থ। তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ ছিলেন বালক ও অপরিণত বয়স্ক। সুতরাং ইলতুৎমিস তাঁহার তৃতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, বুদ্ধিমতী কর্মপটিয়সী রজিয়া বেগমকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইসলামের নির্দেশ অনুসারে "যে জাতি নারীকে সিংহাসন দান করে, তাহার মুক্তি নাই"। রজিয়ার মনোনয়ন গর্বিত তুর্কী আমীরগণ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ অস্বীকার করিবেন—ইহা অনুমান করিয়া ইলতুৎমিস আমীর-ওমরাহদের অনুমোদনের জন্য এক উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহার রৌপ্য টঙ্কার উপরে রজিয়ার নাম অঙ্কিত করিয়া অনুমোদন উৎসব সম্পন্ন করিলেন।

রজিয়া বেগম উত্তরাধিকারী মনোনীত

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া আমীরগণ রুকনউদ্দীন ফিরুজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। রুকনউদ্দীন ফিরুজের মাতা শাহ তুরকান ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, শৈশবে ক্রীতদাসী, যৌবনে নর্তকী এবং প্রৌঢ় জীবনে ইলতুৎমিসের অন্তঃপুরিকা, মৃত্যুর পূর্বে রাজমাতা। কিন্তু তাঁহার পুত্র

রুকনউদ্দীন ফিরুজ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসপ্রিয়, কর্মকুণ্ঠ। সুতরাং শাহ তুরকান পুত্রের নামে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। অচিরকাল মধ্যে গজনীর সুলতান সিন্ধু এবং উচ আক্রমণ করিলেন। মুলতান, লাহোর, হানসী এবং বদাউনের আমীরগণ শাহ তুরকান এবং রুকনউদ্দীন ফিরুজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুকনউদ্দীন ফিরুজ সসৈন্যে বিদ্রোহী আমীরদের বিরুদ্ধে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। রুকনউদ্দীনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভগ্নী রজিয়া বেগম শুক্রবারের নমাজের দিনে রক্ত বসনে দেহ আবৃত করিয়া জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুমারী সুন্দরী, অপরূপ রূপময়ী, অবগুণ্ঠনমুক্তা সুলতানজাদীকে দর্শন করিয়া জনতা বিস্মিত হইল। রজিয়া বেগম তাঁহার পিতা ইলতুৎমিসের নাম উচ্চারণ করিয়া জনগণকে তাঁহার মনোনয়ন স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং শাহ তুরকানের অনাচারের কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত করিলেন। ফলে রুকনউদ্দীন ফিরুজের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই জনগণ রজিয়া বেগমকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, শাহ তুরকান কারাগারে নিক্ষিপ্তা হইলেন এবং ফিরুজ বন্দী হইলেন। দুই শত দশ দিন রাজত্বের পরে রুকনউদ্দীন ফিরুজ নিহত হইলেন।

রুকনউদ্দীন ফিরুজ

রজিয়ার সিংহাসন লাভ

রজিয়া বেগম (১২৩৬-১২৪০ খ্রীঃ): দিল্লীর আমীরগণ রজিয়াকে সমর্থন করিলেও বদাউন, মুলতান, হানসী এবং লাহোরের আমীরগণ দিল্লী অবরোধ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী ও রূপসী রজিয়া ব্যক্তিগত আবেদন দ্বারা আমীরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিলেন। আমীরচক্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। ফলে দুইজন আমীর নিহত হইলেন। রজিয়া বেগমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধু পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড রজিয়া বেগমের অধীনতা স্বীকার করিল। রজিয়া কর্মচারী নিযুক্তির এবং রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে আমীরচক্র বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। কারণ আমীরগণ নারীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজেরা রাজ্য পরিচালনা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা রজিয়া বেগমের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নূতন ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রজিয়ার সমস্যা

অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী মোল্লাগণ রজিয়ার পুরুষোচিত ব্যবহারে ইসলাম বিপন্ন এই আশংকায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। রজিয়া বেগম স্বয়ং দরবারে বিচার করিতেন। পূর্বে বিচার ব্যাপারে ছিল মোল্লাদের একাধিকার, সুতরাং মোল্লাগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। রজিয়া বেগম পুরুষের বেশে প্রকাশ্য রাজপথে অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেন, পুরুষ সহচরসহ শিকারের উন্মাদনায় গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন, সৈন্য

রজিয়ার বিচার-ব্যবস্থা

পরিচালনা করিতেন, যুদ্ধ করিতেন। জ্যামালউদ্দীন ইয়াকুত নামক একজন হাবসী সৈনিককে তিনি আমীর-ই-আখোর উপাধি দান করেন। তুর্কী আমীরগণ ভাবিলেন, এই কার্য দ্বারা রজিয়া তুর্কী আমীরদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে রাজ্যের আমীর, মালিক ও উলামাগণ রজিয়ার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন রজিয়ার রাজপুরীর অধ্যক্ষ ইখতিয়ারউদ্দীন এবং ভাতিন্দা ও লাহোরের শাসনকর্তা। পথে রজিয়ার আমীর-ই-আখোর ইয়াকুত নিহত হইলেন। ইয়াকুতের মৃত্যুতে রজিয়ার সৈন্যদল বিভ্রান্ত হইয়া গেল। সরহিন্দের শাসনকর্তা ইলতুনিয়ার চক্রান্তে রজিয়া ভাতিন্দার দুর্গে বন্দিনী হইলেন। আমীরগণ ইলতুৎমিসের পুত্র বহরামকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ইলতুনিয়া রজিয়াকে কারাগারমুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন এবং রজিয়া ও ইলতুনিয়া একসঙ্গে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বহরামের সৈন্য ইলতুনিয়াকে পরাজিত করিল; পথে রজিয়া বেগম একদল স্থানীয় দস্যু কর্তৃক নিহত হইলেন।

রজিয়ার পতন

রজিয়ার চরিত্র ও কৃতিত্ব : পৃথিবীর মুসলিম ইতিহাসে মাত্র আট জন নারী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন—রজিয়া তাঁহাদের একজন, ভারতে তিনি অনন্যা। তিনি স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মিনহাজ বলিয়াছেন, "রজিয়া বেগম ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বশালিনী শাসিকা, বুদ্ধিতে অতুলনীয়া, বিচারে অপক্ষপাতিনী, নিরন্তর প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী এবং বিদ্বজ্জন হিতৈষিণী।" রজিয়া বেগমের পতনের প্রধান কারণ—তাঁহার নারীজন্ম, ইসলামে নারীর প্রতি অ-সম দৃষ্টি, মোল্লাদের উষ্মা এবং তুর্কী আমীরদের নারীর প্রতি ঈর্ষামূলক মনোভাব। প্রত্যক্ষভাবে হাবসী ইয়াকুতকে আমীর-ই-আখোর পদে নিযুক্তির দ্বারা তিনি তুর্কী আমীরদিগকে অবমাননা করিয়াছিলেন। রজিয়া যদি তুর্কী আমীরদের বশংবদ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাহার নারী জন্মের অপরাধ তুর্কী আমীরগণ ক্ষমা করিতে পারিতেন। রজিয়ার সিংহাসনে মনোনয়ন এবং আরোহণ দ্বারা ইহা প্রতীত হয় যে, তুর্ক-আফঘান জাতি ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। তুর্কীজাতি তাহাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নাই। রজিয়া বেগমের পরে আর কোন মুসলিম নারী দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করেন নাই। নূরজাহান রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

রজিয়ার নারীজন্মের অপরাধ

মুইজউদ্দীন বহরাম শাহ : রজিয়া বেগমের পরবর্তী সুলতান মুইজউদ্দীন বহরাম শাহ ছিলেন ইলতুৎমিসের তৃতীয় পুত্র। তিনি, সিংহাসনে উপবেশন

করিবেন কিন্তু শাসন করিবেন না—এই শর্তে তাঁহাকে সিংহাসন দান করা হইল। এই শর্ত অনুসারে তিনি আলবারী আমীর ইখতিয়ারউদ্দীনকে নায়েব ই-মমলেকাৎ বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং প্রাচীন আলবারী মালিকদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। বাস্তবিক পক্ষে বহরাম শাহের রাজত্ব ছিল আমীরদেরই রাজত্ব। ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার বাসভবনে নহবৎ প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহার হস্তীশালার জন্য হস্তী ক্রয় করা হইল। নহবৎ ব্যবহার এবং হস্তী আরোহণে একমাত্র রাজারই একচ্ছত্র অধিকার ছিল। ইখতিয়ারউদ্দীন সুলতান বহরামের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন। ক্রমশ নায়েবের ক্ষমতা রাজক্ষমতাকে অতিক্রম করিল। সুলতান বহরাম ক্ষুব্ধ হইয়া নায়েব ইখতিয়ারউদ্দীনকে প্রকাশ্য রাজসভায় হত্যা করেন। তাঁহাব রাজদ্রোহের অপরাধের পর তিনি আর কোন নায়েব নিযুক্ত করেন নাই। প্রধান আমীর মুনকারকেও তিনি হত্যা করিলেন। উলামাগোষ্ঠী তাঁহার বিরোধিতা করিলে বহরাম শাহ তাঁহাদিগকে হত্যা করিলেন। এই সময়ে (১২৪১ খ্রীঃ) মোঙ্গলগণ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া লাহোর অবরোধ করিল। বহরাম শাহ কর্তৃক লাহোর উদ্ধারের জন্য প্রেরিত সৈন্যদল বিদ্রোহ করিল। বহরাম পরাজিত ও নিহত হইলেন। তুর্কী আমীরদের অধিকার ও মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইখতিয়ারউদ্দীন রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত

ইখতিয়ারউদ্দীনের হত্যা

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪১ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ (১২৪১ খ্রীঃ): তুর্কী আমীরগণ স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইলতুৎমিসের পৌত্র, রুকনউদ্দীন ফিরুজের পুত্র, অপরিণত বয়স্ক মাসুদ শাহকে সিংহাসন দান করেন। শর্ত হইল মাসুদ শাহ “চাহাল-ই-বান্দাগান” বা চল্লিশ বান্দার চক্রের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করিবেন। মালিক কুতুবউদ্দীন হাসান সুলতানের নায়েব নিযুক্ত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা আমীরদের হস্তে চলিয়া গেল। উলুঘ খান বলবন নামক একজন ক্রীতদাস প্রাসাদরক্ষী আমীররূপে নিযুক্ত হইলেন। এই উলুঘ খান বলবনের চেষ্টায় রাজশক্তির মর্যাদা আংশিকভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু রাজধানীর বহির্ভাগে বাঙ্গলার শাসনকর্তা তুগান খান স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বিহার অধিকার করিলেন এবং অযোধ্যা অবরোধ করিলেন। মুলতান ও উচ দিল্লীর সম্পর্ক ছিন্ন করিল। মোঙ্গলগণ ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কারলুঘ খানের অধীনে উত্তর পাঞ্জাব অধিকার করিল। উলুঘ খান বলবন নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে রাজদরবারে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। আলাউদ্দীন মাসুদ শঙ্কিত হইয়া ইলতুৎমিসের পত্নীর (নাসীরউদ্দীন মুহম্মদের মাতা) সহযোগে ষড়যন্ত্র করিলেন। বলবন নাসীরউদ্দীন ও তাঁহার মাতার সহিত মাসুদের বিরুদ্ধে

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪৫ খ্রীঃ)

যোগদান করিলেন। মাস্‌দ নিহত হইলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

নাসীরউদ্দীন মামুদ (১২৪৬-৬৫ খ্রীঃ)ঃ নাসীরউদ্দীন মামুদ ছিলেন ইলতুৎমিসের ষষ্ঠ সন্তান, রজিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, শান্ত এবং সাধারণতঃ নির্বিরোধ। তিনি বলবনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া চল্লিশের চক্রকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন পশ্চিম দিক হইতে মোঙ্গলগণ লুণ্ঠনের লোভে ভারতের সীমান্তে প্রতি বৎসর অভিযান করিতেছিল। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজগণ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বারংবার আঘাত করিতেছিল। নাসীরউদ্দীনের পূর্ববর্তী সুলতান রুকনউদ্দীন ফিরুজ শাহ, রজিয়া বেগম, বহরাম শাহ, মাস্‌দ শাহ—প্রত্যেকেই নিহত হইয়াছেন। রাজ-রক্তপাত নাসীরউদ্দীনকে শঙ্কান্বিত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি বুদ্ধিমানের মত "রাজকার্য হইতে পলায়ন করিয়া" বলবনের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন, বলবনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শঙ্কার আশঙ্কা প্রশমিত কবিলেন।

নাসীরউদ্দীনের চরিত্র

ঘিয়সউদ্দীন বলবনের উপব রাজ্যভার ন্যস্ত

বলবন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চল্লিশের চক্রের নায়ক। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা বলবন তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কিস্‌লু খান প্রাসাদরক্ষী এবং জ্ঞাতিভ্রাতা শের খান লাহোর ও ভাতিন্দার শাসক নিযুক্ত হইলেন। বলবন স্বয়ং সুলতানের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন (১২৪৯ খ্রীঃ)। সুলতানের শ্বশুরপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলবন স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করিলেন।

বলবনের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে নাসীরউদ্দীন মামুদ নিজেকে বিপন্ন বোধ করিলেন। ইমামউদ্দীন রাইয়ান নামক একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু নাসীরউদ্দীন মামুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া বলবন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিলেন। রাইয়ান রাজ্যের নায়েব নিযুক্ত হইলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ প্রধান কাজীর পদ হইতে অপসারিত হইলেন। রাইয়ান নিজের আত্মীয়দের বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। রাইয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও "ভারতীয় রক্তের অপরাধে" তুর্কী আমীরগণ রাইয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং বলবনের অধীনে সম্মিলিত হইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদ ভীত হইয়া রাইয়ানকে নায়েব পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি বলবনকে নায়েব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, মিনহাজ প্রধান কাজীর পদে পুনর্নিযুক্ত হইলেন। তুর্কী আমীরদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

বলবনের সাময়িক ক্ষমতা বিচ্যুতি (১২৫৩-৫৫ খ্রীঃ)

বলবন পুনরায় নায়েব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধির

করিবেন কিন্তু শাসন করিবেন না—এই শর্তে তাঁহাকে সিংহাসন দান করা হইল। এই শর্ত অনুসারে তিনি আলবারী আমীর ইখতিয়ারউদ্দীনকে নায়েব ই-মমলেকাৎ বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং প্রাচীন আলবারী মালিকদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। বাস্তবিক পক্ষে বহরাম শাহের রাজত্ব ছিল আমীরদেরই রাজত্ব। ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার বাসভবনে নহবৎ প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহার হস্তীশালার জন্য হস্তী ক্রয় করা হইল। নহবৎ ব্যবহার এবং হস্তী আরোহণে একমাত্র রাজারই একচ্ছত্র অধিকার ছিল। ইখতিয়ারউদ্দীন সুলতান বহরামের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন। ক্রমশ নায়েবের ক্ষমতা রাজক্ষমতাকে অতিক্রম করিল। সুলতান বহরাম ক্ষুব্ধ হইয়া নায়েব ইখতিয়ারউদ্দীনকে প্রকাশ্য রাজসভায় হত্যা করেন। তাঁহার রাজদ্রোহের অপরাধের পর তিনি আর কোন নায়েব নিযুক্ত করেন নাই। প্রধান আমীর মুনকারকেও তিনি হত্যা করিলেন। উলামাগোষ্ঠী তাঁহার বিরোধিতা করিলে বহরাম শাহ তাঁহাদিগকে হত্যা করিলেন। এই সময়ে (১২৪১ খ্রীঃ) মোঙ্গলগণ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া লাহোর অবরোধ করিল। বহরাম শাহ কর্তৃক লাহোর উদ্ধারের জন্য প্রেরিত সৈন্যদল বিদ্রোহ করিল। বহরাম পরাজিত ও নিহত হইলেন। তুর্কী আমীরদের অধিকার ও মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইখতিয়ারউদ্দীন রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত

ইখতিয়ারউদ্দীনের হত্যা

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪১ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ (১২৪১ খ্রীঃ): তুর্কী আমীরগণ স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইলতুৎমিসের পৌত্র, রুকনউদ্দীন ফিরুজের পুত্র, অপরিণত বয়স্ক মাসুদ শাহকে সিংহাসন দান করেন। শর্ত হইল মাসুদ শাহ "চাহাল-ই-বান্দাগান" বা চল্লিশ বান্দার চক্রের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করিবেন। মালিক কুতুবউদ্দীন হাসান সুলতানের নায়েব নিযুক্ত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা আমীরদের হস্তে চলিয়া গেল। উলুঘ খান বলবন নামক একজন ক্রীতদাস প্রাসাদরক্ষী আমীররূপে নিযুক্ত হইলেন। এই উলুঘ খান বলবনের চেষ্টায় রাজশক্তির মর্যাদা আংশিকভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু রাজধানীর বহির্ভাগে বাঙ্গলার শাসনকর্তা তুগান খান স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বিহার অধিকার করিলেন এবং অযোধ্যা অবরোধ করিলেন। মূলতান ও উচ দিল্লীর সম্পর্ক ছিন্ন করিল। মোঙ্গলগণ ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কারলুঘ খানের অধীনে উত্তর পাঞ্জাব অধিকার করিল। উলুঘ খান বলবন নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে রাজদরবারে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। আলাউদ্দীন মাসুদ শঙ্কিত হইয়া ইলতুৎমিসের পত্নীর (নাসীরউদ্দীন মুহম্মদের মাতা) সহযোগে ষড়যন্ত্র করিলেন। বলবন নাসীরউদ্দীন ও তাঁহার মাতার সহিত মাসুদের বিরুদ্ধে

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪৫ খ্রীঃ)

যোগদান করিলেন। মাসুদ নিহত হইলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

নাসীরউদ্দীন মামুদ (১২৪৬-৬৫ খ্রীঃ): নাসীরউদ্দীন মামুদ ছিলেন ইলতুৎমিসের ষষ্ঠ সন্তান, রজিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, শান্ত এবং সাধারণতঃ নির্বিরোধ। তিনি বলবনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া চল্লিশের চক্রকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন পশ্চিম দিক হইতে মোঙ্গলগণ লুণ্ঠনের লোভে ভারতের সীমান্তে প্রতি বৎসর অভিযান করিতেছিল। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজগণ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বারংবার আঘাত করিতেছিল। নাসীরউদ্দীনের পূর্ববর্তী সুলতান রুকনউদ্দীন ফিরুজ শাহ, রজিয়া বেগম, বহরাম শাহ, মাসুদ শাহ—প্রত্যেকেই নিহত হইয়াছেন। রাজ-রক্তপাত নাসীরউদ্দীনকে শঙ্কান্বিত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি বুদ্ধিমানের মত "রাজকার্য হইতে পলায়ন করিয়া" বলবনের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন, বলবনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শঙ্কার আশঙ্কা প্রশমিত করিলেন।

নাসীরউদ্দীনের চরিত্র

ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত

বলবন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চল্লিশের চক্রের নায়ক। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা বলবন তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কিস্‌লু খান প্রাসাদরক্ষী এবং জ্ঞাতিভ্রাতা শের খান লাহোর ও ভাতিন্দার শাসক নিযুক্ত হইলেন। বলবন স্বয়ং সুলতানের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন (১২৪৯ খ্রীঃ)। সুলতানের শ্বশুরপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলবন স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করিলেন।

বলবনের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে নাসীরউদ্দীন মামুদ নিজেকে বিপন্ন বোধ করিলেন। ইমামউদ্দীন রাইয়ান নামক একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু নাসীরউদ্দীন মামুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া বলবন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিলেন। রাইয়ান রাজ্যের নায়েব নিযুক্ত হইলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ প্রধান কাজীর পদ হইতে অপসারিত হইলেন। রাইয়ান নিজের আত্মীয়দের বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। রাইয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও "ভারতীয় রক্তের অপরাধে" তুর্কী আমীরগণ রাইয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং বলবনের অধীনে সম্মিলিত হইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদ ভীত হইয়া রাইয়ানকে নায়েব পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি বলবনকে নায়েব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, মিনহাজ প্রধান কাজীর পদে পুনর্নিযুক্ত হইলেন। তুর্কী আমীরদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

বলবনের সাময়িক ক্ষমতা বিচ্যুতি (১২৫৩-৫৫ খ্রীঃ)

বলবন পুনরায় নায়েব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধির

সুযোগ গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গলায় জাবিতান আইজউদ্দীন তুঘান খানকে পদচ্যুত করিয়া তিনি তামার খানকে প্রেরণ করিলেন; অবশ্য বাঙ্গলা দেশের সমস্যা ইহার দ্বারা সমাধান হয় নাই। বলবন মূলতান এবং সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করিলেন, মোঙ্গল ভীতি দূর করিলেন এবং স্থানীয় অসন্তুষ্ট রাজকর্মচারিদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। রাজ্যচ্যুত হিন্দু-রাজন্যবর্গ চান্দেল্লরাজ ত্রৈলোক্যবর্মার অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। বলবন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করিলেন, নারী এবং শিশুকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন। তারপর তিনি চারি বৎসরের মধ্যে মেওয়ার, রণথম্বর, কালিঞ্জর এবং গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া লক্ষ হিন্দুর রক্তে তুর্কী তরবারির রক্ত-পিপাসা দূর করিলেন।

বলবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

১২৬০ হইতে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসীরউদ্দীন মামুদের রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নীরব। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ এবং জিয়াউদ্দীন বারানী এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস সম্বন্ধে বলবনের কথাই বলিয়াছেন, নাসিরউদ্দীনের কথা বলেন নাই। ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান মামুদ পরলোক গমন করেন।

নাসীরউদ্দীন মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব: নাসিরউদ্দীন ছিলেন ইলতুৎমিসের ষষ্ঠ সন্তান। তাঁহার পূর্ববর্তী পাঁচ জন সুলতান ক্রমান্বয়ে নিহত হইয়াছিলেন। চল্লিশের চক্র এবং আলবারী আমীরগণ নিজেদের ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অমর্যাদা সহ্য করিতে পারেন নাই। বলবন প্রকৃতপক্ষে রজিয়া বেগম, বহরাম শাহ, আলাউদ্দীন মাসুদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ও বিচ্যুতি সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নাসীরউদ্দীন বলবনের হস্তে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা হইতে তাঁহার নিরীহ ও শান্ত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। নাসীরউদ্দীন তাঁহার মাতার সহযোগে আলাউদ্দীন মাসুদকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং বলবনের সহায়তা গ্রহণ করেন। সুযোগ উপস্থিত হইলে সাত বৎসর পরে তিনি বলবনকে পদচ্যুত ও অপমানিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার দুই বৎসর পরে বলবনের আক্রমণে ভীত হইয়া রাইহানকে পদচ্যুত করিয়া বলবনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন এবং বলবনের সাহায্য, সন্তুষ্টি ও শুভদৃষ্টি লাভ করেন। ইহা তাঁহার বিচক্ষণতার পরিচায়ক—নচেৎ বলবনের হস্তে তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল। আত্মরক্ষার জন্যই নাসীরউদ্দীন বলবনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

মিনহাজউদ্দীন তাঁহার তবকাৎ-ই-নাসীরী গ্রন্থ নাসীরউদ্দীন মামুদকেই উৎসর্গ করিয়াছেন এবং সেই গ্রন্থে নাসীরউদ্দীনের প্রশস্তি পাঠ করিয়াছেন। মিনহাজ বলিয়াছেন, নাসীরউদ্দীন রাজকোষ হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করেন

নাই এবং তাঁহার মহিষী স্বয়ং স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। সর্বশক্তিমান বলবনের কন্যা, সুলতান নাসীরউদ্দীনের পত্নী স্বহস্তে রন্ধন করিবেন—ইহা গর্বিত আলবারী তুর্ক পরিবারে অবিশ্বাস্য। কোরাণের অনুলিপি প্রস্তুত করা ছিল সেই যুগের ধর্মাচরণের বিলাস। বলবনের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করায় নাসীরউদ্দীনের প্রচুর অবসর ছিল, সুতরাং তিনি কোরাণের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া এবং কোরাণ পাঠ করিয়া মোল্লা ও কাজীদের চিত্তবিনোদন করিতেন। পদচ্যুত মিনহাজ পুনরায় নাসীরউদ্দীন কর্তৃক প্রধান কাজীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত নাসীরউদ্দীনের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত ভাবে নাসীরউদ্দীন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিশ বৎসর একাদিক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সহজ ভাবেই মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়াছেন। বলবনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এবং বলবনের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। শান্তি-প্রিয়তা অশান্তি পরিহারের উপায়রূপেই নাসীরউদ্দীন গ্রহণ করিয়াছিলেন; নাসীরউদ্দীন মামুদের শান্তিপ্রচেষ্টা নীতি ছিল না, ছিল উপায় মাত্র।

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রীঃ): বলবন ছিলেন জন্মে আলবারী তুর্ক। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত খান। পিতার অধীনে দশ সহস্র আলবারী তুর্ক ছিল। বলবনের প্রকৃত নাম বাহাউদ্দীন; বলবন তাঁহার প্রথম উপাধি, উলুঘ খান তাঁহার দ্বিতীয় উপাধি, ঘিয়াসউদ্দীন তাঁহার রাজ উপাধি। শৈশবে মোঙ্গল কর্তৃক ধৃত হইয়া প্রথমে গজনীর বাজারে, তারপরে বসরার বাজারে, সর্বশেষে দিল্লীর বাজারে বিক্রীত হন। ইলতুৎমিস বলবনের সুন্দর রূপ, শুভ লক্ষণযুক্ত ললাট এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। অচিরকাল মধ্যে ইলতুৎমিস তাঁহাকে চল্লিশ-চক্রে স্থান দান করিলেন। রজিয়া বেগম তাঁহাকে শিকারের সহচর নিযুক্ত করেন। কিন্তু বলবন রজিয়া বেগমকে পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। সুলতান বহরাম তাঁহাকে পঞ্জাবে একটি মালিকানা প্রদান করেন। মাসুদের সিংহাসনচ্যুতি এবং নাসীরউদ্দীনের সিংহাসন লাভ বলবনের সহায়তায় সম্ভব হইয়াছিল। নাসীরউদ্দীন তাঁহাকে প্রধান নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইবন বাত্‌তুতা বলেন যে, বলবন নাসীরউদ্দীনকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। সম্ভবত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

প্রারম্ভ জীবন

ঘিয়াসউদ্দীন বলবন বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার প্রচ্ছদপটে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা এবং রাজনীতির বহু বিচিত্র রূপের সঙ্গে বলবনের পরিচয় ছিল। আলবারী তুর্কী আমীরের রক্তের আভিজাত্য এবং বংশমর্যাদা সম্বন্ধে তিনি

অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদের শাসনকালে দুই বৎসর ব্যতীত দীর্ঘকাল তিনি শাসন পরিচালনা করিয়াছেন। কুতুবউদ্দীন হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি প্রত্যেক আলবারী সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের সমস্যা, রাজ্যবিচ্যুত হিন্দু রাজন্যবর্গের বিরোধিতা, বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে কি ভাবে ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি, উহার গতি এবং পরিণতি কি, তাহাও বলবনের অজ্ঞাত ছিল না। প্রথমে মধ্য এশিয়ার খানজাদা, তারপর গজনীর বাজারে বিক্রীত ক্রীতদাস, দিল্লীর বাজারে বিক্রীত 'দাসের দাস', ইলতুৎমিসের চল্লিশের চক্রের অন্যতম, রজিয়ার শিকার-সহচর, নাসীরউদ্দীনের নায়েব এবং শ্বশুর, মোঙ্গলের বিরুদ্ধে সফল সেনানায়ক—জীবনের বহুক্ষেত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা বলবনকে অত্যন্ত বাস্তববাদী করিয়া তুলিয়াছিল।

বলবনের ভারতীয় অভিজ্ঞতা

সিংহাসন লাভ করিয়া প্রথমেই বলবন রাজমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদের রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি ছিলেন নায়েব-ই-মোমালিক (রাজ্যের প্রতিনিধি)। বলবনই ছিলেন রাজ্যের কায়া, সুলতান নাসীরউদ্দীন মামুদ ছিলেন বলবনের ছায়া। সুতরাং বলবন রাজ্যলাভ করিয়া রাজশক্তি ও রাজমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

বলবন বিশ্বাস করিতেন—সুলতান ঈশ্বরের ছায়া; ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ সুলতানের উপর ছায়া সম্পাত করে; সাধারণ মানুষ হইতে সুলতান পৃথক। এইজন্য নিজেকে তুরাণের কিংবদন্তী-বিখ্যাত আফরাসিয়াবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বলবন বিশ্বাস করিতেন—যে সুলতানকে প্রজাবর্গ ভয় করে না, তিনি সুলতানই নহেন; প্রজার ভীতিই রাজশক্তির ভিত্তি। তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি ভীতির প্রাচীর উত্তোলন করিয়াছিলেন তিনি দীর্ঘদেহ, ভীম দর্শন, উজ্জ্বল পরিচ্ছদ শোভিত, কোষ-মুক্ত তরবারি-হস্ত তুর্কী দেহরক্ষী দ্বারা অষ্ট প্রহর পরিবৃত থাকিতেন। নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বক্ষণ বলবল স্বয়ং সৈনিকের পরিচ্ছদে ভূষিত থাকিতেন। তাঁহার দর্শনলাভ প্রজাবর্গের পক্ষে একটি দুর্লভ সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সাধারণ প্রজা অথবা নিম্নশ্রেণীর আমীরদের সহিত বলবন বাক্যালাপ করিতেন না। দিল্লীর দরবার পারস্যের দরবারের অনুরূপে সুসজ্জিত করা হইল। পারস্য প্রাসাদের অনুকরণে নওরোজ বা নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠান করা হইত। তাঁহার দরবারের জন্য মধ্য এশিয়ার সেলজুক দরবারের আচার-নিয়ম নির্ধারিত হইল—দরবারে হাস্যপরিহাস নিষিদ্ধ হইল, দরবারে সুরাপান ও নর্তকীর নৃত্য সম্পূর্ণ বর্জিত হইল। দরবারে প্রবেশমাত্রই আমীর-ওমরাহ সকলেই সুলতানের

সুলতান বলবনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

রাজপদের মর্যাদা

পদচুম্বন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন। প্রত্যেক কর্মচারীকে পদমর্যাদা-অনুরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইত। রাজ দরবারের আচার ব্যবহারের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা শিথিলতা বলবন সহ্য করিতেন না। এই প্রকার কঠোরতার মাধ্যমে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবন রাজমর্যাদা, তথা আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইলতুৎমিস তাঁহার শাসনকালে তাঁহার অগণিত ক্রীতদাসের মধ্য হইতে চল্লিশ জন বিশ্বস্ত, কর্মক্ষম ক্রীতদাসকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি চক্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা সুলতানের পার্শ্বচর ও পরামর্শদাতা রূপে রাজ্যের সকল কার্য নির্বাহ করিতেন। বলবন এই চল্লিশের চক্রের অন্যতম সভ্য ছিলেন। ইলতুৎমিসের পর চল্লিশের চক্রের সভ্যগণ ইলতুৎমিসের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে ষড়যন্ত্র ও নরহত্যার দ্বারা সমস্ত ক্ষমতা স্বকীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং আত্মীয়বর্গের মধ্যে রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলি বিভক্ত করিয়া লইলেন।

বলবন ও চল্লিশের চক্র

শেষ পর্যন্ত এই চল্লিশের চক্রই ছিল রাজ্যের সর্বাধিনায়ক। বলবন চল্লিশের চক্রের কীর্তি, অকীর্তি বা কুকীর্তির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, চল্লিশের চক্রই সুলতানের ক্ষমতার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং যে কোন উপায়েই হউক তাহাদের শক্তি খর্ব করিতে হইবে প্রথমেই তিনি বদাউনের শাসনকর্তা মালিক বকবককে ভৃত্য হত্যার অপরাধে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা হায়বৎ খানকে মত্ত অবস্থায় একজন নিরপরাধকে হত্যা করার অপরাধে পাঁচ শত বেত্রাঘাত করা হইল এবং বিশ সহস্র টঙ্কা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। লজ্জায় হায়বৎ খান মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অন্তঃপুরচারী হইয়াই ছিলেন। অন্য একজন শাসনকর্তা আমীন খান (আমীর খান?) বাঙ্গলার মঘিসউদ্দীন তুঘ্রিল খান কর্তৃক পরাজিত হইলে—পরাজয়ের শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে অযোধ্যা নগরীর প্রবেশপথে ফাঁসিমঞ্চে হত্যা করা হইল। কথিত আছে, চল্লিশের চক্রের অন্যতম বিখ্যাত শক্তিমান পুরুষ বলবনের জ্ঞাতিভ্রাতা শের খানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল। এইরূপে বলবন চল্লিশের চক্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া রাজশক্তি নিরাপদ করিলেন। রাজশক্তির প্রয়োজন বোধে বলবন কখনও ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন নাই। বলবনের পক্ষে প্রয়োজন ছিল মুখ্য, উপায় ছিল গৌণ।

বহুদিন সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে বলবন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সমগ্র রাজ্যব্যাপী গুপ্তচরের জাল বিস্তার করিলেন। গুপ্তচরগণ কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সেনাপতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল না। তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে দিল্লীর সুলতানের সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিত। তাহাদের প্রদত্ত সংবাদ

অসম্পূর্ণ বা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হইত। মালিক বকবক সম্বন্ধে বদাউনের গুপ্তচর যথাসময়ে ভৃত্য হত্যার সংবাদ প্রেরণ করে নাই—এই অপরাধে সেই গুপ্তচরকে নগরের প্রবেশ-তোরণে ফাঁসিমঞ্চে হত্যা করা হইয়াছিল। সমস্ত রাজ্য গুপ্তচরদের ভয়ে কম্পমান ছিল। গুপ্তচর বিভাগ ছিল বলবনের তীক্ষ্ণতম অস্ত্র।

বলবনের গুপ্তচর বিভাগ

সামরিক শক্তিই ছিল বলবনের রাজশক্তির ভিত্তি। বলবনের সৈন্যগণ দিবসের যে কোন মুহূর্তে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিত। তুর্কী আমীরদের ষড়যন্ত্র, পরাজিত হিন্দু রাজন্যবর্গের বিদ্রোহের সম্ভাবনা এবং ভারতের সীমান্তে মোঙ্গলদিগের অভিযান বলবনকে সদা-সর্বদা সন্ত্রস্ত রাখিত। তিনি চল্লিশের চক্রকে শক্তিহীন করিয়া তুর্কী আমীরদের আত্মকলহ নিবারণ করিলেন। ইলতুৎমিসের পর হইতে বিগত বিশ বৎসরের দুর্বলতার সুযোগে বহু রাজপুত গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে, অযোধ্যায়, রোহিলাখণ্ডে ও কম্পিলায় মুসলিম শক্তিকে পরাভূত করিয়াছিল। বাঙ্গলা, বিহার ও রাজস্থানে হিন্দু সামন্তবর্গ দিল্লীর শক্তিকে নানাপ্রকারে নানাভাবে বিব্রত কবিতেছিল। বলবন হিন্দুবিদ্রোহ আংশিকমাত্র দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একমাত্র বাঙ্গলা দেশেই তিনি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে বাঙ্গলাব শাসনকর্তা মঘিসউদ্দীন তুঘ্রিল খান ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন, নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিলেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ করিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খান বলবনের আদেশে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পরাজিত হইলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিযানও ব্যর্থ হইল। অশীতি-বৎসর বয়স্ক সুলতান বলবন স্বয়ং প্রায় তিন লক্ষ সৈন্যসহ বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে ছিল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খান। তিন বৎসর তুঘ্রিলের অনুসন্ধানে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান করিলেন, শেষ পর্যন্ত তুঘ্রিল নিহত হইলেন। জিয়াউদ্দীন বারাণী বলেন—"বিদ্রোহীদের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তুঘ্রিলের পুত্র-কলত্র আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলকেই লখ্‌নৌতির রাজপথের পার্শ্বে প্রকাশ্যে ফাঁসিকাষ্ঠে, বৃক্ষশাখায় অথবা বংশদণ্ডে বিলম্বিত করিয়া হত্যা করা হয়। লখ্‌নৌতির প্রতিটি গৃহ অগ্নিসাৎ করা হয়। ভীষণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া বলবন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।" এই ছিল বলবনের জিঘাংসার রূপ।

বিদ্রোহ দমন

মঘিসউদ্দীন তুঘ্রিল খানের স্বাধীনতা ঘোষণা (১২৭৯ খ্রীঃ)

ইলতুৎমিসের সময় মোঙ্গলগণ হিন্দুস্থানেব সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু

তাহারা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে নাই। বহু মোঙ্গল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা প্রায় প্রতি বৎসরই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শস্য ও সম্পদ লুণ্ঠন করিত। বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অভিজ্ঞ ও সমরপটু দুর্ধর্ষ সৈন্য নিযুক্ত করিলেন এবং সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ করিলেন। ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মূলতান, সিন্ধু ও লাহোরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদকে এবং সুনাম ও সামানা প্রদেশে দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানজাদা মুহম্মদ মোঙ্গল আক্রমণে নিহত হইলেন। প্রিয়পুত্রের নিধন সংবাদে বৃদ্ধ সুলতান শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তিনি রাজকর্তব্য বিস্মৃত হন নাই।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

সুলতানজাদা মুহম্মদকে বলবন তাঁহার উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। মুহম্মদের মৃত্যুর পর বলবন অত্যন্ত অসুস্থ হইলেন এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে রোগশয্যা পার্শ্বে আহ্বান করিলেন। বুঘরা খান পিতার ভয়ে এত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, মাস দুই-তিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারেই তিনি বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অন্যদিকে দিল্লীর সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বের কণ্টক সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের সীমান্তে মোঙ্গলদের পদধ্বনিও তাঁহাকে সচকিত করিত। সুতরাং বৃদ্ধ সুলতান বলবন জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদের পুত্র কাইখসরুকে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান হইল।

বলবনের মৃত্যু

সুলতান বলবনের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ বলবন দাসরাজগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহাকে কঠোর বাস্তববাদী করিয়াছিল। রাজশক্তি ও রাজপদের মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি চল্লিশের চক্রকে ক্ষমতাচ্যুত করিলেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত সংবাদ তাঁহার নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত। রাজদরবারের নিয়ম ও অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রবর্তন করিয়া বলবন রাজদরবারের আড়ম্বর ও চাকচিক্য বৃদ্ধি করিলেন। রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে শিশু তুর্কীরাষ্ট্রকে সুসংহত করিয়া তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দমন, সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ—তাঁহার শক্তির প্রধান পরিচায়ক। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, বন্ধু-হত্যা করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত রূঢ় সত্য। কিন্তু সেই যুগে এই কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতারও প্রয়োজন ছিল। ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের কার্যকলাপ সমসাময়িক যুগের আদর্শ অনুযায়ী বিচার্য।

বাস্তববাদী বলবন

চল্লিশের চক্রের ক্ষমতা হ্রাস

রাজদরবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন

বলবন যে কেবল সুশাসক ও বীর ছিলেন তাহা নহে। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লী নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার বহু বিদ্বান ব্যক্তি এবং মোঙ্গল বিতাড়িত সতর জন 'রাজ্যহারা রাজা' তাঁহার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি আমীর খসরু এবং ইতিহাসকার মীনহাজ-উস্‌-সিরাজ তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন।

দিল্লী মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র

সুলতান বলবনের দুর্বল উত্তরাধিকারী (১২৮৭-১২৯০ খ্রীঃ): দিল্লীর কোতোয়াল ফকরউদ্দীনের নেতৃত্বে আমীরগণ বলবনের মনোনীত কাইখসরুকে অগ্রাহ্য করিয়া বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। সুলতান বলবন তাঁহার বংশের প্রত্যেকটি সন্তানকে রাজোচিত শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কায়কোবাদ ছিলেন তরলমতি উচ্ছৃঙ্খল যুবক। তাঁহার অযোগ্যতার ফলে বলবনের কঠোর শাসন বিলুপ্ত হইল। আমীরগণ কায়কোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার নাবালক পুত্র কায়ুরমাসকে সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই জালালউদ্দীন ফিরুজ খলজী নামক একজন পরাক্রান্ত আমীব কায়কোবাদ ও কায়ুবমাসকে হত্যা কবিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

কায়কোবাদ

কায়ুরমাস

ভারতে মুসলিম রাজ্যস্থাপনে দাসগোষ্ঠীর দান: ভারতের ইতিহাসের প্রচ্ছদপটে দাস রাজগোষ্ঠীর দান অবিস্মরণীয়। দাসরাজগণ প্রায় সম্পূর্ণ ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া উত্তর ভারত শাসন করিয়াছিলেন, হিন্দু রাজশক্তি বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লীতে স্বাধীন মুসলিম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতে মুসলিম রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত দিল্লী মুসলিম শক্তির প্রাণকেন্দ্র ছিল। দাসরাজ কুতুবউদ্দীন গজনী এবং ঘুর প্রভৃতি বহির্ভারতীয় মুসলিম রাজশক্তির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন। দাসরাজ ইলতুৎমিস ভারতে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াও অনুষ্ঠানিকভাবে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলে ভারতীয় মুসলিম এবং বহির্ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। দাসগোষ্ঠী ধর্মে মুসলমান হইলেও তাহারা মুসলমান ধর্মের ভাষা আরবীকে ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তন করেন নাই। তাঁহারা ফার্সী ভাষাকে, মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইরাণের ফার্সী এবং ভারতের সংস্কৃত ভাষা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সুতরাং ফার্সী, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সহজেই উর্দু নামক একটি নূতন

ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন

ফার্সী ভাষা মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রভাষা

ভাষার উদ্ভব হয় এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় একটি নূতন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সমন্বয়ী ধারা উন্মেষণের ফলে ভারতীয় কৃষ্টি নূতন-ভাবে পরিকল্পিত ও প্রচলিত হয়।

ইসলামের দিক দিয়া বিচার করিলে নব দীক্ষিত তুর্কী জাতি ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব স্থাপন করিয়া ইসলামের নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই দাস রাজত্বের মধ্যেই, মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খান ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১২২১ খ্রীঃ) এবং ইলতুৎমিস চেঙ্গিসের শত্রু জালালউদ্দীনের আশ্রয়-ভিক্ষা প্রত্যাখান করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খানের বংশধর হলাগু খান মুসলমান রাজকেন্দ্র বাগদাদ ধ্বংস করিয়াছিলেন (১২৫৮ খ্রীঃ)। এই দাসরাজগণ ভারতে নূতন মুসলিম রাজ্য স্থাপন করিয়া ইসলামকে আশু ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; ঘিয়াসউদ্দীন বলবন সুদীর্ঘ বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে ভারতের সীমান্ত হইতে, মোঙ্গল আক্রমণকারি-দিগকে একাধিকবার বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মোঙ্গল জাতি ভারতবর্ষে দাসরাজ্য ধ্বংস করিলে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানে মুসলিমদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার স্থানও থাকিত কিনা সন্দেহ।

মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খানের ভারত সীমান্তে উপস্থিতি

মোঙ্গল বিতাড়ন

ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের দূরদর্শিতা

ধর্মান্তরিত নব দীক্ষিত তুর্কীজাতি ভারতবর্ষ জয় করার ফলে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজে কতিপয় নূতন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। দাস রাজত্বের সময়ে প্রথম এবং একমাত্র মুসলিম নারী রজিয়া বেগম আনুষ্ঠানিক ভাবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বলবন পারসিক বাজপরিবারের প্রথা এবং রাজসভার আড়ম্বর ভারতবর্ষে প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা কবি, গুণী এবং জ্ঞানীর জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। দাস রাজত্বের সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমগণ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবদের মত সমগ্র বিজিত জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজিত বিধর্মীর উপর নিরঙ্কুশ-ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া অথচ বিজিতকে ধর্মান্তরিত না করিয়া পৃথিবীর মুসলিম ইতিহাসে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিল। দাস সুলতানগণ জিজিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেই বিধর্মী হিন্দু প্রজাদিগকে কতকগুলি সাধারণ অধিকার প্রদান করিতেন। মুসলমান সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিজিত হিন্দু তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে পারিত, যেমন—হিন্দুগণ মৃতদেহ দাহ করিতে পারিত, নিজেদের মঠে-

মুসলিম নারীর সিংহাসনারোহণ

সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মীর প্রতি মুসলিমগণের আচরণ

বলবন যে কেবল সুশাসক ও বীর ছিলেন তাহা নহে। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লী নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার বহু বিদ্বান ব্যক্তি এবং মোঙ্গল বিতাড়িত সতর জন 'রাজ্যহারা রাজা' তাঁহার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি আমীর খসরু এবং ইতিহাসকার মীনহাজ-উস্-সিরাজ তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন।

দিল্লী মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র

সুলতান বলবনের দুর্বল উত্তরাধিকারী (১২৮৭-১২৯০ খ্রীঃ): দিল্লীর কোতোয়াল ফকরউদ্দীনের নেতৃত্বে আমীরগণ বলবনের মনোনীত কাইখসরুকে অগ্রাহ্য করিয়া বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। সুলতান বলবন তাঁহার বংশের প্রত্যেকটি সন্তানকে রাজোচিত শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কায়কোবাদ ছিলেন তরলমতি উচ্ছৃঙ্খল যুবক। তাঁহার অযোগ্যতার ফলে বলবনের কঠোর শাসন বিলুপ্ত হইল। আমীরগণ কায়কোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার নাবালক পুত্র কায়ুরমাসকে সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই জালালউদ্দীন ফিরুজ খলজী নামক একজন পরাক্রান্ত আমীর কায়কোবাদ ও কায়ুরমাসকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

কায়কোবাদ

কায়ুরমাস

ভারতে মুসলিম রাজ্যস্থাপনে দাসগোষ্ঠীর দান: ভারতের ইতিহাসের প্রচ্ছদপটে দাস রাজগোষ্ঠীর দান অবিস্মরণীয়। দাসরাজগণ প্রায় সম্পূর্ণ ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া উত্তর ভারত শাসন করিয়াছিলেন, হিন্দু রাজশক্তি বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লীতে স্বাধীন মুসলিম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতে মুসলিম রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত দিল্লী মুসলিম শক্তির প্রাণকেন্দ্র ছিল। দাসরাজ কুতুবউদ্দীন গজনী এবং ঘুর প্রভৃতি বহির্ভারতীয় মুসলিম রাজশক্তির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন। দাসরাজ ইলতুৎমিস ভারতে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াও অনুষ্ঠানিকভাবে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলে ভারতীয় মুসলিম এবং বহির্ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। দাসগোষ্ঠী ধর্মে মুসলমান হইলেও তাহারা মুসলমান ধর্মের ভাষা আরবীকে ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তন করেন নাই। তাঁহারা ফার্সী ভাষাকে মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইরাণের ফার্সী এবং ভারতের সংস্কৃত ভাষা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সুতরাং ফার্সী, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সহজেই উর্দু নামক একটি নূতন

ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন

ফার্সী ভাষা মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রভাষা

ভাষার উদ্ভব হয় এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় একটি নূতন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সমন্বয়ী ধারা উন্মেষণের ফলে ভারতীয় কৃষ্টি নূতন-ভাবে পরিকল্পিত ও প্রচলিত হয়।

ইসলামের দিক দিয়া বিচার করিলে নব দীক্ষিত তুর্কী জাতি ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব স্থাপন করিয়া ইসলামের নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই দাস রাজত্বের মধ্যেই মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খান ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১২২১ খ্রীঃ) এবং ইলতুৎমিস চেঙ্গিসের শত্রু জালালউদ্দীনের আশ্রয়-ভিক্ষা প্রত্যাখান করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নাসীরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খানের বংশধর হলাগু খান মুসলমান রাজকেন্দ্র বাগদাদ ধ্বংস করিয়াছিলেন (১২৫৮ খ্রীঃ)। এই দাসরাজগণ ভারতে নূতন মুসলিম রাজ্য স্থাপন করিয়া ইসলামকে আশু ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; ঘিয়াসউদ্দীন বলবন সুদীর্ঘ বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে ভারতের সীমান্ত হইতে মোঙ্গল আক্রমণকারি-দিগকে একাধিকবার বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মোঙ্গল জাতি ভারতবর্ষে দাসরাজ্য ধ্বংস করিলে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানে মুসলিমদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার স্থানও থাকিত কিনা সন্দেহ।

মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খানের ভারত সীমান্তে উপস্থিতি

মোঙ্গল বিতাড়ন

ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের দূরদর্শিতা

ধর্মান্তরিত নব দীক্ষিত তুর্কীজাতি ভারতবর্ষ জয় করার ফলে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজে কতিপয় নূতন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। দাস রাজত্বের সময়ে প্রথম এবং একমাত্র মুসলিম নারী রজিয়া বেগম আনুষ্ঠানিক ভাবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বলবন পারসিক রাজপরিবারের প্রথা এবং রাজসভার আড়ম্বর ভারতবর্ষে প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা কবি, গুণী এবং জ্ঞানীর জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। দাস রাজত্বের সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমগণ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবদের মত সমগ্র বিজিত জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজিত বিধর্মীর উপর নিরঙ্কুশ-ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া অথচ বিজিতকে ধর্মান্তরিত না করিয়া পৃথিবীর মুসলিম ইতিহাসে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিল। দাস সুলতানগণ জিজিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেই বিধর্মী হিন্দু প্রজাদিগকে কতকগুলি সাধারণ অধিকার প্রদান করিতেন। মুসলমান সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিজিত হিন্দু তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে পারিত, যেমন—হিন্দুগণ মৃতদেহ দাহ করিতে পারিত, নিজেদের মঠে-

মুসলিম নারীর সিংহাসনারোহণ

সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মীর প্রতি মুসলিমগণের আচরণ

মন্দিরে মূর্তিপূজা করিতে পারিত, প্রকাশ্যে মন্থ ক্রয়-বিক্রয় ও পান করিতে পারিত। এইগুলি সবই ইসলাম বিগর্হিত কার্য। হিন্দুগণ জাতিভেদ, সতীদাহ ইত্যাদি প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিত। দাসরাজগণ কর্তৃক অনুসৃত হিন্দু-মুসলমানের আদান-প্রদান পরবর্তী-কালে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছিল। দাসরাজগণ ভারতে সামঞ্জস্যমূলক মুসলিম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব স্থাপনে দাস রাজগোষ্ঠীর দান অনস্বীকার্য।

হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান

অনুশীলনী

১। দাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এই বংশকে দাস রাজগোষ্ঠী বলা হয় কেন ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
(Who is the real founder of the Slave Group or line of kings ? Why is this line called Slave Group or line ?)

২। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের কার্যাবলী ও রাজত্বের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(Narrate the events of the reign of Iltutmis. Show the importance of the rule of Iltutmis)

৩। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের জীবনী ও কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(Sketch the career of Balban and narrate the chief events of his reign.)

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) রজিয়া বেগম (খ) নাসীরউদ্দীন মামুদ (গ) মোঙ্গল আক্রমণ।
(Write short notes on : (a) Raziah Begum. (b) Nasiruddin Mahmud. (c) Mongal invasions during the Slave period.)

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলজী রাজত্ব (১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ)

অধ্যায় পরিচয়ঃ এই অধ্যায়ে ঘটনাবহুল খলজী রাজত্বের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনজন মাত্র খলজী সুলতান মাত্র ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই স্বল্প পরিসর কালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছিল; খলজী যুগেই দক্ষিণ ভারতে প্রথম মুসলিম জাতি প্রবেশ করিয়াছিল। আলাউদ্দীন ধর্মে মুসলমান হইলেও রাজনীতিতে ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। তিনি ভারতবর্ষকে মোঙ্গল ভীতি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বহু অত্যাচার এবং অনাচার সত্ত্বেও আলাউদ্দীনের রাজত্ব সফল, কিন্তু সার্থক নহে।

খলজী বংশ পরিচয়ঃ এই বংশের আদিপুরুষ ছিলেন তুলক খান কুন্দুজী।* কাহারও মতে খলজী বংশ আফঘান; মতান্তরে তাহারা তুর্ক বংশজাত। খলজীদের আদি বাসভূমি তুর্কীস্থান। হেলমন্দ উপত্যকা, লামঘান, গরমসির এবং আফঘানিস্থানের খলজ নদীর তীরবর্তী খলজ নামক গ্রামে তাহারা বসবাস করিত। সুতরাং রক্তে তুর্কী হইলেও এই গোষ্ঠী খলজী-আফঘান বংশ নামে ভারতের ইতিহাসে পরিচিত। জালালউদ্দীন ফিরুজ খলজী হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া দিল্লীর সুলতানের অধীনে দেহরক্ষী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই খলজীবংশ প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের একটি শাখা ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন খলজীর অধীনে বঙ্গদেশের একাংশ জয় করে। অন্য একটি শাখা মালবে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। জালালউদ্দীন ফিরুজ দাসরাজদিগের অধীনে সামানা ও উত্তর প্রদেশে শাসক

খলজীদের আদি বাসস্থান

জালালউদ্দীন ফিরুজ খলজীর হিন্দুস্থানে আগমন
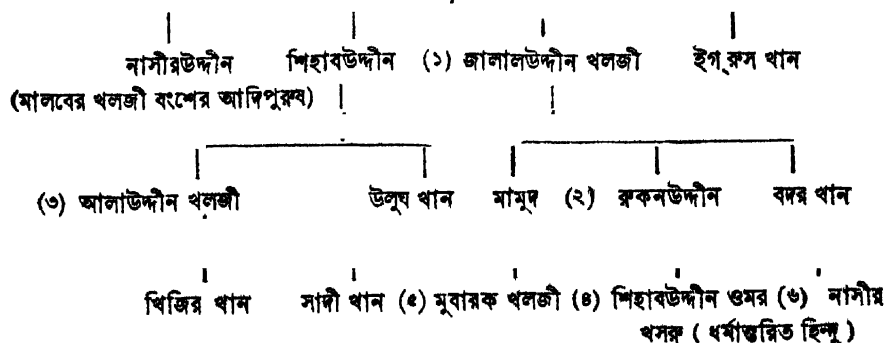
নিযুক্ত হন। কায়কোবাদের রাজত্বকালে তিনি আমীর উল-ওমারা (প্রধান আমীর) পদে উন্নীত হন। সুলতান কায়কোবাদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্র কায়ুরমাসকে হত্যা করিয়া জালালউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর।

জালালউদ্দীনের সিংহাসন অধিকার

সুলতান জালালউদ্দীন (১২৯০-৯৬ খ্রীঃ)ঃ সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ জালালউদ্দীন প্রভুপুত্রকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইলেন; কিন্তু দাসচক্রের অনুবর্তী আলবারী তুর্কগণ খলজী গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসনে আলবারী গোষ্ঠীর বহির্ভূত কোন ব্যক্তি উপবেশন করিবে—ইহা আলবারী তুর্কগণের অসহ্য ছিল। সুতরাং জালালউদ্দীন খলজী তিলোখরির অসমাপ্ত প্রাসাদে তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, দিল্লীতে শুভানুষ্ঠান করিতে সাহস করেন নাই।

জালালউদ্দীনের অভিষেক

জালালউদ্দীন জীবনের শেষভাগে নিতান্ত শান্তিপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক ছাজ্জু কারা মানিকপুরে বিদ্রোহ করিয়া পরাজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলেন। জালালউদ্দীন খলজী গর্বিত আলবারী বংশীয় সন্তান মালিক ছাজ্জুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দর্শন করিয়া প্রকাশ্য দরবারে অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তারপর বিদ্রোহীদিগকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদিগের সম্মানার্থে সুরাপান উৎসবের আয়োজন করিলেন। আমীর আহম্মদ চাপ শত্রুর প্রতি এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলে জালালউদ্দীন উত্তর দিয়াছিলেন—"ক্ষণস্থায়ী রাজ্যের জন্য আমি কোন মুসলিমের এক বিন্দুও রক্তপাত করিতে পারিব না।" মালিক ছাজ্জুর স্থানে স্বীয় ভ্রাতা শিহাবউদ্দীনের পুত্র **আলাউদ্দীনকে** কারা মানিকপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

জালালউদ্দীনের শান্তি নীতি

রাজ্যে অনর্থ দমনোদ্দেশ্যে বারাণী কর্তৃক অভিহিত 'ঠগ' নামক দস্যুদলকে তিনি বন্দী করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান করিয়া জালালউদ্দীন নদীপথে বাঙ্গলা দেশে প্রেরণ করেন। কিছুকাল পরে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু এই শান্তিনীতি দ্বারা তিনি পরোক্ষে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেন। আলাউদ্দীন তাঁহার বিনা অনুমতিতে দেবগিরিরাজ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন (১২৯৪ খ্রীঃ)। এই আচর রাজনীতি বিরুদ্ধ। তথাপি জালালউদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাস্তি ত দিলেনই না, বরং অযোধ্যার শাসনভার অর্পণ করিলেন।

নও মুসলিমঃ ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে হলাগু খানের পৌত্রের পরিচালনায় এক লক্ষ মোঙ্গল পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়াছিল। জালালউদ্দীন মোঙ্গল গোষ্ঠীর এক অংশকে দিল্লীতে বাসের

অনুমতি দিলেন ; এই মোঙ্গলগণ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জালালউদ্দীন তাহাদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া 'নও মুসলিম' নামে আখ্যায়িত করিলেন। মোঙ্গল নায়ক হলাগু খানের হস্তে এক কন্যা সম্প্রদান করিয়া জালালউদ্দীন নও মুসলিমদিগকে সম্মানিত করিলেন।

সুলতানী জীবনে তিনি রাজদ্রোহের সন্দেহে একমাত্র সৌদি মৌলাকে তাঁহার সম্মুখে ক্ষুর এবং সূচ দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিয়া শাস্তি দেন, পরিশেষে হস্তিপদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করেন।

জালালউদ্দীনের ধর্মনীতি : জালালউদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি হিন্দুর বহু মন্দির অপবিত্র করেন এবং বিগ্রহ ধ্বংস করেন তিনি হিন্দু রাজ্য রণথম্বর ও চান্দাওয়ারের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান করেন। আলাউদ্দীনের মালব ও দেবগিরি অভিযান নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য না হইলেও বিধর্মীর বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া তিনি আলাউদ্দীনকে ক্ষমা করেন এবং প্রশংসা করেন। হিন্দু-প্রজা মুসলিম রাজ্যে ধর্মাচরণ করিত বলিয়া তিনি একদা প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন মালব, ভিলসা এবং দেবগিরি লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর স্বর্ণরৌপ্য, মণিমুক্তা সংগ্রহ করেন। দরবারের আমীরবর্গ আলাউদ্দীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সিংহাসনের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি সম্বন্ধে জালালউদ্দীনকে সতর্ক করিয়া দিলেন। আলাউদ্দীনের ভ্রাতা উলাঘ খান জালালউদ্দীনের নিকট শ্বশুর-জামাতার মিলনের জন্য সাক্ষাতের প্রস্তাব কবিলেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কারাতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। জালালউদ্দীন বন্ধুবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও প্রায় অরক্ষিত অবস্থাতেই আলাউদ্দীনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং স্নেহভরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে মুহম্মদ সলিম নামক একজন অনুচর তাঁহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিল এবং ইখতিয়ারউদ্দীন নামক অন্য একজন গুপ্তঘাতক সুলতানের শির স্কন্ধচ্যুত করিল (১২৯৬ খ্রীঃ)। সঙ্গে সঙ্গে জালালউদ্দীনের বহু অনুচর নিহত হইল। আলাউদ্দীন নিজেকে শিবিরেই সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জালালউদ্দীনের ছিন্নশির বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া কারা মানিকপুর এবং অযোধ্যার রাজপথে বিজয়ের স্মারকরূপে প্রদর্শিত হইল। জালালউদ্দীন লুণ্ঠিত দ্রব্যের লোভেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

জালালউদ্দীনের হত্যা

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ) : আলাউদ্দীন ছিলেন জালালউদ্দীনের ভ্রাতা শিহাবউদ্দীনের পুত্র এবং জালালউদ্দীনের জামাতা। খুল্লতাতের সিংহাসনারোহণের দিনে তিনি আমীর-ই-তুজুক পদে উন্নীত হইলেন। তিনি মালিক ছাজ্জুর পরাজয়ের পরে এলাহাবাদের নিকটবর্তী কারা মানিকপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথমেই সুলতানের অনুমতিক্রমে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

আলাউদ্দীনের প্রাক্-সুলতানী জীবন

মালব আক্রমণ করেন এবং ভিলসা লুণ্ঠন করেন। ইসলামের রীতি অনুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ তিনি জালালউদ্দীনকে প্রেরণ করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ অযোধ্যার শাসনভার লাভ করেন। সাফল্যে উল্লসিত হইয়া তিনি দেবগিরি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন এবং রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। রাজা রামচন্দ্র দুই শত মণ স্বর্ণ, আড়াই মণ মুক্তা, আধ মণ মণি, তিন শত পঁয়তাল্লিশ মণ রৌপ্য এবং এক সহস্র রেশম বস্ত্র উপহার প্রেরণ করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। ফলে জালালউদ্দীন ইলিচপুরের (বেরার) শাসনভার আলাউদ্দীনের হস্তে অর্পণ করেন। আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের বিজয়-পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময়ে আলাউদ্দীনের সঙ্গে তাঁহার পত্নীর মনোমালিন্য চলিতেছিল এবং দিল্লীর রাজপ্রাসাদেও আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। কাহারও মতে আলাউদ্দীন উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া সুলতান জালালউদ্দীনকে হত্যা করেন। অবশ্য এই হত্যার পশ্চাতে রাজসিংহাসনের লোভই প্রবলতর ছিল।

মালব আক্রমণ ও ভিলসা লুণ্ঠন

আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য অভিযান

আলাউদ্দীন পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিষ্কণ্টক সিংহাসন লাভ করেন নাই। তাঁহাকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল—জালাল-উদ্দীনের মহিষী মালিকা জাহান ও তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন ইব্রাহিমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জালালী আমীরদের অনমনীয় মনোভাব, রাজদরবারে আমীরদের ষড়যন্ত্র, তুর্ক জাতীয় যোদ্ধবর্গের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, দিল্লীর উপকণ্ঠে নবদীক্ষিত মোঙ্গল মুসলিমদের বিদ্রোহ, বহির্ভারতীয় মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং রাজপুতানা, মালব, গুজরাট ও বঙ্গদেশে বারংবার হিন্দুদের বিদ্রোহ। আলাউদ্দীনের শাসিত প্রদেশ কারা হইতে দিল্লী ছিল অনেক দূরে। সুতরাং কারাতে আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দিল্লী আগমন পর্যন্ত অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহাকে দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আলাউদ্দীন সামরিক শক্তি, কুটিল নীতি, বাস্তববুদ্ধি, মুক্তহস্তে উৎকোচ প্রদান এবং দানবীয় নৃশংসতা দ্বারা এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের সমস্যা

সমস্যার সমাধান

প্রথমেই মালিকা জাহান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে সুলতান রুকনউদ্দীন ইব্রাহিম নামকরণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু জালাল-উদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্জাবের শাসনকর্তা আরকলি খান কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সুলতানরূপে অস্বীকার করিলেন। আরকলি খানের সঙ্গে বহু জালালী আমীর যোগ দিলেন। আলাউদ্দীন এই বিভেদের সংবাদে উৎসাহিত হইয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে পথে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যের লুণ্ঠিত অর্থ বিতরণ করিয়া জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিলেন। অনেকেই

অর্থলোভে আলাউদ্দীনের সৈন্যদলে যোগ দিল। ষাট হাজার পদাতিক এবং ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ আলাউদ্দীন বদাউনের অদূরে রুকনউদ্দীনের সৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইব্রাহিম পরাজিত হইয়া মাতা মালিকা জাহানের সহিত দিল্লী ত্যাগ করিয়া মূলতানে আকলি খানের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। আলাউদ্দীন দ্বিতীয় বায় দিল্লীতে বলবনের লালকেল্লায় অভিষিক্ত হইলেন (অক্টোবর, ১২৯৬ খ্রীঃ)।

অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ

আলাউদ্দীন জানিতেন—জনসাধারণের স্মৃতি অত্যন্ত দুর্বল এবং রৌপ্যখণ্ডের ক্ষমতা অসীম। সুতরাং তিনি দেবগিরির লুণ্ঠিত রৌপ্য দিল্লীবাসীর মধ্যে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ আলাউদ্দীনের বদান্যতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; পিতৃব্য হত্যার পাপের স্মৃতি মলিন হইয়া গেল। আহম্মদ চাপ ভিন্ন প্রায় সব আমীর আলাউদ্দীনের পক্ষে যোগ দিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার ভ্রাতা উলুঘ খানকে মূলতান অবরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং আরকলি খান, রুকনউদ্দীন ইব্রাহিম, আহম্মদ চাপ ও জালালউদ্দীনের মোঙ্গল জামাতা হলাগু খানের চক্ষু উৎপাটন করিলেন। জালালউদ্দীনের বিধবা পত্নী মালিকা জাহানকে কারারুদ্ধ করা হইল।

বুদ্ধিমান আলাউদ্দীন নিঃসন্দেহে জানিতেন—যে সমস্ত আমীর অর্থলোভে সুলতান রুকনউদ্দীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় অন্যের অর্থলোভে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন। সুতরাং তিনি বিশ্বাসঘাতক আমীরদিগকে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য পুরস্কার দিলেন ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দিলেন—কাহারও চক্ষু উৎপাটন করিলেন, কাহাকেও হস্তিপদতলে দলিত করিয়া হত্যা করিলেন, কাহাকেও চিরতরে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রকে ভিক্ষা-বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। ধূর্ত আলাউদ্দীনের নীতি ছিল—বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করিবেন এবং তারপর তিনি শাস্তিস্বরূপ বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন।

সিংহাসনাধিকার নিষ্কণ্টক করণ

সিংহাসনারোহণের এক বৎসরের মধ্যে আলাউদ্দীন গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বাঘেলা বংশীয় রাজা কর্ণদেব পরাজিত হইলেন, তাঁহার মহিষী কমলাদেবী বন্দিনী হইলেন। রাজা কর্ণদেব তাঁহার গৌরী কন্যা দেবলাদেবীকে সঙ্গে লইয়া দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের শরণার্থী হইলেন। আলাউদ্দীনের সেনাপতি নসরৎ খান গুজরাটের অদূরবর্তী কম্বো নগরে বহু হিন্দুকে বন্দী করিয়া দাসরূপে দিল্লী প্রেরণ করেন। ইহাদের সঙ্গে ছিলেন মালিক কাফুর নামক একজন ক্রীতদাস, কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবী এবং বহুলুণ্ঠিত মণিমুক্তা।

গুজরাট বিজয় (১২৯৭ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীন কমলাদেবীকে তাঁহার অঙ্কশায়িনী করিয়া মহা সমারোহে বিজয় উৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

জালালউদ্দীনের সময়ে ভারতে নব দীক্ষিত নও মুসলিমগণ দিল্লীর উপকণ্ঠে আফঘানপুরা নামক একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় অর্ধলক্ষ। জালালউদ্দীনের গুজরাট অভিযানের সময়ে প্রচুর অর্থ ও পদোন্নতির প্রলোভন প্রদর্শনের পর তাহারা এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। গুজরাট অভিযানের অন্তে আলাউদ্দীন নও মুসলিমদিগকে প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদান করেন নাই, কিংবা তাহাদের পদোন্নতি করেন নাই। ফলে নও মুসলিমগণ বিদ্রোহ করিল এবং আলাউদ্দীনেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিল। আলাউদ্দীন এক দিনে প্রায় বিশ সহস্র নও মুসলিমকে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা করিয়া তাহাদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিলেন। ইহার পর আর কখনও নও মুসলিমগণ বিদ্রোহ করে নাই।

নও মুসলিম নিধন

স্থলতানী জীবনের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে ক্রমাগত সাফল্যের গৌরবে আলাউদ্দীনের অশিক্ষিত মস্তিষ্কে নানা প্রকার উদ্ভট কল্পনা সঞ্চারিত হইল। তিনি প্রথমত গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অনুকরণে পৃথিবী বিজয়েব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি নিজেকে ধর্মপ্রবর্তকরূপে কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার মুদ্রাতে নিজেকে খলিফা বলিয়া প্রচার করিলেন। কিন্তু দিল্লীব কোতোয়াল আলা-উল-মূলক স্থলতানের পক্ষে ধর্মপ্রবর্তকের দাবির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন, অন্যদিকে বিধর্মীর উপর অত্যাচাব সমর্থন করিয়া তাঁহার ধর্ম উন্মাদনা চরিতার্থ করেন। বিশ্বজয়ের পূর্বাভাসরূপে তিনি তাঁহার মুদ্রাতে সেকেন্দাব-ই-সানি অর্থাৎ দ্বিতীয় সেকেন্দার বলিয়া নিজেকে প্রচার করিলেন। বিশ্বজয়ের পূর্ব মুহূর্তে আলা-উল-মূলক স্থলতানকে পরামর্শ দিলেন—'প্রথমে বিধর্মীব দেশ হিন্দুস্থান জয় করিবেন, পরে বিশ্বজয়ের অভিযান আরম্ভ কবিবেন। আল্লা আপনার সহায়।' তাঁহার পরামর্শে আলাউদ্দীন প্রথমে হিন্দুরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন।

আলাউদ্দীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

আলাউদ্দীনের হিন্দুরাজ্য বিজয় ভারতের মুসলিম ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। তাঁহার সময় হইতে ভারতে মুসলমানদের প্রকৃত সাম্রাজ্য-যুগ আরম্ভ হয়। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় তাঁহার দিগ্বিজয় সুদূর প্রসারী না হইলেও প্রায় সমগ্র ভারতে দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার রণনৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। হিন্দুরাজ্য আক্রমণের জন্য তিনি কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই; যুদ্ধ করিতে হইবে, সুতরাং কারণ প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না।

আলাউদ্দীনের সামরিক অভিযান

গুজরাট বিজয় আলাউদ্দীনের আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় করিয়াছিল। দুর্ধর্ষ রাজপুত শক্তি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন স্বয়ং সসৈন্যে রণথম্বর আক্রমণ করেন। মন্ত্রী রণমলের বিশ্বাসঘাতকতায় চৌহানবীর হাম্বির পরাজিত ও নিহত হইলেন। দুর্গটি আলাউদ্দীনের হস্তগত হইল। রণমল তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ বহু অর্থ লাভ করিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। একদিকে পক্ষ সমর্থনের পুরস্কার, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি—ইহাই ছিল আলাউদ্দীনের বাস্তব নীতি।

উত্তর ভারত বিজয়

চিতোর বিজয় আলাউদ্দীনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। চিতোর ছিল রাজপুতানার মধ্যমণি। আলাউদ্দীন স্বয়ং পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যসহ চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত কবি আমীর খসরু। হিন্দুর স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার্থে গোরা, বাদল এবং চিতোরের অন্যান্য রাজপুত বীরগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কয়েক মাস যুদ্ধের পর চিতোর অধিকৃত হইল। আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানের হস্তে চিতোরের শাসনভার ন্যস্ত হইল।

চিতোর বিজয়

আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। রাজপুতানার চারণ গীতি হইতে সংকলন করিয়া কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থান কাহিনী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাণা ভীমসিংহের অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পদ্মিনীকে লাভ করিতে পারেন নাই। চিতোর অধিকারের পূর্ব মুহূর্তে নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে পদ্মিনী আট শত রাজপুত রমণীসহ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা এই কাহিনী অবিশ্বাস করেন, কারণ চিতোর অভিযানে আলাউদ্দীনের পার্শ্বচর আমীর খসরু তাঁহার গ্রন্থে পদ্মিনীর কাহিনীর কোন উল্লেখ করেন নাই, দ্বিতীয়ত, পদ্মিনীর সমকালে চিতোরের রাণা ছিলেন রতন সিংহ, ভীম সিংহ নহে। তৃতীয়ত, ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক মহম্মদ জায়সী তাঁহার পদুমাবত কাব্যে একটি রূপকের মাধ্যমে আলাউদ্দীন-কাহিনী ও পদ্মিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী লেখক এবং চারণগণ পদুমাবত কাব্য অবলম্বন করিয়া পদ্মিনী কাহিনী রচনা করিয়াছেন। আমীর খসরু বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ত্রিশ সহস্র রাজপুত বীরের আত্মবিসর্জনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। অথচ পদ্মিনী সম্বন্ধে তিনি নীরব। আধুনিক ইতিহাসকারগণ পদ্মিনী-উপাখ্যানকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনী বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তবে ইহা সত্য যে, আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয়ের সময় বহু রাজপুত নারী জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়া নারীত্বের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

দুই বৎসরের মধ্যে আলাউদ্দীন মালব, ঝালোর, উজ্জয়িনী, মাণ্ডু, ধারা

এবং চন্দেরী অধিকার করিলেন এবং প্রত্যেক স্থানেই একজন মুসলমান শাসন-কর্তা বা জাবিতান নিযুক্ত করিলেন।

মাড়ওয়ারের রাজা শীতলদেব দীর্ঘকাল আলাউদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তারপর আলাউদ্দীন সসৈন্যে উপস্থিত হইলে শীতলদেব আলাউদ্দীনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। শিবান দুর্গ ব্যতীত বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড আলাউদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি শান্তি স্থাপন করিলেন। এইরূপে কাশ্মীর, নেপাল এবং আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গলা দেশ তখন বলবনী বংশের অধীনে প্রায় স্বাধীন রাজ্য ছিল, আলাউদ্দীন বাঙ্গলা দেশ জয়ের চেষ্টা করেন নাই।

মালব বিজয় (১৩০৫ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীনের সমকালে দাক্ষিণাত্যে চারিটি প্রধান রাজবংশ রাজত্ব করিত—(১) পশ্চিমে দেবগিরির যাদববংশ—রাজধানী দেবগিরি (বর্তমান দৌলতাবাদ), (২) পূর্বে তেলিঙ্গনার কাকতীয় বংশ - রাজধানী বরঙ্গল, (৩) কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে হোয়সল বংশ—রাজধানী দ্বারসমুদ্র (বর্তমান মহীশূর), (৪) সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য—রাজধানী মাদুরা। দাক্ষিণাত্য অভিযানের নায়ক ছিলেন তাঁহার রণকুশল প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর।

দক্ষিণ ভারত বিজয়

প্রাক্ সুলতানী জীবনে আলাউদ্দীন দেবগিরির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন এবং ইলিচপুর বা বেরার অধিকার করিয়াছিলেন। দেবগিরিরাজ রামচন্দ্র কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র এই পরাজয়ের পরেও পলাতক গুজরাটরাজ কর্ণদেব এবং তাঁহার কন্যা দেবলাদেবীকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন ; শেষ পর্যন্ত তিনি বার্ষিক কর প্রদানে অস্বীকার করেন। ক্রুদ্ধ আলাউদ্দীন ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী দেবগিরির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দেবগিরিরাজ রামচন্দ্র বিনা যুদ্ধেই করপ্রদানে স্বীকৃত হইলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব বিদ্রোহী হইলেন কিন্তু পরাজিত হইলেন। কর্ণদেবের কন্যা দেবলাদেবী বন্দিনী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন এবং দেবলাদেবীর সহিত আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খানের বিবাহ হইল। ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন দেবগিরি রাজ্য দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

দেবলাদেবীর সহিত খিজির খানের বিবাহ

১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে মালিক কাফুর অভিযান পরিচালনা করেন। কাকতীয়-রাজ প্রতাপচন্দ্র প্রচুর করদানে স্বীকৃত হইয়া কাফুরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্রের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালকে পরাজিত করিয়া রাজধানী দ্বারসমুদ্র লুণ্ঠন করেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া বীরবল্লাল স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন

১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্র হইতে সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তখন পাণ্ড্য রাজ্যে রাজভ্রাতা সুন্দরপাণ্ড্য এবং রাজা বীরপাণ্ড্যের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। পরাজিত সুন্দরপাণ্ড্য দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আলাউদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাফুরের অগ্রগতিতে ভীত হইয়া বীরপাণ্ড্য রাজধানী মাদুরা পরিত্যাগ করেন। কাফুর মাদুরার বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মালিক কাফুর সগর্বে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল তিনশত দ্বাদশটি হস্তী, বিশ সহস্র অশ্ব, ষোল মণ স্বর্ণ, দশ কোটি তঙ্কা এবং মণি মুক্তাপূর্ণ দশটি সিন্দুক। ইতোপূর্বে কখনও দিল্লীবাসী এক সঙ্গে এত বেশী পরিমাণে লুণ্ঠিতদ্রব্য দর্শন করে নাই। দিল্লীবাসী আলাউদ্দীনের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ

দাক্ষিণাত্য বিজয় আলাউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত মুসলিম অধিকার বিস্তার আলাউদ্দীনকে ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য সেই বিস্তার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, তথা আলাউদ্দীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি : খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতি উল্কার বেগে মধ্য এশিয়া হইতে সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তাহারা মানুষের জীবন লইয়া হোলির উৎসব করিত। মোঙ্গলগণ দীর্ঘকাল-সৃষ্ট মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল। ধ্বংসই ছিল তাহাদের জীবনের বিলাস। মোঙ্গলগণ মধ্য এশিয়ার সুবিশাল শস্য-শ্যামল প্রান্তর নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল। ধর্ম, সভ্যতা, প্রাসাদ, চৈত্য, বিহার—মোঙ্গলদের হস্ত হইতে কিছুই রক্ষা পায় নাই। ইলতুৎমিস রাজনীতি লঙ্ঘন করিয়া ভারতবর্ষকে মহাদুর্দৈবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বলবন ইলতুৎমিসের মোঙ্গল-প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের সময় ছয় বার মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই প্রথম অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জলন্ধরে আলাউদ্দীনের বন্ধু জাফর খান এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার মোঙ্গলগণ দিল্লীর অদূরে গিরি দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু জাফর খান মোঙ্গল নেতাকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং সতর শত মোঙ্গল বন্দী দিল্লীতে প্রেরণ করেন। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত মোঙ্গল সেনানায়ক কুতলুঘ খানের অধীনে দুই লক্ষ সৈন্য দিল্লীর অদূরে উপস্থিত হইল। আলাউদ্দীন স্বয়ং জাফর খানের সহিত মিলিত হইয়া মোঙ্গলদিগকে বিধ্বস্ত করিলেন, কিন্তু এই

মোঙ্গল আক্রমণ

প্রথম আক্রমণ (১২৯৬ খ্রীঃ)

দ্বিতীয় আক্রমণ (১২৯৭ খ্রীঃ)

যুদ্ধে জাফর খান নিহত হইলেন। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কালে মোঙ্গল নেতা তার্ঘী খানের অধীনে দ্বাদশ সহস্র মোঙ্গল দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিয়া নগর লুণ্ঠন করিল এবং লুণ্ঠনে তৃপ্ত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ স্বদেশে প্রস্থান করিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও নরহত্যা, দেশ বিজয় নহে।

তৃতীয় আক্রমণ
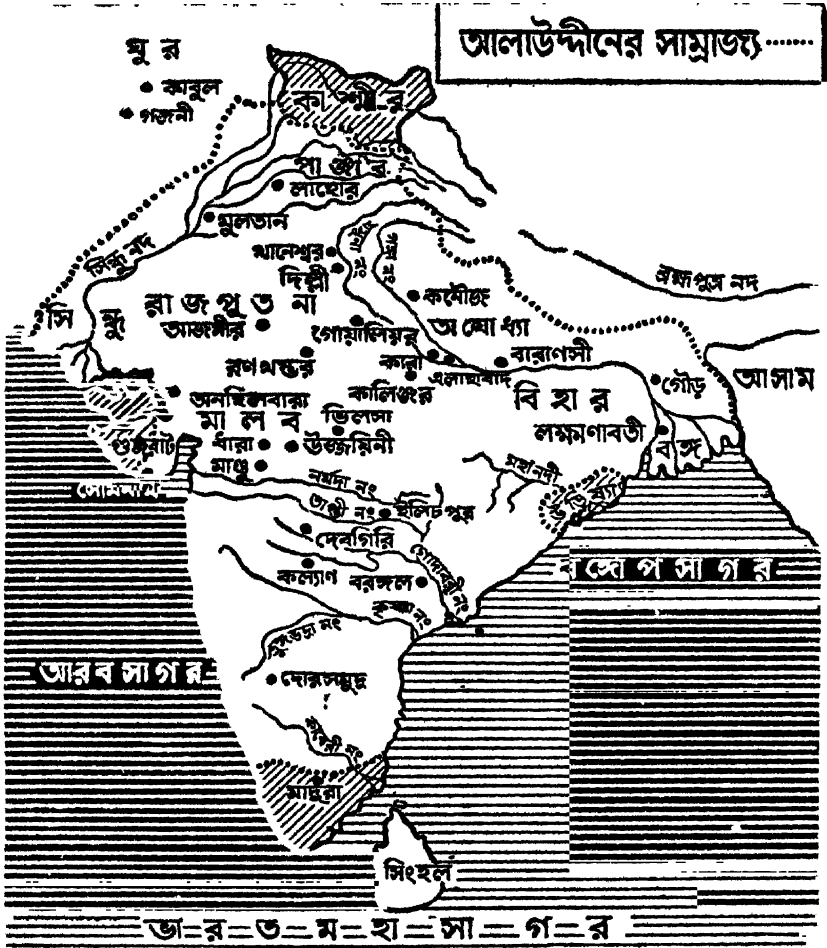
আলাউদ্দীন দেখিলেন যে, মোঙ্গলগণ প্রায় বিনা বাধায় দিল্লীর অদূরে উপস্থিত হইয়াছে—দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছে। তখন তিনি সীমান্ত রক্ষার জন্য পঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধুর পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার করিলেন এবং নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি একজন বিশেষ সীমান্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস

সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা

খানের জনৈক বংশধর আলীবেগ পঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমরোহাতে উপস্থিত হইলেন। পথে সমস্ত গ্রাম, নগর ও জনপদ লুণ্ঠন এবং অগ্নিসাৎ করিলেন। মালিক কাফুর এবং গাজী মালিক তুঘলক মোঙ্গলদের প্রত্যাবর্তনের পথ অবরোধ করিলেন।

চতুর্থ আক্রমণ (১৩০৪খ্রীঃ)

মোঙ্গলগণ পরাজিত হইল—তাহাদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে হস্তিপদতলে দলিত করিয়া নিহত করা হইল। অন্য সমস্ত মোঙ্গল বন্দীকে হত্যা করা হইল এবং তাহাদের ছিন্নমুণ্ড দ্বারা নূতন দুর্গ প্রাচীর নির্মিত হইল। গাজী মালিক তুঘলক পুরস্কারস্বরূপ সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন (১৩০৫ খ্রীঃ)। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া মূলতানে উপস্থিত হইল। গাজী মালিক তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। অর্ধলক্ষ মোঙ্গল দিল্লীর প্রান্তরে নিহত হইল। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র দিল্লীর বিপণিতে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশেষ বার মোঙ্গলগণ তাঁহাদের নেতা ইকবাল মদ্‌খানের অধীনে সিন্ধু অতিক্রম করিল। গাজী মালিক তাহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলেন, তাহার অনুচরবর্গ নির্মমভাবে নিহত হইল। বারংবার পরাজিত হইয়া ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে মোঙ্গলগণ দ্বাদশ বৎসর কাল ভারতের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আর সাহস করে নাই।

মোঙ্গল হত্যা

পঞ্চম আক্রমণ (১৩০৬ খ্রীঃ)

সর্বশেষ আক্রমণ (১৩০৭ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীনের রাষ্ট্রনীতিঃ শক্তি, সিদ্ধি ও সাম্রাজ্য—এই তিন বস্তু ছিল আলাউদ্দীনের জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী; এই তিন বস্তু লাভের জন্য যে-কোন উপায়কে তিনি গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আক্ষরিক জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ নিরোধের জন্য তিনি একমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মূল উৎপাটন করিবার প্রয়াস করিলেন। ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি চারিটি বিষবৃক্ষ-বীজের সন্ধান পাইলেন,—(১) শাসন ব্যাপারে সুলতানের অমনোযোগ, (২) আমীর-ওমরাহদের সামাজিক সম্মেলন ও আত্মীয়তার বন্ধন, (৩) আমীরদের সুরাসক্তি ও জুয়াখেলার নেশা এবং (৪) প্রজার হস্তে ধন-বাহুল্য। যখন বীজের সন্ধান পাইলেন, বীজ উৎপাটন করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। শাসন ব্যাপারে তিনি স্বয়ং মনঃসংযোগ করিলেন। রাজ্যের সূক্ষ্মতম সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যের প্রতিটি সংবাদ তাঁহার নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত। আমীর-ওমরাহদের আত্মীয়তার বন্ধন নষ্ট করিবার জন্য সুলতানের বিনা অনুমতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ করিলেন। সুরাপান নিষিদ্ধ হইল

ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান

গুপ্তচর নিযোগ

এবং সুলতান স্বয়ং মদ্যপান হইতে বিরত হইলেন। পাশাখেলা ও জুয়াখেলা তিনি নিষেধ করিলেন। প্রজাকে নির্ধন ও নিঃস্ব করিবার জন্য আলাউদ্দীন নিতান্ত প্রয়োজনের অধিক প্রজাবর্গের সমস্ত ধন নানা উপায়ে রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। হিন্দু-মুস্‌লিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাই আলাউদ্দীনকে "বিধাতার অভিসম্পাত" বলিয়া বিবেচনা করিত। আলাউদ্দীনের সময় হইতে ভারতবর্ষে নিরঙ্কুশ সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ আরম্ভ হয়।

প্রজার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

আলাউদ্দীনের অর্থনীতি ঃ আঁলাউদ্দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল সৈন্য ও অর্থ। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, পৃথিবী বিজয়, বিদ্রোহ দমন ও দেশরক্ষার জন্য সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। সৈন্যের খাদ্য, বেতন ও পোশাকের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং অর্থ সংগ্রহের জন্য আলাউদ্দীন নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, যথা—(১) পররাজ্য লুণ্ঠন, (২) ধনী প্রজার সম্পত্তি হরণ, (৩) আমীর-ওমরাহদের পুরাতন জায়গির, বৃত্তি ইত্যাদির পুনর্গ্রহণ, (৪) হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, (৫) শস্যাংশের অর্ধেক রাজস্ব রূপে গ্রহণ এবং (৬) গৃহপালিত জন্তুর উপর কর স্থাপন। রাজস্ব বিভাগের অত্যাচারে জনসাধারণের হস্তে উদ্বৃত্ত কোন অর্থ রহিল না, অন্য-দিকে অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রাচুর্য অথবা স্বল্পতা বিবেচনা না করিয়াই মূল্য-নির্ধারণ প্রথা অবলম্বন করিলেন। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য* স্থিরীকৃত হইল। প্রত্যেক বাজারে শাহান-ই-মণ্ডী (শাহান = তত্ত্বাবধায়ক, মণ্ডী = বাজার) নামক কর্মচারী উপস্থিত থাকিত এবং সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন বণিক কোন জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত না; পরিমাণে কম দিলে বিক্রেতার শরীর হইতে সমপরিমাণ মাংস ছেদন করা হইত। দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন হইত না। সুলতানের আদেশ ব্যতীত বিদেশে মাল রপ্তানি হইত না। বাজার বন্ধ থাকিলে সরকারী কর্মচারীর গৃহপ্রাচীর হরিতাল বর্ণাঙ্কিত করা হইত। উহাই ছিল বাজার বন্ধের বিজ্ঞপ্তি। পরবর্তী যুগে ইহাই "হরতাল" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অর্থ সংগ্রহ

খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দীনের অর্থনীতির ফলে রাজকোষ পূর্ণ হইলেও প্রজার অবস্থা অত্যন্ত দুঃস্থ হইয়া পড়িল। প্রজাবর্গের অশ্বারোহণ, অস্ত্রধারণ কিংবা শৌখীন বস্ত্র পরিধানের ক্ষমতা রহিল না। যতদিন তিনি সুস্থ শরীরে তরবারি সঞ্চালন

* আলাউদ্দীনের সমকালে নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য: গম প্রতি মণ সাড়ে সাত জীতল, (১ জীতল = ১ পয়সা); যব এক মণ = ৪ জীতল; ধান ১ মণ = ৫ জীতল; ডাইল এক মণ = ৫ জীতল; চিনি প্রতি সের = ১.১।৩ জীতল; ঘৃত প্রতি তিন সের = ১ জীতল; লবণ আড়াই মণ = ৫ জীতল; সরিষার তৈল আড়াই সের = ১ জীতল।

করিতে পারিতেন, ততদিন তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে আলাউদ্দীনের অর্থনীতি দ্বারা তাঁহার স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল; সৈন্য বিভাগের ব্যয় সংকোচ হইয়াছিল।

অর্থনীতির ফল

কিন্তু এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অর্থনীতির কোন রীতি তিনি অনুসরণ করেন নাই; অথবা কোন নীতির অপেক্ষা রাখেন নাই। শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা তিনি অভীষ্ট ফললাভ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে এই প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা আলাউদ্দীনের বাস্তববুদ্ধি ও উর্বর মস্তিষ্কের পরিচায়ক।

আলাউদ্দীনের ধর্মমত ও হিন্দুনীতি: আলাউদ্দীন ছিলেন জন্মে সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলগণ ইসলামের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করিয়াছিল এবং আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান করিয়াছিল। 'খলিফা মৃত, কিন্তু খিলাফত জীবিত'। খিলাফতের আদর্শ মুসলিম জগৎ হইতে তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইলতুৎমিস, বলবন প্রভৃতি মুসলিম রাজন্যবর্গ খলিফার নিকট হইতে উপাধি, পরিচ্ছদ এবং তরবারি গ্রহণ করিয়া ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। আলাউদ্দীন অবশ্য ইসলামের খলিফার নিকট হইতে কোন স্বীকৃতিপত্র বা ফরমান যাজ্ঞা করেন নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইয়ামিন্-উল-খিলাফত (খলিফার দক্ষিণ হস্ত) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে ইহলোকে আল্লার প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিতেন। তিনি নিজেকে ধর্ম প্রতিষ্ঠাতারূপেও কল্পনা করিয়াছেন। বলবনের মত তিনিও সুলতানকে 'আল্লার বিশেষ অনুগৃহীত মানব' বলিয়া প্রচার করিতেন। তিনি মুসলমান হইলেও উলামাদিগকে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। মোল্লাগণ তাঁহাকে রাজকার্যে উপদেশ দিতে চেষ্টা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ধর্ম বা অধর্ম জানি না, রাজ্যের কল্যাণে যাহা প্রয়োজন, তাহা আমি করিব।"

ধর্মমত

ধর্মানুবর্তিতার যুগে আলাউদ্দীনের ধর্মাতিরিক্ত রাজ্যশাসন আলাউদ্দীনের স্বাধীন চিন্তা প্রমাণ করে। তিনি মুসলিম ছিলেন এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী তিনি বিধর্মীর প্রতি আচরণ করিতেন। আগ্রার নিকটবর্তী বায়েনার কাজী মুঘীসউদ্দীন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হিন্দু প্রজাবর্গ হইবে করদাতা (খারাজ গুজার) মাত্র। তাহারা জিজিয়া কর প্রদান করিবে; মুসলিম রাজস্ব কর্মচারী রৌপ্যকর দাবী করিলে হিন্দু প্রজা স্বর্ণখণ্ড দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিবে। সুলতানের কর্মচারী বিধর্মীর মুখে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহারা মুখব্যাদান করিবে। এইরূপ বশংবদ ভাব ও কার্য দ্বারা বিধর্মী ইসলামের আনুগত্য প্রমাণ করিবে এবং ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে।" আলাউদ্দীন হিন্দুদের খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজনাতিরিক্ত সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। হিন্দুপ্রজা অশ্বারোহণ করিতে পারিত না, অস্ত্র ব্যবহার

করিতে পারিত না, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতে পারিত না। তাহারা শস্যের অর্ধাংশ কর প্রদান করিত। হিন্দুদিগকে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী পদ হইতে চ্যুত করা হইল। জিয়াউদ্দীন বারাণী বলেন, "সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের স্ত্রী-কন্যা মুসলমান প্রতিবেশীর গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইত। বিধর্মীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া আলাউদ্দীন ইসলামের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

হিন্দুনীতি

বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও আলাউদ্দীনের শেষ জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যধিক পরিশ্রম, অপরিমিত মদ্যপান এবং অপরিণামদর্শী অত্যাচারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। আলাউদ্দীনের মহিষী এবং পুত্র খিজির খান রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে বিলাসে নিমগ্ন হইলেন। পত্নী এবং পুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য হইতে কাফুরকে এবং গুজরাট হইতে আলপ খানকে পরামর্শের জন্য দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। কাফুরের পরামর্শে খিজির খানকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-বিচ্যুত করিয়া গোয়ালিয়রে বন্দী করা হইল; রাজমহিষী দিল্লীর দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলপ খান নিহত হইলেন। আলপ খানের হত্যার পর চিতোরের রাণা তাঁহার দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। দেবগিরির রাজা শঙ্কর দেবের পুত্র হরপালদেব স্বাধীনতা ঘোষণা কবিলেন। রোগশয্যায় পক্ষাঘাতপঙ্গু আলাউদ্দীন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, কাফুরই বিষ প্রয়োগে সুলতান আলাউদ্দীনের কর্মময় জীবনের অবসান করেন।

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন

আলাউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ আলাউদ্দীন ছিলেন জাতিতে তুর্ক, বসতিতে আফগান, শিক্ষায় নিরক্ষর, স্বভাবে কুটিল, কর্মে কুশল, অভিজ্ঞতায় বহুদর্শী, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, শৌর্যে অতুলনীয়, উপায় নির্বাচনে দ্বিধাহীন, রাজ্য-শাসনে স্বৈরাচারী। আলাউদ্দীনের চরিত্রে বিভিন্ন দোষ-গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি ছিলেন নির্মম, বিশ্বাসঘাতক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুরাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতা-দৃপ্ত অথচ প্রজার সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে সতত উন্মুখ। সিংহাসনের লোভে বৃদ্ধ স্নেহপরায়ণ পিতৃব্যকে তিনি নিঃসংকোচে হত্যা করিয়াছেন, সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক কবিবার জন্য আত্মীয়-বান্ধবের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছেন, শত্রুকে হস্তিপদতলে পিষ্ট করিয়াছেন। যদিও তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না, তবুও সহজ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি সেই জ্ঞানের অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বৈরাচারী হইলেও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন স্বয়ং। যাহা রাজ্যের প্রয়োজনে কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা দ্বিধাহীন ভাবে তিনি অনুসরণ করিতেন। ষড়যন্ত্র নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাদের নিঃস্ব করিয়াছেন, মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং পরবর্তী জীবনে স্বয়ং মদ্যপান হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তিনি

[illegible] বিবাহ-সম্বন্ধ রাজানুমতি সাপেক্ষ করিয়াছেন এবং সৈন্তদিগের প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে চিন্তা না করিয়া তিনি অর্থ-সমস্তার সমাধান করিয়াছিলেন; সিদ্ধিই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্ত, উপায় ছিল গৌণ—সুতরাং সংগঠনমূলক কোন শাসনপদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। তিনি ছয়বার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ভারতবর্ষকে মহা দুর্বিপাক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা আলাউদ্দীনের অপূর্ব বীরত্ব ও সামরিক শক্তির পরিচায়ক। রাজ্যজয় ও সামরিক প্রতিভায় তিনি প্রথম যুগের ভারতীয় মুসলিম সুলতানদের মধ্যে অদ্বিতীয়। মুসলমানদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত হিন্দুস্তানে মুসলিম অধি-কার স্থাপন করিয়াছিলেন।

ধর্মের ব্যাপারে আলাউদ্দীন সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার করেন নাই। তিনি এক সময় নিজেকে নূতন ধর্মপ্রচারক রূপে কল্পনাও করিয়াছিলেন, রাজ্যের প্রয়োজনে নিঃসংকোচে ও নির্মমভাবে মুসলমান, হিন্দু এবং নও-মুসলিমদের হত্যা করিয়াছেন।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মগুপায়ী, উচ্ছৃঙ্খল ও ধর্মে অনাসক্ত ছিলেন। বহু অত্যাচারের ফলে শেষ বয়সে তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইতে হয় এবং সেই সুযোগে তাঁহার প্রিয়পাত্র মালিক কাফুর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

অন্যান্য সুলতানদিগেব মত আলাউদ্দীন সংগীতপ্রিয়, শিল্পে উৎসাহী, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে শিরী নামক নগর স্থাপন করিয়া মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাই নির্মাণ কবেন। কুতুবমিনারের "আলাই দরওয়াজা" তাঁহারই কীর্তি। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু তাঁহারই সভাকবি ছিলেন।

খলজী সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ: আলাউদ্দীন খলজী সর্বভারতব্যাপী একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা সত্য। আলাউদ্দীন ধর্মে মুসলিম ছিলেন ইহাও সত্য। তিনি মুসলিম বলিয়া গর্ব করিতেন, সুতরাং আশা করা যায় যে, আলাউদ্দীন খলজী ইসলামের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। প্রতি রাজ দরবারে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ ব্যাখ্যার জন্য একটি উলামা গোষ্ঠী নিযুক্ত থাকিত। আলাউদ্দীনের রাজ্যে দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট কাজী ছিল, ধর্মোপদেষ্টা ছিল।

কাজী ইউসুফ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাব-উল-খারাজে মুসলিম শাসকের আটটি অবশ্তকর্তব্য কর্মের নির্দেশ দান করিয়াছেন। ইসলামের কর্ণধার রূপে মুসলিম শাসক—(১) রাজ্য জয় করিবেন, (২) রাজ্য রক্ষা করিবেন, (৩) ইসলাম ধর্ম প্রচার করিবেন, (৪) ইসলাম নীতি অনুসারে প্রজাবর্গের কলহ-বিবাদ

মীমাংসা করিবেন, (৫) মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ এবং সংরক্ষণ করিবেন, উলামার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন, (৬) মুসলিম প্রজার কল্যাণ বিধান করিবেন, (৭) বিধর্মী প্রজার উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিবেন এবং (৮) আশ্রিত বিধর্মী প্রজা বা জিম্মিদিগকে রক্ষা করিবেন।

আলাউদ্দীন খলজী যদিও বাগদাদের অথবা মিশরের খলিফার নিকট হইতে ইলতুৎমিসের মত স্বীকৃতিপত্র লাভ করেন নাই, তথাপি সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খলজী সাম্রাজ্যকে মুসলিম সাম্রাজ্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন। আলাউদ্দীন ইসলামের আটটি নির্দেশ যথাসম্ভব পালন করিয়াছেন। মুসলিম শাসকরূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন; রাজ্য-রক্ষার জন্য বিপুল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিধর্মী হিন্দুর কোন স্থান ছিল না তিনি বিদ্রোহ দমন করেন এবং বহির্ভারতীয় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, আভ্যন্তরীণ মুসলিম ষড়যন্ত্র বিনাশ করেন, প্রজাদিগের কলহ-বিবাদ মীমাংসার জন্য কোরাণ-হাদিসে বুৎপন্ন কাজী নিযুক্ত করেন। কাজী আলাউল মূলক তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন। আমীর খসরু, হাসান অল দেহ্‌লবী প্রভৃতি গুণী-জ্ঞানী আলাউদ্দীনের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। মুসলিম ধর্মের নির্দেশ অনুসারে তিনি বিধর্মী হিন্দুর উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন এবং নির্মমভাবে জিজিয়া কর সংগ্রহ করেন। অবশ্য তিনি বিধর্মী হিন্দু প্রজা বা জিম্মি রক্ষার ব্যাপারে কোন তারতম্য করেন নাই।

এই সমস্ত নীতি অনুসরণ করিয়া আলাউদ্দীন স্বীয় ইসলাম প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত পরিপন্থী হইলে তিনি নিঃসংকোচে ইসলাম ধর্মের নির্দেশগুলি লঙ্ঘন করিতেন। একদা তিনি আলাউল মূলককে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "ধর্ম-অধর্ম বুঝি না, রাজ্যের প্রয়োজনে যাহা কর্তব্য তাহা করিব।" রাজ্যের প্রয়োজনে তিনি একদিনে বিশ সহস্র নও মুসলিম হত্যা করেন, মুসলিম বিদ্রোহী এবং হিন্দু বিদ্রোহীর মধ্যে শাস্তি বিধানে তিনি কোন তারতম্য করেন নাই। প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি, প্রজার সম্পত্তি এবং অর্থ অপহরণ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে খলজী রাজশক্তির কোন পক্ষপাত ছিল না। তিনি রাজ্য রক্ষা ও রাজ্যের কল্যাণের জন্য সীমান্তে মোঙ্গল ভীতি দূর করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত খলজী সাম্রাজ্য মুসলিম আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল; কিন্তু সেই ধর্মান্ধতার যুগেও আলাউদ্দীন বহু দিক দিয়া সংস্কারমুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে মদ্যপান, সংগীত উপভোগ, মুসলিম রক্তপাত এবং শত শত বিবাহ করিয়া তিনি ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন। তথাপি আলাউদ্দীন মুসলিম ছিলেন এবং খলজী সাম্রাজ্যের রূপ ও রেখা ইসলামের বহির্ভূত ছিল না। আলাউদ্দীনের মূলমন্ত্র ছিল—ধর্ম আমার প্রিয়, সাম্রাজ্য আমার প্রিয়তর অর্থাৎ খলজী সাম্রাজ্যের কল্যাণে আলাউদ্দীন বিনা দ্বিধায় ইসলামের নির্দেশ

লঙ্ঘন করিতে পারিতেন এবং করিতেন। ইহাই খলজী সাম্রাজ্যের স্বরূপ।

খলজী বংশের অবসান ঃ আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর শিশু সুলতান ওমরের প্রতিনিধিরূপে মালিক কাফুর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সিংহাসনের লোভে মালিক কাফুর আলাউদ্দীনের অন্য দুই পুত্র খিজির খান এবং শাদী খানকে অন্ধ করিয়া দিলেন এবং আলাউদ্দীনের পত্নীকে বিবাহ করিলেন। অত্যল্পকাল পরেই পত্নীর অর্থ এবং অলংকার আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক খানকে সহস্র স্তম্ভ (হাজার ছুতুন) দুর্গে কারারুদ্ধ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁহারও চক্ষু উৎপাটন করিবেন। কিন্তু আমীর এবং দাসগণের সাহায্যে মুবারক পলায়ন করেন। কাফুর ক্রুদ্ধ হইয়া খলজী আমীর ও দাসদিগকে নির্মূল করিবার সংকল্প করেন। ফলে খলজী আমীর ও দাসগণ কাফুরকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাঁহারা মুবারককে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমরের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মুবারক দুই মাস চার দিন পরে ওমরের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩১৩ খ্রীঃ, এপ্রিল)।

কাফুরের কর্তৃত্ব গ্রহণ

খলজী আমীর ও দাসগণ কর্তৃক কাফুরকে হত্যা

মুবারকের সিংহাসনে আরোহণ

মুবারকের শাসন ঃ মুবারক খলজী হিন্দুস্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শুভেচ্ছার ভিত্তিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ কাফুর ছিলেন সকলের ঘৃণার পাত্র। মুবারক আলাউদ্দীন ও মালিক কাফুর কর্তৃক কারারুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং নির্বাসিত আমীরদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতীতের বিস্মৃতি এবং ভবিষ্যতের ক্ষমা লইয়াই তিনি রাজত্ব আরম্ভ করেন। তিনি আলাউদ্দীন প্রবর্তিত দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ-নীতি রহিত করিলেন এবং প্রজাবর্গের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন। প্রজার করভার লঘু করা হইল। জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

আলাউদ্দীন প্রবর্তিত দ্রব্যমূল্য রহিত

অকস্মাৎ আলাউদ্দীনের কঠোর শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমীর ও রাজকর্মচারিগণ পুনরায় বিলাস, আয়াস এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যায় ভাসিয়া গেল। তরুণ সুলতান মুবারক খলজী একজন নীচ জাতীয় ধর্মান্তরিত অপূর্ব মুখশ্রীসম্পন্ন হিন্দু কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। অচিরকাল মধ্যে সুলতান মুবারক এই ধর্মান্তরিত হিন্দু যুবককে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং খসরু খান উপাধি প্রদান করিলেন। বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ সুলতান এবং অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় এবং তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় রাজ্য মধ্যে শিথিলতা দেখা দিল।

হিন্দু যুবকের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ

ফলে গুজরাট বিদ্রোহ করিল। দেবগিরির যাদবরাজ হরপালদেব তুর্কী-

সৈন্যকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। মাড়ওয়াড় স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। অকস্মাৎ মুবারক খলজী পিতার দৃপ্ত তেজের উন্মাদনায় স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিলেন ; হরপালদেবকে পরাজিত করিয়া জীবন্ত চর্ম উৎপাটন করিলেন। হিন্দু রাজার ছিন্নমুণ্ড দ্বারা দেবগিরির দুর্গতোরণ সুশোভিত করা হইল। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিয়া মন্দিরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হইল। দেবগিরি হইতে খসরুকে মাহরা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিয়া মুবারক দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মুবারক খলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান

পথে মুবারক সংবাদ শুনিলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া খিজির খানের দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া মুবারক খলজী বংশের সমস্ত পুরুষ সন্তানকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। মুবারক খলজী খিজির খানের বিধবা পত্নী দেবলাদেবীকে বিবাহ করিলেন।

খলজী বংশের পরিণতি : দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উল্লসিত হইয়া মুবারক খলজী দিল্লীর রাজদরবারে তরল আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। সুরা, সংগীত, নৃত্য ও নর্তকী দিল্লীর রাজদরবারে অপরিহার্য অংশ হইয়া উঠিল। মুবারক সমস্ত রাজকার্য তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী খসরুর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং খলিফা উপাধি গ্রহণ করিলেন। একদা নিশার অন্ধকারে খসরু রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সুলতানের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। বিহ্বল সুরামত্ত মুবারক স্বীয় অসহায় অবস্থা অনুধাবন করিবার পূর্বেই খসরু খানের অনুচর জাহিরিয়া মুবারকের শির স্কন্ধচ্যুত করিল। মুবারকের ছিন্নমুণ্ড জনতার দর্শনের নিমিত্ত রাজপ্রাসাদের উদ্যানে নিক্ষিপ্ত হইল।

মন্ত্রী খসরুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ

মন্ত্রী খসরু কর্তৃক মুবারককে হত্যা

খসরু খানের শাসন (১৫ই এপ্রিল—৫ই সেপ্টেম্বর, ১২২০ খ্রীঃ) **:** খসরু খান নাসীরউদ্দীন খসরু শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তুর্কী ও খলজী আমীরগণ ভারতীয় মুসলমান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবে ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাসনকর্তা গাজী মালিক তুঘলক ও তাঁহার পুত্র মুহম্মদ জুনা খান গর্বিত তুর্ক-আফঘান আমীরদের সহযোগে একটি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে খসরু সমসাময়িক তুর্ক-আফঘান সুলতান অপেক্ষা অযোগ্য ছিলেন না। তিনি ভারতীয় মুসলমান ছিলেন বলিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে সমগ্র বিদেশী মুসলিম গোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল। অবশ্য সুলতান নাসীরউদ্দীনের রাজত্বকালে ইমদাদউদ্দীন

খসরু খানের সিংহাসনারোহণ

খসরু খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

রায় রাইয়ানের বিরুদ্ধেও হিন্দু রক্তের অভিযোগে তুর্কী আমীরগণ একটি ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। খসরু খান সিংহাসনারোহণের একশত পঁচিশ দিন পরে গাজী মালিক কর্তৃক পদচ্যুত ও নিহত হইলেন। গাজী মালিক ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হিন্দু হত্যার পুরস্কারস্বরূপ ঘিয়াসউদ্দীন গাজী অর্থাৎ বিধর্মিহন্তা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে তিনিই প্রথম গাজী উপাধিধারী সুলতান।

ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সিংহাসনারোহণ

অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষে খলজী শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(Describe briefly the story of the foundation of the Khalji rule in India and sketch in brief its chief features.)

২। আলাউদ্দীন খলজীর উত্তর ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Narrate the story of conquest of Alauddin Khalji in north and south India.)

৩। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

(Give an estimate of the reign of Alauddin Khalji with special reference to his administrative and economic measures.)

৪। আলাউদ্দীন খলজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Give an estimate of Alauddin's character and achievements.)

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) মুবারক খলজী, (খ) মালিক কাফুর, (গ) নও মুসলিম, (ঘ) আলাউদ্দীনের হিন্দু নীতি।

Write short notes :—

(a) Mubarak Khalji, (b) Malik Kafur, (c) Nao-Muslim, (d) Hindu policy of Alauddin Khalji.)

তৃতীয় অধ্যায়

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৪ খ্রীঃ)

অধ্যায় পরিচয়ঃ তুঘলক বংশ* ভারতের সর্ব প্রথম মিশ্র তুর্ক-ভারতীয় বংশ। এই বংশের নয় জন সুলতান চুরানব্বই বৎসর রাজত্ব করেন। তুর্ক-আফঘান যুগের দুই জন প্রধান সুলতান—মুহম্মদ তুঘলক এবং ফিরুজ তুঘলক এই বংশের সন্তান। মুহম্মদ তুঘলক মুসলিম ভারতের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও গুণী সুলতান ছিলেন। হিন্দু মাতার সন্তান ফিরুজ ছিলেন সর্বাপেক্ষা হিন্দু বিদ্বেষী মুসলিম সুলতান। তুঘলক যুগে তৈমুরলঙ দিল্লী অধিকার ও লুণ্ঠন করেন। তুঘলক বংশের সময় ভারতীয় মুসলিম রাজ্য মিশর, পারস্য ও চীনের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। দাসপ্রথা তুঘলক যুগেই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। নূতন নগর পত্তন তুঘলক যুগের বৈশিষ্ট্য। এই যুগে দক্ষিণে বিজয়নগর ও বাহ্-মনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রীঃ) ঃ ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পিতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার কারুণা তুর্ক-গোষ্ঠীর সন্তান। তিনি বলবনের ক্রীতদাসরূপে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন নীচবংশীয়া এক জাঠ রমণী। তিনি সাধারণ সৈনিক রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া শক্তিবলে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের বংশ পরিচয়

***তুঘলক বংশ**

তুঘলক শাহ = জাঠ রাজপুত রমণী
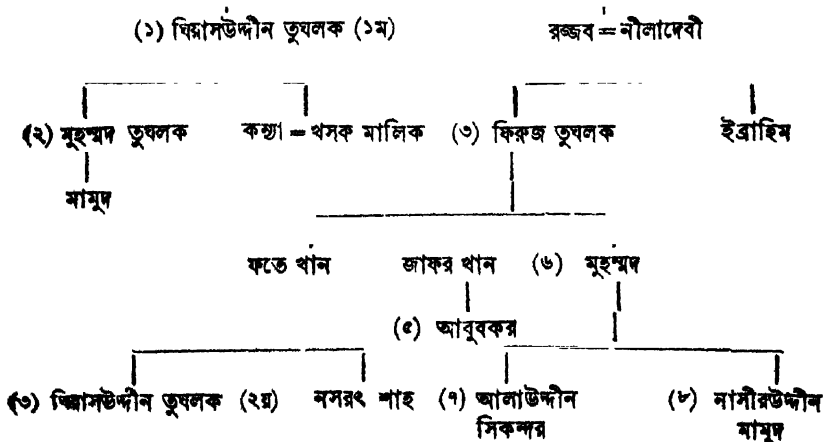
পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি উনত্রিশ বার মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং আলাউদ্দীন কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত হন।

দীপালপুরের শাসনকর্তা (১৩০৫ খ্রীঃ)

এই সময়ে দীপালপুরের রাজা রণমলের কন্যা নীলাদেবীর সহিত তাঁহার ভ্রাতা রজ্জবের বিবাহ হয়। এই নীলাদেবীর পুত্রই ছিলেন বিখ্যাত ফিরুজ। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর রজ্জবের বিবাহ হয়। মুবারক খলজী গাজী মালিক তুঘলককে পদচ্যুত করেন নাই। খসরু শাহ গাজী মালিককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাজী মালিক তুঘলক খসরু শাহকে হত্যা করা মাত্রই সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। কথিত আছে, তিনি তিন দিন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার জন্য খলজীবংশীয় সন্তানের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই মুবারক খলজী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। খলজী বংশধরের অভাবে তুঘলক শাহ স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আমীরদিগের সমর্থন লাভ করিয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ধর্মান্তরিত হিন্দুস্থানী মুসলমানের বিরুদ্ধে অভারতীয় মুসলিম আমীরদের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্যই খলজী আমীরগণ ভিন্ন বংশীয় তুঘলক শাহকে সিংহাসনারোহণে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিল।

রাজ্যলাভ করিয়াই ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক তুর্কবংশীয় আমীরদিগকে শাসন-কার্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এমন কি খসরু খানের পক্ষাবলম্বী আমীর-দিগকেও তিনি পদচ্যুত করেন নাই। খলজী রাজকুমারীদিগের তিনি সসম্মানে এবং সাড়ম্বরে বিবাহ-ব্যবস্থা করিয়া সামাজিক সুযশ লাভ করিলেন।

কৃষির উন্নতি এবং কৃষকের নিরপত্তা ছিল তাঁহার রাজ-ব্যবস্থার মূলনীতি। বৎসরে দশভাগের বেশী কোন প্রকার করই তিনি বর্ধিত করিতেন না। আলাউদ্দীন প্রবর্তিত ভূমির পরিমাপ ব্যবস্থা তিনি অবাস্তর বিবেচনা করিয়া প্রাচীন গল্লাবক্সী (গল্ল=উৎপন্ন শস্য ; বক্সী=দান) অথবা "বাটাই" (শস্য বিভাগ) নীতি প্রবর্তন করেন। রাজস্ব সংগ্রহ-কারিদিগকে তিনি শস্যাংশ বেতনস্বরূপ প্রদানের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিলেন। পরিবর্তে তাহাদিগকে নিষ্কর ভূমি বেতনস্বরূপ প্রদান করেন। পতিত ভূমিতে শস্য উৎপাদনে তিনি প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। কৃষির সুব্যবস্থার জন্য তিনি সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা

তাঁহার সময়ে বহু উদ্যান রচিত হয়। তিনি বাণিজ্যের জন্য কয়েকটি পথ ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে পথনির্দেশক স্মারকচিহ্ন স্থাপন করেন। তাঁহার সংবাদ-বাহক প্রতিদিন পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিত।

সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা

আলাউদ্দীনের অনুরূপ হিন্দু বিদ্বেষী না হইলেও তিনি হিন্দুদের উপর হইতে নিষেধমূলক নীতি অপসারণ করেন নাই, হিন্দুদিগকে অর্থসঞ্চয় করিতে অনুমতি দেন নাই। খাদ্য ও বস্ত্রের অতিরিক্ত কোন অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় নিষিদ্ধ করিয়া তিনি হিন্দুদিগকে ভূমি হইতে বঞ্চিত করেন নাই। কারণ হিন্দুরাই ছিল পরিশ্রমী কৃষক। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন নীতিগত ভাবেই তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ঘিয়াসউদ্দীনের হিন্দুনীতি

খসরু খানের সময়ে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে ঘিয়াসউদ্দীন পুত্র মুহম্মদ জুনা খানকে বরঙ্গলের অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ কবেন। তাঁহার প্রথম অভিযান ব্যর্থ হইল। দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় বার অভিযান কবিয়া জুনা খান প্রতাপরুদ্রদেবকে বন্দী করেন এবং দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কাকতীয় বাজ্য বরঙ্গল দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল। প্রত্যাবর্তনের পথে মুহম্মদ জুনা খান উৎকল বা উড়িষ্যার প্রধান নগর (জাজনগর) লুণ্ঠন করেন এবং পঞ্চাশটি হস্তী, বহু মণিমুক্তা ও লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পররাষ্ট্রনীতি

ঘিয়াসউদ্দীনের সময়ে বাঙ্গলা দেশে অন্তর্বিদ্রোহ চলিতেছিল। শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহের তিন পুত্র ঘিয়াসউদ্দীন, শিহাবউদ্দীন ও নাসীরউদ্দীনের মধ্যে সিংহাসনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ঘিয়াসউদ্দীন ছিলেন পূর্ববঙ্গেব শাসন-কর্তা, নাসীরউদ্দীন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তা, শিহাবউদ্দীন ছিলেন লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা। ঘিয়াসউদ্দীন শিহাবউদ্দীনকে পদচ্যুত করিয়া লখ্‌নৌতির সিংহাসন অধিকাব করেন। তৃতীয় ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবিলেন। ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক স্বয়ং বঙ্গদেশে অভিযান করিয়া বাঙ্গলার মালিক ঘিয়াসউদ্দীন ফিরুজ শাহকে বন্দী কবিলেন। নাসীরউদ্দীন দিল্লীর বশংবদরূপে লখ্‌নৌতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (১৩২৫ খ্রীঃ)।

ঘিয়াসউদ্দীন ও বঙ্গদেশ

বাঙ্গলা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক ত্রিহুত জয় করেন। ইহার কিছু পূর্বেই মোঙ্গলগণ উত্তর ভারত আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলায় অবস্থান কালে ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক সংবাদ শুনিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সুলতানজাদা মুহম্মদ জুনা খান দিল্লীতে তাঁহার অনুচরবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন এবং ফকীর নিজামউদ্দীন আউলিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন যে, অচিরকাল মধ্যে মুহম্মদ জুনা খান দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে চঞ্চল

হইয়া উঠিলেন এবং দ্রুতগতিতে দিল্লীর পথে অগ্রসর হইলেন। নিজামউদ্দীন আউলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হনুজ দেহেলী দূর আস্ত্" (এখান হইতে দিল্লী বহু দূরে)। মুহম্মদ জুনা খান অত্যন্ত শান্তচিত্তে দিল্লীর তিন ক্রোশ দূরে আফঘানপুরা নামক গ্রামে পিতার অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। বিরাট তোরণ ও মণ্ডপ নির্মিত হইল; চন্দ্রাতপ তলে পানভোজন দ্বারা আমীরগণ তৃপ্ত হইলেন। উৎসব শেষে হস্তীর শোভাযাত্রায় তোরণ অতিক্রমণের সময় বিরাট মঞ্চ ও চন্দ্রাতপ হস্তীর শরীর দোলনে ভূমিসাৎ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক ও তাঁহার পুত্র মামুদ খান নিহত হইলেন। মঞ্চ পতনের সঙ্গে মুহম্মদ জুনা খানের সম্বন্ধ ব্যাপারে ইতিহাসকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। জিয়াউদ্দীন বারাণী বলেন, মঞ্চটি বজ্রাঘাতে অগ্নিদগ্ধ হয়। ইবন বাতুতা, আবুল ফজল এবং বদাউনী বলেন—এই মঞ্চ পতন মুহম্মদ জুনা খান কর্তৃক পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু

মুহম্মদ তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ)ঃ ঘিয়াসউদ্দীনের অপঘাত মৃত্যুর পর জুনা খান 'মুহম্মদ শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মুহম্মদ তুঘলক রাজস্ব সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি আলাউদ্দীন কর্তৃক নির্দিষ্ট করের উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং কয়েকটি নূতন কর স্থাপন করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর দেশে বিশৃঙ্খলার ফলে পঞ্জাবে ভূমি-রাজস্ব বহুদিন সংগৃহীত হয় নাই। মুহম্মদ তুঘলকের কর্মচারিগণ ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হইলে রাজস্ব প্রদানে অনভ্যস্ত অনেক কৃষক ভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ফলে দোআব অঞ্চল শস্যহীন হইয়া পড়িল।

মুহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনারোহণ

রাজস্ব সংস্কার

মুহম্মদ তুঘলক (প্রাচীন চিত্র)

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় সাত বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয় (১৩২৬-১৩৩৩ খ্রীঃ)। মুহম্মদ তুঘলক দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যকল্পে খাদ্যদান, কূপ খনন এবং চাষের বীজ, পশু ও ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে তিনি রাজস্ব হ্রাস না করায় রাজকর্মচারিগণ কঠোর হস্তে রাজকর সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। রাজকর্মচারীদের

দুর্ভিক্ষ ও কৃষক বিদ্রোহ

অত্যাচারে কৃষকদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা বিদ্রোহ করিল। মুহম্মদ তুঘলক সৈন্যের সাহায্যে কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন (১৩৩৩ খ্রীঃ)। এই অত্যাচারে বহু কৃষক নিহত হইল। এই ঘটনাই জিয়াউদ্দীন বারাণী কর্তৃক 'মনুষ্য শিকার' নামে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই জন্যই মুহম্মদ তুঘলককে 'নররাক্ষস' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে (পুরাতন দেবগিরি) রাজধানী পরিবর্তন মুহম্মদ তুঘলককে বাতুল নামে কলঙ্কিত করিয়াছে। মোঙ্গল আক্রমণকারিগণের ভারত আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল রাজধানী দিল্লী। সুতরাং তিনি দিল্লী অপেক্ষা প্রায় ৩৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন নিরাপদ মনে করেন (১৩২৭ খ্রীঃ)। অন্য দিকে নব বিজিত দাক্ষিণাত্য শাসনের জন্যও এই পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল. প্রধানত এই দুই কারণে মুহম্মদ তুঘলক দিল্লীর অধিবাসীদের অসন্তোষ সত্ত্বেও দৌলতাবাদে গমনের আদেশ দেন।

দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তন

এই পরিবর্তনের জন্য যথোপযুক্ত পথ-ঘাট এবং সরাই-খানার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। দৌলতাবাদের জলবায়ু দিল্লীবাসীদের সহ্য না হওয়ায় তিনি প্রজাবর্গকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন এবং তাহাদের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু এই দুইবার যাতায়াতে লোকের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। রাজধানী পরিবর্তন যুক্তিবহ হইলেও কার্যক্ষেত্রে উহা বিফল হয়।

পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্তন

রাজধানী পরিবর্তনের ব্যয়, বিদ্রোহ দমন, দুর্ভিক্ষ, প্রজার করদানে অস্বীকৃতি, রাজ্যে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতি কারণে রাজকোষ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই অর্থসমস্যা সমাধানের জন্য মুহম্মদ তুঘলক চীন সম্রাট কুবলাই খান এবং পারস্য সম্রাট গাই খাটুর অনুকরণে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ন্যায় সুলতানের নামাঙ্কিত তাম্র মুদ্রা প্রচলন করেন (১৩২৯-১৩৩০ খ্রীঃ)।

মুহম্মদ তুঘলকের মুদ্রা

কিন্তু সুলতান জাল মুদ্রা বন্ধ কবার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় দেশ জাল মুদ্রায় ভরিয়া গেল। বিদেশী বণিকগণ এই মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল; মোল্লাগণ তাম্র মুদ্রা ইসলাম বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তর ক্ষতি হইল। পর বৎসরই মুহম্মদ তুঘলক তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদানের আদেশ দিলেন। এই নূতন মুদ্রা প্রচলনের অন্তরালে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি জাল মুদ্রা প্রচলন বন্ধ

তাম্র মুদ্রা প্রচলন

করার ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে তাঁহার বাস্তবজ্ঞানের অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

রাজা রাজ্য জয় করিবেন—ইহাই ছিল মধ্যযুগের রাজনীতি। মুহম্মদ
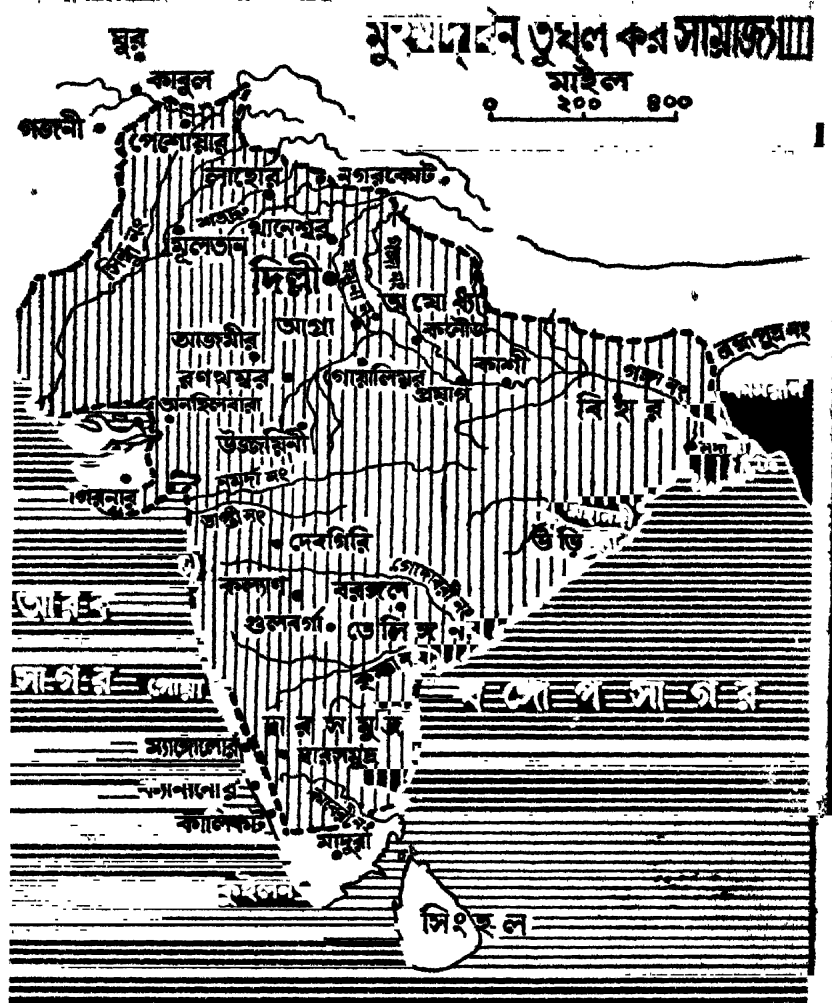
তুঘলক এই নীতি অনুসরণ করিয়া খোরাসান জয়ের উদ্দেশ্যে তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে মুহম্মদ তুঘলক তাঁহার পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, ফলে বহু অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়। মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক চীন অভিযানের কাহিনী সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ তিনি চীনে অভিযান

দিগ্বিজয়

প্রেরণ করেন নাই। চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী কারাচল বা কুর্মাচল প্রদেশে কুমায়ুন গাড়োয়ালের পার্বত্য জাতি দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে নাই। সুতরাং মুহম্মদ তুঘলক তাঁহার ভাগিনেয়কে কারাচলের বিরুদ্ধে লক্ষ সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর একাংশ তুষার-পাতে ও খাদ্যাভাবে হিমালয়ের গিরিবর্ত্মে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু কারাচলের রাজা ভয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানের প্রতিশ্রুতি দেন। বহু সৈন্য বিনষ্ট হইলেও তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

খোরাসানের ব্যাপারে মুহম্মদ তুঘলকের পারস্যের সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছিল। কিন্তু মিশরের খলিফা ছিলেন মুহম্মদ তুঘলকের মিত্র। ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশরের আব্বাসীয় খলিফাকে ইসলামের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করেন এই প্রতিদানে খলিফার নিকট হইতে উপাধি 'খিলাত (রাজভূষণ) এবং তরবারি' লাভ করেন। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের রাজা কুর্মাচল অঞ্চলে বৌদ্ধমঠ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দিল্লীতে একজন দূত প্রেরণ করেন। বিনিময়ে মুহম্মদ তুঘলক মরক্কোর পর্যটক ইবন বাত্-তুতাকে দূতরূপে চীন দেশে প্রেরণ করেন।

সদিচ্ছা এবং কর্মকুশলতা সত্ত্বেও মুহম্মদ তুঘলক জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিফল হন। ১৩২৬ হইতে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন

রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ

অংশে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য, মাদুরা, বঙ্গদেশ, কারা, অযোধ্যা, লাহোর, মুলতান, সামানা, গুজরাট, দৌলতাবাদ ও সিন্ধু অঞ্চল ইত্যাদিতে বিদ্রোহ চলিয়াছিল। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হক্কা (হরিহর) ও তাঁহার ভ্রাতা বক্কা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর, এবং

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হাসান গঙ্গু বাহমন কৃষ্ণা নদীর উত্তরে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুহম্মদ তুঘলক পঁচিশ বৎসরকাল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উল্কার বেগে বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান করিয়াছিলেন। পরিশেষে বিদ্রোহ

মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যু

দমন করিতে গিয়া সিন্ধুদেশের থাট্টা নামক স্থানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মুহম্মদ তুঘলকের চরিত্র : মুহম্মদ তুঘলক নির্বিবাদে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। তাঁহার মত বিবিধ গুণসম্পন্ন কোন মুসলমান সুলতান ইহার পূর্বে ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। আরবী ও

চরিত্রের গুণাবলী

ফার্সী ভাষায় তাঁহার অপূর্ব ব্যুৎপত্তি ছিল। অঙ্ক, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, অলংকার এবং কাব্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। কোরাণ, হাদিস ও অরিস্টটলের যুক্তিশাস্ত্র, তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। উলামাগণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক-বিচারে অস্থির হইয়া উঠিতেন। তিনি ছিলেন

আবস্ত বিশ্বকোষ। তাঁহার হস্তাক্ষর মুক্তার মত সুন্দর ছিল। তাঁহার ধর্ম ও নীতিজ্ঞান ছিল প্রখর। ইসলাম ধর্মে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি কখনও নমাজ লঙ্ঘন করেন নাই; অথচ মুসলিম ও হিন্দুর কুসংস্কার সহ্য করিতেন না। তিনি হিন্দুর সতীদাহ প্রথা সংস্কারের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রজার মঙ্গলের জন্য সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা দেশবিদেশে প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় ও ভদ্র ব্যবহার প্রত্যেক মানুষের চিত্ত সহজেই আকর্ষণ করিত।

অতগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও মুহম্মদ তুঘলক বাস্তব জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিফলতার প্রধান কারণ—লোকচরিত্র-জ্ঞানের অভাব এবং বাস্তব জীবনের কার্যে অতিরিক্ত যুক্তির অবতারণা। তিনি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন, তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেন। দূরদৃষ্টির অভাব ছিল তাঁহার চরিত্রের একটি মহৎ দোষ। তিনি তাঁহার কার্যে ও ব্যবহারে শেষ পরিণাম বিবেচনা করিতেন কিনা সন্দেহ।

চরিত্রের ত্রুটি

সম্পূর্ণ সদিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্যের কদর্থ করিল, প্রিয় আত্মীয়-স্বজন বিদ্রোহ করিল, উলামাগণ নিন্দা করিল, বন্ধুবর্গ প্রতারণা করিল। ফলে মুহম্মদ তুঘলক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন; কে বন্ধু, কে মিত্র তাহা বুঝিবার উপায় রহিল না। তখন তিনি আলাউদ্দীনের পথ অবলম্বন করিলেন—বিশ্বাসঘাতকদিগের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মুহম্মদ তুঘলকের চরিত্রে কতকগুলি বিরুদ্ধ দোষ-গুণের সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির সূক্ষ্মবিচার করিলে তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন সম্রাট বলিয়াই আখ্যা দেওয়া যায়। সুযোগ সুবিধা পাইলে এবং অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে বোধ হয় মুহম্মদ তুঘলক ভারতের একজন চিরস্মরণীয় সম্রাটরূপে বরণীয় হইতেন। ইবন বাত্‌তুতা সত্যই বলিয়াছেন, "মুহম্মদ তুঘলক বিশ্বের বিস্ময়।"

চরিত্রের সমালোচনা

তুঘলক সাম্রাজ্যের পতনে মুহম্মদ তুঘলকের দায়িত্ব:

অনেকের মতে মুহম্মদ তুঘলকের অব্যবস্থিতচিত্ততা, নৃসংশতা, বদান্যতা, মুদ্রাপ্রচলনে হঠকারিতা, পারস্য ও চীনের বিরুদ্ধে অভিযান, পঞ্জাবে কৃষকহত্যা প্রভৃতি কার্যাবলী তাঁহার পতনের কারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্যের পতনেরও কারণ। তাহাদের মতে মুহম্মদ তুঘলকের নিষ্ঠুরতা ও শত্রুদমনে কঠোরতায় সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ অধৈর্য হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং এই অন্তর্বিদ্রোহই তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। কারণ মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর প্রায় ৬৫ বৎসর পর পর্যন্ত

তুঘলক বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। ফিরুজ তুঘলক স্বচ্ছন্দমনে রাজত্ব করিয়াছেন। মুসলিম রাজ্যে বিদ্রোহ ছিল সংক্রামক ব্যাধি। রাজার মৃত্যুর পরে সিংহাসনের লোভে যুদ্ধ, রাজ্যশাসনের সময়ে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র মুসলিম যুগে ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কোন বংশই চিরকাল রাজত্ব করে না, তুঘলক বংশও করে নাই; ইহা ঐতিহাসিক নিয়ম। তুঘলক বংশের পতনের পরোক্ষ কারণ ফিরুজ তুঘলকের অপরিমিত জায়গির বণ্টন, দাসপ্রথা, ফিরুজের বংশধরদিগের অযোগ্য শাসন এবং প্রত্যক্ষ কারণ তৈমুরের আক্রমণ।

ফিরুজ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ) : ফিরুজ তুঘলকের পিতা ছিলেন ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের ভ্রাতা রজ্জব। তাঁহার মাতা ছিলেন পঞ্জাবের ভাটি রাজপুত নৃপতি রাণামলের কন্যা। মুহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনারোহণের সময়ে ফিরুজ ছিলেন চল্লিশোত্তীর্ণ প্রৌঢ় এবং মুহম্মদ তুঘলকের অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন। মুহম্মদ তুঘলক প্রথম হইতেই পিতৃব্যপুত্র ফিরুজকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া রাজকার্যে এবং সৈন্যচালনায় সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। ফিরুজ বহু যুদ্ধে মুহম্মদ তুঘলকের পার্শ্বচর ছিলেন। এমন কি থাট্টার যুদ্ধশিবিরে মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর দিনও ফিরুজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমীরদের সহায়তায়, শেখ ও উলামাদের অনুমোদনে ফিরুজ থাট্টাতে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

সুলতান পদ গ্রহণ

অন্যদিকে মুহম্মদ তুঘলকের প্রতিনিধি খাজা জাহান দিল্লীতে মুহম্মদ তুঘলকের এক বালক পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ফিরুজ এই সংবাদ শ্রবণের পর দ্রুতগতিতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। খাজা জাহান বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করা হইল। ফিরুজ তুঘলক নিশ্চিন্ত হইলেন।

ফিরুজ তুঘলকের সিংহাসন লাভের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, (১) সুলতান নির্বাচনে রক্তের দাবী অপেক্ষা যোগ্যতার দাবি প্রবলতর, (২) হিন্দু মাতার সন্তান বলিয়া সিংহাসনের দাবি অগ্রাহ্য হইবে না, (৩) তুর্কী আমীরগণ তখন অনেকটা শান্তিপ্রিয় হইয়াছিল ; কারণ আমীরগণ বোধ হয় সিংহাসনের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ফিরুজের সিংহাসন দাবির যৌক্তিকতা

ফিরুজ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণের দিনে ছিলেন চল্লিশোত্তীর্ণ প্রৌঢ়। তিনি ছিলেন শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ় জীবনে বহু নরহত্যা, রাজহত্যা ও অনাচারের প্রত্যক্ষদর্শী। মুহম্মদ তুঘলক ব্যক্তিগত ভাবে বহু গুণসম্পন্ন ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহার বিফলতার কারণ অনুধাবন করিবার মত অভিজ্ঞতা ও বয়স ফিরুজের ছিল। ফিরুজ জানিতেন যে, মুহম্মদ তুঘলকের বিফলতার কারণ ছিল—(১) উলামা বিদ্বেষ, (২) ক্রমাগত করবৃদ্ধিতে কৃষক ও

ফিরুজ তুঘলকের অভিজ্ঞতা

বণিকদিগের অসন্তোষ, (৩) রাজ্যমধ্যে সতত বিদ্রোহ, সৈন্যদের বিক্ষোভ, এবং (৪) মুহম্মদ তুঘলকের হিংস্র নিষ্ঠুরতা ও আমীরদের প্রাণনাশের আশঙ্কা।

ফিরুজ রাজ্যের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সুতরাং প্রথমেই তিনি উলামাদের উষ্মা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করেন। ফিরুজ জানিতেন যে, তিনি হিন্দু-মাতার সন্তান, সুতরাং তাঁহার সিংহাসনারোহণে এক শ্রেণীর উলামাগণ দ্বিধাগ্রস্ত। অবশ্য মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক অপমানিত উলামাগোষ্ঠী ফিরুজ তুঘলকের সিংহাসনারোহণে সমর্থন করিয়াছিল। কারণ, ফিরুজ সর্বদাই ইসলাম প্রীতির পরিচয় দিতেন। মুহম্মদ তুঘলকের সময় উলামাগোষ্ঠী প্রায়ই মুহম্মদ তুঘলকের কোরাণ-হাদিসের ব্যাখ্যা আলোচনায় পরাজিত ও অপমানিত হইত। মুহম্মদ তুঘলক আলাউদ্দীনের মত নীতিগত ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় উলামাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিতেন। ফিরুজ তুঘলক উলামাদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, স্বয়ং প্রতি শুক্রবারের নমাজের পর মোল্লাদের সঙ্গে কোরাণ-হাদিস আলোচনা করিতেন। প্রতিদিন নৈশ ভোজনে মোল্লাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেন। সর্বদাই তিনি মোল্লা পরিবৃত হইয়া বাস কবিতেন। ফিরুজের দরবারে উলামাগণ অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইসলামের নির্দেশ অনুসারে তিনি স্বর্ণখচিত বসন-ভূষণ ব্যবহার এবং পতাকার উপর জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান, সুতরাং তিনি শিয়া মুসলিমদের উপর অত্যাচার করিতেন। তাহাতে সুন্নী উলামাগোষ্ঠী সন্তুষ্ট হইয়াছিল। উলামাদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ করেন, প্রতি মসজিদের সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা বা মকতব স্থাপন করেন। মসজিদের জন্য ইমাম, মাদ্রাসা-মকতবের জন্য মুয়াল্লিম বা শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য ওয়াকফ বা ভূমি দান করেন ও বৃত্তি নির্ধারিত করেন। এই সকল কার্যের জন্য উলামাগোষ্ঠী ফিরুজ তুঘলকের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। মুসলিম ইতিহাসকার জিয়াউদ্দীন বারাণী এবং শামসী সিরাজ আফিজ ফিরুজ তুঘলককে 'ইসলাম রক্ষক' বলিয়া প্রশস্তি রচনা করেন।

ফিরুজের সমস্যা

সমস্যার সমাধান

ফিরুজ তাঁহার হিন্দুরক্তের ক্ষতিপূরণের জন্য এবং ইসলাম প্রীতি প্রমাণের জন্য হিন্দুদিগের প্রতি ইসলাম সম্মত বহু বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। ফিরুজ তাঁহার আত্মচরিত বা ফতুহাৎ-ই-ফিরুজ শাহী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"আমি হিন্দু প্রজাবর্গকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বহুভাবে উৎসাহিত করিয়াছি। ধর্মান্তরিত হিন্দুকে নগদ অর্থ, জায়গির, খেতাব (উপাধি) প্রদান করিয়াছি; তাহাদিগকে রাজকর্মচারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছি।" তিনি হিন্দুর উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবালয় ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণকে মুসলিম ধর্মের অবমাননার অভিযোগে তিনি প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড

দিয়াছিলেন। বুধন নামক একজন বৈষ্ণবকে নিষেধ সত্ত্বেও হরিনাম উচ্চারণের অপরাধে গলদেশ পর্যন্ত ভূ-প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং কুকুর দংশনে হত্যা করিয়া ইসলামের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ জিজিয়া করের বহির্ভূত ছিল; ফিরুজ তুঘলক সর্বপ্রথম ভারতে 'হিন্দুধর্ম রক্ষক' ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর নির্ধারণ করেন। ইসলাম ধর্মের জয় ঘোষণার জন্য ফিরুজ প্রতি বৎসর বিরাট সমারোহে ঈদ এবং সরবৎ উৎসব অনুষ্ঠান করিতেন।

ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর নির্ধারণ

মিশরের খলিফার সম্মতি, সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভের চিহ্ন স্বরূপ তিনি দুইবার মিশর হইতে রাজভূষণ (খেলাত) এবং স্বীকৃতি পত্র লাভ করেন। ভারতীয় মুসলমান সুলতানদের মধ্যে ফিরুজ তুঘলকই সর্বপ্রথম নিজেকে খলিফার নায়েব বা প্রতিনিধি বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করেন। তাঁহার মুদ্রায় খলিফার নাম অঙ্কিত করিয়া এবং নমাজের সময় খলিফার নামে খুৎবা পাঠ করিয়া তিনি ইসলামের আনুগত্য প্রমাণ করেন। ইহাতে প্রাচীনপন্থী উলামাগোষ্ঠী সন্তুষ্ট হইল। ফিরুজের হিন্দুরক্তের দোষ প্রক্ষালিত হইল।

খলিফার প্রতিনিধি

রাজস্ব বিভাগের প্রতিকার : মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষকালীন ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা, রাজকরের অনিশ্চয়তা, অকস্মাৎ কর বৃদ্ধি, যুদ্ধব্যয় প্রভৃতি কারণে রাজস্ব ব্যাপারে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল; প্রথমেই ফিরুজ দুর্ভিক্ষকালীন প্রদত্ত কৃষি-ঋণ (টাকাবী) মার্জনা করিয়া দিলেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইল। তিনি কৃষির সুবিধার জন্য সেচের ব্যবস্থা করেন এবং সেচকর প্রবর্তন করেন। তাহা ছাড়া ফিরুজ গোচারণ কর, গৃহশুল্ক প্রভৃতি বিরক্তিজনক চব্বিশ প্রকার রাজকর রহিত করিয়াছিলেন।

কৃষি-ঋণ মার্জনা

তিনি ইসলাম অনুমোদিত চারি প্রকার কর প্রবর্তন করেন, যথা—খারাজ (ভূমি ও খনি রাজস্ব), খামস্ (লুণ্ঠিত দ্রব্যাংশ), জিজিয়া (বিধর্মী প্রদত্ত কর) এবং জাকাৎ (বাৎসরিক আয়ের উদ্বৃত্ত অংশের শতকরা আড়াই ভাগ)।

চারি প্রকার কর প্রবর্তন

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি নানা প্রকার প্রান্তীয় কর রহিত করেন এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য সুগম করিয়া দেন। তিনি নৌচলাচলের জন্য খাল খনন করেন, যান চলাচলের জন্য নূতন পথ এবং সেতু নির্মাণ করেন। হিসার-ই-ফিরুজ নগরে যমুনার জল আনয়নের জন্য তিনি একশত পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করেন। তারপর পঞ্জাবের ঘাঘরা হইতে শতদ্রু এবং ফিরুজাবাদ পর্যন্ত দুইটি, যমুনা হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত একটি, মাণ্ডবী হইতে হান্সী পর্যন্ত একটি—মোট পাঁচটি খাল খনন করেন। পথিকদের জন্য

শুল্কনীতির পরিবর্তন

সেচ, খাল ও কূপ খনন

জলের ব্যবস্থা এবং সেচকার্যের সুবিধার জন্য মোট একশত পঞ্চাশটি কূপ খনন করেন। তিনি রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্মিত

মুদ্রানীতির সংস্কার

মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করেন ; ফিরুজ ভারতে প্রথম আধুলি, সিকি প্রভৃতি খণ্ড মুদ্রা প্রচলন করেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে যে সমস্ত মুদ্রা জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত হয়, ফিরুজের সময় সেইগুলির বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হয় নাই।

দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তনের সময় দিল্লীবাসী নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দিল্লীতে রাজধানী পুনরানীত হইলেও দিল্লীবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া রহিল। পাঁচটি নূতন শহর পত্তন করিয়া তিনি জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। এই নূতন নগরগুলির নাম—ফিরুজাবাদ (বর্তমান কোতলা ফিরুজশাহ দিল্লী), হিসার-ই-ফিরুজ, ফিরুজপুর (বদাউনের নিকট), ফতেহাবাদ এবং জৌনপুর। সমসাময়িক জনৈক ইতিহাসকার লিখিয়াছেন—ফিরুজ ত্রিশটি

শহর স্থাপন, উদ্যান রচনা

রাজপ্রাসাদ, দুইশত পান্থশালা, পাঁচটি জলকূপ, পাঁচটি চিকিৎসালয়, দশটি স্নানাগার, একশতটি সেতু এবং শত শত সুন্দর কবর নির্মাণ করিয়াছেন। দিল্লীর শোভা বর্ধনের জন্য দিল্লীতে

অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে স্থানান্তরিত

লতা-গুল্ম শোভিত ফলবান বৃক্ষরাজী সমন্বিত সহস্রাধিক উদ্যান ও প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেন, দিল্লীর সম্মান বৃদ্ধির জন্য এলাহাবাদের নিকটবর্তী খিজরাবাদ হইতে একটি এবং মীরাট হইতে অন্য একটি অশোক স্তম্ভ দিল্লীতে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রধান স্থপতি ছিলেন মালিক গাজী সহনা এবং আব্দুল হক।

পূর্বে ভূমির উৎপন্ন শস্য বণ্টন করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত। ফিরুজ তুঘলক অভিজ্ঞ রাজস্ব কর্মচারী খাজা হিসামউদ্দীনের সাহায্যে পূর্ববর্তী ছয় বৎসরের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া খালসা বা সুলতানের খাস ভূমির রাজস্ব

ভূমি রাজস্ব সংস্কার

নির্ধারণ করিলেন। ফলে রাজ্যের ভূমিকর বাৎসরিক ছয় কোটি পঁচাশি লক্ষ তঙ্কা নির্দিষ্ট হইল। আলাউদ্দীন ও মুহম্মদ তুঘলক ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করিতেন। ফিরুজ ভূমি-পরিমাপ প্রথা বিলোপ করিয়া দিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলক জায়গির প্রথার বিরোধী ছিলেন। ফিরুজ জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন। তিনি সেনাপতি এবং সৈনিকদের জন্য বেতনের পরিবর্তে জায়গিরের ব্যবস্থা করেন।

দাসক্রয় ও দাসপ্রীতি ছিল ফিরুজ তুঘলকের বিলাস। তাঁহার সময় দিল্লী

ক্রীতদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি: রাজস্বের ক্ষতি

সুলতানের অধীনে এক লক্ষ আশি হাজার দাস ছিল। এই দাসদিগের মধ্যে চল্লিশ হাজার দাস ছিল তাঁহার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দাসদিগের খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদির জন্য বহু অর্থ রাজকোষ হইতে ব্যয়িত হইত। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই সমস্ত দাসগণ

বিভিন্ন রাজকার্যের জন্য নিযুক্ত হইত। তাহাদের সুব্যবস্থার জন্য দেওয়ান-ই বান্দাগান নামে একটি বিভাগ ছিল। পরবর্তিকালে এই দাসগণ তুর্ক-আফঘান সুলতানী ধ্বংসের অন্যতম কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

ফিরুজ তুঘলকের সৈন্য-ব্যবস্থা: তুর্ক-আফঘান সুলতান তরবারির সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তরবারির সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি তুর্ক-আফঘান সন্তান ছিল যোদ্ধা ও যুদ্ধব্যবসায়ী। লুণ্ঠন ছিল তাহাদের জীবিকা। সাধারণত ভারতীয় মুসলিমদের তুর্ক-আফগান সৈন্য বিভাগে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তরঙ্গের মত যাযাবর তুর্ক-আফঘান-মোঙ্গলগণ কর্ম সন্ধানে অথবা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তাহাদের আমীর বা নেতার অধীনে হিন্দুস্থানে আগমন করিত। সুলতানগণ ব্যক্তিগতভাবে সৈন্য নিযুক্ত করিতেন না, আমীরদের মাধ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। আমীরগণ যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ভূমি বা জায়গির লাভ করিত। আলাউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলক এই ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা জায়গির প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেন। ইসলামের নিয়ম অনুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ অংশের চারি অংশ মুসলিম সৈন্যদের প্রাপ্য ছিল। একভাগ মাত্র আল্লার প্রাপ্য ছিল। আল্লার নামে মুহম্মদ অথবা খলিফা লুণ্ঠনের সেই অংশ গ্রহণ করিতেন। আলাউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলকের সময় সৈন্যদের প্রাপ্য হইল লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ, রাজকোষের প্রাপ্য হইল চারি অংশ। আমীরগণ জায়গির বিলোপের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন, সৈন্যগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিল। ফিরুজ তুঘলক আরবীয় ইসলামের নীতি অনুসারে সৈন্যদিগকে চারি-পঞ্চমাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সৈন্যগণ সন্তুষ্ট হইল। সৈন্যদেরও জায়গির প্রদান করা হইল এবং এই জায়গির ছিল বংশানুক্রমিক। সৈন্যের পুত্র রক্তের দাবিতে সৈনিকপদ ও জায়গির লাভ করিত। পদ ও জায়গির লাভের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল না। পুত্র, জামাতা, এমনকি স্নেহভাজন দাসও মৃত সৈনিকদের পদ ও জায়গির উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিত। ফলে অচিরকাল মধ্যে তুর্ক-আফঘান সৈন্যবিভাগে ঘুন ধরিয়া গেল। আমীরানা প্রথা অনুসারে আমীরদের উপরই সৈন্য সংগ্রহ, সৈন্যের নিয়ম শৃঙ্খলা, পদোন্নতি নির্ভর করিত। রাজপ্রাসাদ বা রাজধানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সৈন্য ব্যতিরেকে প্রাদেশিক সৈন্যদের উপর সুলতানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ফিরুজের সময় সুলতানের দেহরক্ষার ভার ছিল দাসগণের উপর। দাসগণ সৈন্যবিভাগে উচ্চপদের অধিকারী ছিল সুতরাং আমীর এবং দাসদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল নিত্যকার ব্যাপার। ফিরুজ তুঘলক রাজ্যের সকল শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া রাজ্যমধ্যে ভবিষ্যতের অকল্যাণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের সামরিক

সামরিক সংগঠন

ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

ফিরুজ তুঘলকের যুদ্ধ-বিগ্রহ : ফিরুজের ধমনীতে বীর রাজপুতানী এবং দুর্ধর্ষ তুঘলক যোদ্ধার রক্ত ছিল। অথচ ফিরুজ তুঘলক ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ এবং সৈন্য চালনায় অপটু। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্য দিল্লী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বাহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফিরুজ দাক্ষিণাত্যের বিচ্যুত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুসলিম, সুতরাং মুসলিম বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করিয়া মুসলিম রক্তপাত করিব না।"

বাঙ্গলা দেশে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস 'শামসুউদ্দীন ইলিয়াস' উপাধি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলার উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ত্রিহুত জয় করিয়া বাস্তবিক পক্ষে দিল্লী সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত অধিকার করিলেন।

বাঙ্গলার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের বিফলতা

ফিরুজ সত্তর হাজার অশ্বরোহী সহ বাঙ্গলার রাজধানী পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন। শামসুউদ্দীন ইলিয়াস পাণ্ডুয়া পরিহার করিয়া দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফিরুজ পাণ্ডুয়া দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। আসন্ন বর্ষার ভয়ে তিনি ইলিয়াসের বাধা সত্ত্বেও দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন; প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পাণ্ডুয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া মুসলিম রক্তপাত করিবেন না।

ছয় বৎসর পরে ফিরুজ ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন সুলতানের জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। ইলিয়াসের পুত্র

বাঙ্গলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের বিফলতা

সিকন্দর শাহ এবারও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া ফিরুজ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন এবং বাঙ্গলার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। ফিরুজ ঘোষণা করিলেন, তিনি মুসলিম রক্তপাত করিবেন না।

প্রত্যাবর্তনের পথে জৌনপুর হইতে ফিরুজ জাজনগরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, জাজনগরের নিকটবর্তী পুরীর মন্দিরে জগন্নাথের বিগ্রহ ও যুগ যুগ সঞ্চিত ধনরত্ন গচ্ছিত রহিয়াছে। দিল্লীর সুলতানের

উড়িষ্যা অভিযান

সৈন্যের আগমনবার্তা শ্রবণে জাজনগরের অধিপতি নগর পরিত্যাগ করিলেন। ফিরুজ পুরীর মন্দির অপবিত্র করিলেন, জগন্নাথের বিগ্রহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। জাজনগরের রাজা বিংশতী হস্তী উপহার প্রদান করিয়া ফিরুজ তুঘলকের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ফিরুজ তুঘলক ধন্য হইলেন। ইহাই ফিরুজের বৃহত্তম সামরিক বিজয়।

কাঙাড়া উপত্যকা মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীর বশ্যতা

বিভিন্ন রাজকার্যের জন্য নিযুক্ত হইত। তাহাদের সুব্যবস্থার জন্য দেওয়ান-ই বান্দাগান নামে একটি বিভাগ ছিল। পরবর্তিকালে এই দাসগণ তুর্ক-আফঘান সুলতানী ধ্বংসের অন্যতম কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

ফিরুজ তুঘলকের সৈন্য-ব্যবস্থা : তুর্ক-আফঘান সুলতান তরবারির সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তরবারির সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি তুর্ক-আফঘান সন্তান ছিল যোদ্ধা ও যুদ্ধব্যবসায়ী। লুণ্ঠন ছিল তাহাদের জীবিকা। সাধারণত ভারতীয় মুসলিমদের তুর্ক-আফগান সৈন্য বিভাগে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তরঙ্গের মত যাযাবর তুর্ক-আফঘান-মোঙ্গলগণ কর্ম সন্ধানে অথবা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তাহাদের আমীর বা নেতার অধীনে হিন্দুস্থানে আগমন করিত। সুলতানগণ ব্যক্তিগতভাবে সৈন্য নিযুক্ত করিতেন না, আমীরদের মাধ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। আমীরগণ যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ভূমি বা জায়গির লাভ করিত। আলাউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলক এই ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা জায়গির প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেন। ইসলামের নিয়ম অনুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ অংশের চারি অংশ মুসলিম সৈন্যদের প্রাপ্য ছিল। একভাগ মাত্র আল্লার প্রাপ্য ছিল। আল্লার নামে মুহম্মদ অথবা খলিফা লুণ্ঠনের সেই অংশ গ্রহণ করিতেন। আলাউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলকের সময় সৈন্যদের প্রাপ্য হইল লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ, রাজকোষের প্রাপ্য হইল চারি অংশ। আমীরগণ জায়গির বিলোপের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন, সৈন্যগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিল। ফিরুজ তুঘলক আরবীয় ইসলামের নীতি অনুসারে সৈন্যদিগকে চারি-পঞ্চমাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সৈন্যগণ সন্তুষ্ট হইল। সৈন্যদেরও জায়গির প্রদান করা হইল এবং এই জায়গির ছিল বংশানুক্রমিক। সৈন্যের পুত্র রক্তের দাবিতে সৈনিকপদ ও জায়গির লাভ করিত। পদ ও জায়গির লাভের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল না। পুত্র, জামাতা, এমনকি স্নেহভাজন দাসও মৃত সৈনিকদের পদ ও জায়গির উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিত। ফলে অচিরকাল মধ্যে তুর্ক-আফঘান সৈন্যবিভাগে ঘুন ধরিয়া গেল। আমীরানা প্রথা অনুসারে আমীরদের উপরই সৈন্য সংগ্রহ, সৈন্যের নিয়ম শৃঙ্খলা, পদোন্নতি নির্ভর করিত। রাজপ্রাসাদ বা রাজধানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সৈন্য ব্যতিরেকে প্রাদেশিক সৈন্যদের উপর সুলতানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ফিরুজের সময় সুলতানের দেহরক্ষার ভার ছিল দাসগণের উপর। দাসগণ সৈন্যবিভাগে উচ্চপদের অধিকারী ছিল সুতরাং আমীর এবং দাসদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল নিত্যকার ব্যাপার। ফিরুজ তুঘলক রাজ্যের সকল শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া রাজ্যমধ্যে ভবিষ্যতের অকল্যাণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের সামরিক

সামরিক সংগঠন

ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

ফিরুজ তুঘলকের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঃ ফিরুজের ধমনীতে বীর রাজপুতানী এবং দুর্ধর্ষ তুঘলক যোদ্ধার রক্ত ছিল। অথচ ফিরুজ তুঘলক ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ এবং সৈন্য চালনায় অপটু। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্য দিল্লী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বাহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফিরুজ দাক্ষিণাত্যের বিচ্যুত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুসলিম, সুতরাং মুসলিম বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করিয়া মুসলিম রক্তপাত করিব না।"

বাঙ্গলা দেশে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস 'শামসুউদ্দীন ইলিয়াস' উপাধি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলার উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ত্রিহুত জয় করিয়া বাস্তবিক পক্ষে দিল্লী সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত অধিকার করিলেন।

বাঙ্গলার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের বিফলতা

ফিরুজ সত্তর হাজার অশ্বরোহী সহ বাঙ্গলার রাজধানী পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন। শামসুউদ্দীন ইলিয়াস পাণ্ডুয়া পরিহার করিয়া দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফিরুজ পাণ্ডুয়া দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। আসন্ন বর্ষার ভয়ে তিনি ইলিয়াসের বাধা সত্ত্বেও দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পাণ্ডুয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া মুসলিম রক্তপাত করিবেন না।

ছয় বৎসর পরে ফিরুজ ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন সুলতানের জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। ইলিয়াসের পুত্র

বাঙ্গলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের বিফলতা

সিকন্দর শাহ এবারও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া ফিরুজ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন এবং বাঙ্গলার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। ফিরুজ ঘোষণা করিলেন, তিনি মুসলিম রক্তপাত করিবেন না।

প্রত্যাবর্তনের পথে জৌনপুর হইতে ফিরুজ জাজনগরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, জাজনগরের নিকটবর্তী পুরীর মন্দিরে জগন্নাথের বিগ্রহ ও যুগ যুগ সঞ্চিত ধনরত্ন গচ্ছিত রহিয়াছে। দিল্লীর সুলতানের

উড়িষ্যা অভিযান

সৈন্যের আগমনবার্তা শ্রবণে জাজনগরের অধিপতি নগর পরিত্যাগ করিলেন। ফিরুজ পুরীর মন্দির অপবিত্র করিলেন, জগন্নাথের বিগ্রহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। জাজনগরের রাজা বিংশতী হস্তী উপহার প্রদান করিয়া ফিরুজ তুঘলকের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ফিরুজ তুঘলক ধন্য হইলেন। ইহাই ফিরুজের বৃহত্তম সামরিক বিজয়।

কাঙাড়া উপত্যকা মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীর বশ্যতা

অস্বীকার করিয়াছিল। ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ স্বয়ং রাজধানী কাঙড়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কাঙড়ার বিখ্যাত রাজগ্রন্থাগার লুণ্ঠন করিয়া ফিরুজ তেরশত হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি বিধর্মীর ধর্মভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করেন নাই, বরং কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত করেন। ইহা তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা প্রমাণ করে। জ্ঞানস্পৃহাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

নগরকোট অভিযান

১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে নব্বই হাজার অশ্বারোহী, চারিশত হস্তী এবং অসংখ্য নৌযান সহ ফিরুজ সিন্ধু আক্রমণ করেন। সিন্ধুরাজ জাম ভবানী ফিরুজকে রাজ্যসীমা হইতে দূর করিয়া দেন। দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইলে ফিরুজ তুঘলক থাট্টার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার অভিযান করেন। রাজা জাম ভবানী সামান্য করদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে ফিরুজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সিন্ধু বিজয়

ইহার পর সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল কোন যুদ্ধব্যাপারে ফিরুজ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সামরিক নিশ্চেষ্টতা তাঁহার শান্তিপ্রিয়তা ও ভীরুতা উভয় প্রকার মনোভাব ইঙ্গিত করে। ফিরুজের রাজত্বকালে দুইবার মোঙ্গলগণ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই।

মুহম্মদ তুঘলকের সময় এত বেশী বিদ্রোহ হইয়াছিল যে, জনগণের মধ্যে আর নূতন বিদ্রোহের উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না। ফিরুজের সুদীর্ঘ রাজত্বের মধ্যে মাত্র চারিটি বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজ্যারম্ভে মুহম্মদ তুঘলকের ভাগিনেয় খানাজাদা বিদ্রোহ করিয়া বিফল হন। শেষ জীবনে গুজরাটের শাসনকর্তা দামঘানী বিদ্রোহ করিয়া নিহত হন। ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতের এটাওয়ার কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। তারপর পঞ্জাবের কাটেহার (কুমায়ুন) অঞ্চলের দুইজন সৈয়দ হত্যার অপরাধে রাজা কাকুরুর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। রাজা পলায়ন করিলে ফিরুজ কাটেহারের নিরপরাধ প্রজাকুলকে হত্যা করেন এবং তেইশ হাজার হিন্দু নরনারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কাটেহারে একজন দুর্ধর্ষ আফঘান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই আফঘান শাসক প্রতি বৎসর একটি বিশিষ্ট দিনে বিধর্মী-হত্যা উৎসব অনুষ্ঠান করিতেন, স্বয়ং ফিরুজ তুঘলক সেই অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

রাজ্যে বিদ্রোহ

ফিরুজের জনহিতকর কার্যাবলী ঃ সুলতান ফিরুজ কর্মপ্রার্থীর কর্ম-সংস্থানের জন্য একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রজাবর্গ কর্মে নিযুক্ত হইত। এই সমস্ত নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিধর্মীর স্থান ছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। তিনি দরিদ্র মুসলিমের জন্য দান বিভাগ (দেওয়ান-ই-খয়রাত) ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

মুসলিম কুমারীদের বিবাহের জন্য রাজকোষ হইতে সাহায্য দান করা হইত। রাজ্যের অনাথা বিধবা এবং মাতা-পিতাহীন শিশুদের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা করা হইত। রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য রাজকীয় চিকিৎসালয় (দার-উস-সাফা) স্থাপন করা হইত এবং উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হইত। ফিরুজ কাঙাড়া হইতে লুণ্ঠিত গ্রন্থের মধ্য হইতে একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অন্য একখানি অনূদিত পুস্তকের নাম দালাইল-ই-ফিরুজ শাহী। তিনি স্বয়ং আত্মচরিত রচনা করেন—উহার নাম ফতুহাৎ-ই-ফিরুজ শাহী। তাঁহার অনুগ্রহভাজন ইতিহাস লেখকদিগকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় জিয়াউদ্দীন বারাণী এবং শামসী সিরাজ আফিফ তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী নামে দুইখানি বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন; তিনি বিখ্যাত সুফী জ্ঞানী জালালউদ্দীন রুমীকে হিন্দুস্থানে আমন্ত্রণ করিয়া গুণীর সমাদর করেন।

দান বিভাগ

বিদ্যোৎসাহিতা

নগর ও প্রাসাদ নির্মাণ, উদ্যান রচনা, সেচ ও কূপ খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ ও চক্ষু উৎপাটন-রূপ শাস্তি বিলোপ প্রভৃতি জন-হিতকর কার্য ফিরুজের শাসনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

ফিরুজ তুঘলকের শেষ জীবন ঃ 'ক্রীতদাস জীবন মানুষের অভিশাপ' —এই প্রবাদ ফিরুজের জীবনে অতি সত্য হইয়াছিল। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজের প্রিয় মন্ত্রী খান-ই-জাহান মুকবুলের মৃত্যুতে ফিরুজের দক্ষিণ হস্ত শিথিল হইয়া যায়; মুহম্মদ তুঘলকের সময় হইতে এই ধর্মান্তরিত নিরক্ষর তেলিঙ্গানা নিবাসী হিন্দু ছিলেন রাজ্যের বিশ্বাসভাজন কর্মচারী, সুলতানদের জায়গিরদার। খান-ই-জাহান মুকবুল ছিলেন রাজ্যের কর্ণধার, ফিরুজের শাসন-ব্যবস্থার প্রাণ। মুকবুলের মৃত্যুর পর ফিরুজ তাঁহার পুত্র জুনা শাহকে খান-ই-জাহান উপাধি ভূষিত করিয়া প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনের জন্য মনোনীত উত্তরাধিকারী ফিরুজের জ্যেষ্ঠপুত্র ফতে খান পরলোক গমন করিলেন। ইহাতে ফিরুজের দেহ-মন দুই-ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি দ্বিতীয় পুত্র জাফর খানকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেন। জাফর খান এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী হইলেন। তৃতীয় পুত্র মুহম্মদকে ফিরুজ সিংহাসনের জন্য মনোনয়ন করিতে ভরসা পাইলেন না। কারণ মুহম্মদের প্ররোচনায় খান-ই-জাহান নিহত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে বার্ধক্যের দরুণ ফিরুজের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। ফিরুজ মুহম্মদের সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। অচিরকাল মধ্যে পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল এবং মনোমালিন্য যুদ্ধে পরিণত হইল। মুহম্মদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন

ফতে খানের মৃত্যু

মুহম্মদের সহিত ফিরুজের যুদ্ধ

করিলেন। ফিরুজ তাঁহার প্রিয় পুত্র ফতে খানের পুত্র দ্বিতীয় ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলককে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিলেন (১৩৮৭ খ্রীঃ)। ইহার তিন মাস পরে ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ ভগ্ন হৃদয়ে স্বস্তির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ফিরুজ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ ফিরুজ তুঘলক ভারতে সর্বপ্রথম মিশ্র মুসলিম সুলতান—হিন্দু মাতা এবং তুর্কী পিতার সন্তান। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দুসন্তান। তাঁহার পূর্বে একশত পঞ্চাশ বৎসরকাল তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ তরবারির উপর নির্ভর করিয়া রাজ্য জয় করিয়াছেন এবং রাজ্য শাসন করিয়াছেন। রাজস্ব সংগ্রহ, বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার ছিল সুলতানী আমলের একমাত্র করণীয়। ফিরুজের মধ্যে ছিল মুসলিম প্রজার কল্যাণ প্রচেষ্টা। নগর পত্তন, পথ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা, খাল ও কূপ খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যোৎসাহিতা, জ্ঞানীর পৃষ্ঠপোষকতা, নিষ্ঠুর শাস্তিবিধান বর্জন প্রভৃতি মুসলিম জনহিতকর কার্যাবলী সুলতানী আমলের গৌরবময় অধ্যায় নিঃসন্দেহ। বণিক, কৃষক, সৈনিক, আমীর, উলামা—সকল শ্রেণীর মুসলিম প্রজাবর্গের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত ফিরুজের আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহকে তিনি রাজ্যের কার্যক্রম হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন।

আপাত দৃষ্টিতে ফিরুজ বহু গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল না। কোন কার্য আরম্ভ করিয়া তিনি প্রায়ই উহা শেষ করিতে পারিতেন না। তুর্কীসুলভ মনোবৃত্তি লইয়া অনেকবার তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই-একটি দুর্বল ক্ষেত্র ভিন্ন কোথাও যুদ্ধ শেষ করিতে পারেন নাই। 'মুসলিম রক্তপাত করিবেন না'—এই যুক্তি দ্বারা নিজের দুর্বলতার সমর্থন করিয়াছেন। অথচ মুসলমান রাজ্য বাংলা ও সিন্ধুপ্রদেশের সহিত যুদ্ধারম্ভে এই যুক্তি অনুসরণ করেন নাই। জাজনগর, নগরকোট ও কাটেহারের হিন্দুর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে কিংবা নরহত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সাধারণ দৃষ্টিতে ফিরুজ দয়ালু; কিন্তু বিধর্মীর সহিত ব্যবহারে তাঁহার দয়ার উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কাটেহারে জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু হত্যার উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ফিরুজ একজন হিন্দু বৈরাগীকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া কুকুর দ্বারা দংশন করাইয়া পুণ্য অর্জন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলিম; সুতরাং শিয়া, সুফী, মাহাদী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমদের উপর অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিতে বিবেকের দংশন অনুভব করেন নাই। তিনি শিয়া এবং সুফী ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ্যে অগ্নিবক্ষে আহুতি প্রদান করিয়া সুন্নী মোল্লাদিগের সন্তোষ বিধান করিয়াছিন।

ফিরুজের দাসপ্রীতি পরবর্তী কালে সুলতানী রাজত্বের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত

করিয়া দিয়াছিল। তিনি জায়গির প্রথা পুনঃ প্রবর্তন করিয়া এবং বংশানুক্রমিক সৈনিকপদ প্রদান করিয়া রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

ফিরুজ সকল শ্রেণীর মুসলমান প্রজাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে এটাওয়ার অঞ্চলে দুর্ধর্ষ কৃষককুল বিদ্রোহ করিয়াছিল। আমীরগণ ফিরুজের জীবনের শেষভাগে তাঁহার পুত্র মুহম্মদকে বিদ্রোহে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সৈনিক বিভাগে উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে অবহিত হইলেও উহা প্রকাশ্যে নিষেধ করিতে সাহস পান নাই। সুলতান হইয়া তিনি স্বয়ং সামান্য সৈনিককে কোন একটি বিশেষ কার্যের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন। টাকশালের অধ্যক্ষ রৌপ্যের সঙ্গে দস্তা মিশাইয়া মুদ্রা নির্মাণ করিত, ইহা জানিয়াও তাহাকে নিষেধ করিবার মত সাহস ফিরুজের ছিল না। শেষ বয়সে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল।

ফিরুজের গুণগুলি পরবর্তিকালে দোষের আকর হইয়াছিল। আপাত-দৃষ্টিতে সহৃদয়তা, দয়ালুতা, যুদ্ধে নিস্পৃহতা—তাঁহার দুর্বলচিত্ততার অন্যদিক। সাধারণভাবে তিনি সমসাময়িক ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। ভারতে ফিরুজ আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মান্তরীকরণ প্রায় রাজকার্য-সূচীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি ব্যবহার ছিল অ-রাজোচিত—রাজ্যের প্রজা বলিতে মুসলমান প্রজাই বুঝিতেন। ইসলামের গৌরব ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুরক্তের পাপ স্খালনের জন্য ফিরুজ হিন্দুরক্তে তর্পণ করিয়া স্বীয় রক্তশুদ্ধি করিয়াছিলেন।

ফিরুজের পরবর্তী তুঘলকগণ (১৩৮৮-১৪১৩ খ্রীঃ): এই পঁচিশ বৎসরের সুলতানী ইতিহাস অত্যন্ত করুণ। কুতুবউদ্দীন আইবক হইতে ফিরুজের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় একশত নব্বই বৎসরে যে তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা গলিত শবের মাংসখণ্ডের মত মাত্র বার বৎসরের মধ্যে ঝরিয়া পড়িল। এই বার বৎসরের মধ্যে ফিরুজ তুঘলকের পৌত্র দ্বিতীয় ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক হইতে আরম্ভ করিয়া নাসীরউদ্দীন মুহম্মদ পর্যন্ত ছয় জন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, নরহত্যা তুঘলক পরিবারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একই সময়ে তুঘলক বংশের দুইজন সন্তান—একজন দিল্লীতে, অন্যজন ফিরুজাবাদে রাজত্ব করিতেন। বদাউনী বলিয়াছেন—দিল্লীর সুলতানগণ ছিলেন সতরঞ্চের ঘুঁটি। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে জৌনপুরের খোজা মালিক সারওয়ার 'সুলতান-উস-শার্কী' (পূর্বদেশীয় সুলতান) উপাধি গ্রহণ করিয়া জৌনপুরে শার্কী বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খান স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। মালব ও খান্দেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পূর্ব পঞ্জাবে খোক্করগোষ্ঠী বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। গোয়ালিয়রে হিন্দুগণ সম্পূর্ণ

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। রাজপুতানা এবং দোয়াব অঞ্চলে হিন্দুগণ বারংবার দিল্লী-সুলতানের আধিপত্য অস্বীকার করিল। আগ্রার নিকটবর্তী বায়েনাতে নূতন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৈমুরের আক্রমণ (১৩৯৮খ্রীঃ): তৈমুর ছিলেন তুর্কী চাঘতাই বংশীয় তারাঘাই-এর পুত্র। গুরগণ বা জামাতা ছিল তাঁহার উপাধি। তৈমুরের পিতৃবংশ চেঙ্গিসের জামাতৃবংশ। তৈমুরের জন্মস্থান ট্রান্স-অক্সিয়ানা। তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন ধর্মে সামানী বৌদ্ধ। তাঁহার পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। তৈমুব তেত্রিশ বৎসর বয়সে (১৩৬৯ খ্রীঃ) সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অচির-কাল মধ্যেই মেসোপটেমিয়া, আফঘানিস্থান ও পাবস্য জয় কবেন। ভারতবর্ষেব বিপুল অর্থ-সম্পদের কাহিনী এবং দিল্লী সুলতানদের পতনোন্মুখ অবস্থার সংবাদে তাঁহার যশ ও অর্থাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল। তৈমুর ঘোষণা করিলেন যে, দিল্লীর সুলতান বিধর্মী হিন্দুকে মূর্তিপূজায় প্রশ্রয় দান কবেন। সুতরাং পবিত্র ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি বিধর্মীর দেশ জয় কবিয়া হিন্দুস্থানে ইসলামের ধর্মরাজ্য স্থাপন কবিবেন। নবদীক্ষিত তুর্কী জাতি ধর্মের আবেদনে এবং লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

জন্ম ও প্রারম্ভ জীবন

তৈমুরলঙ (প্রাচীন চিত্র)

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৈমুর তাঁহার পৌত্র পীর মুহম্মদের অধীনে একটি অগ্রগামী দল প্রেবণ করিয়া মুলতান অধিকাব করিলেন। কয়েক মাস পরে গ্রীষ্মারম্ভে সমরখন্দ হইতে বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ সিন্ধু-ঝিলাম-ইরাবতী অতিক্রম কবিয়া ছয় মাসের মধ্যে দিল্লীব সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। পথে তৈমুর প্রতিটি নগব ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিলেন—নির্বিচারে হিন্দু হত্যা করিয়া ইসলামপ্রীতি প্রমাণ করিলেন। দিল্লীর সুলতান নাসীরউদ্দীন মামুদ তুঘলক এবং তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মল্লু ইকবাল দিল্লীর বহির্ভাগে তৈমুরের সম্মুখীন হইলেন। তৈমুর যুদ্ধারম্ভের পূর্বে একলক্ষ হিন্দু বন্দীকে দ্রুতগতিতে হত্যা করিয়া তাহাদের খাদ্যব্যবস্থা ও বাসস্থানের ভারমুক্ত হইলেন। তারপর তৈমুর তুঘলক সৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সুলতান মামুদ গুজরাটে এবং মল্লু ইকবাল বুলন্দ শহরে পলায়ন করিলেন।

ভারতবর্ষ আক্রমণ (১৩৯৮ খ্রীঃ)

তৈমুর দিল্লী অধিকার করিলেন। দিল্লীর অধিবাসী এবং মোল্লাগণ

তৈমুরের আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তৈমুর আশ্রয় দানে স্বীকৃত হইলেন। কথিত আছে, ইতোমধ্যে তৈমুরের সৈন্যগণের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া অথবা তৈমুরের মৃত্যু-সংবাদের জনশ্রুতিতে উল্লসিত হইয়া দিল্লীবাসী কয়েক শত চাঘতাই সৈন্ত হত্যা করিল। প্রত্যুত্তরে তৈমুর হিন্দু-মুসলিম নির্বিচারে দিল্লীবাসীর হত্যা এবং লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। দিল্লীর রাজপথ স্তূপীকৃত মৃতদেহে রুদ্ধ হইয়া গেল। দিল্লীবাসীর গৃহে একখণ্ড মণি-মুক্তা কিংবা এক তোলা স্বর্ণও অবশিষ্ট রহিল না। দিল্লীর বিখ্যাত এবং নিপুণ শিল্পিদিগকে বন্দী করিয়া সমরখন্দে জুম্মা মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রেরণ করা হইল। পনর দিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়া ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি তৈমুর সমরখন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ফিরুজাবাদ, কাঙাড়া ও জম্মুর অধিবাসিদিগকে পশুর মত হত্যা করিয়া ভারত সীমান্ত ত্যাগ করিলেন। খিজির খান নামক একজন আরবজাতীয় অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষকে মুলতান, লাহোর এবং দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

তৈমুরের দিল্লী প্রবেশ : পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন

তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলাফল : তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলাফল প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনীয়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লীর বিশাল তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্য শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কেন্দ্রীয় শক্তি নামমাত্র অবশিষ্ট রহিল। দিল্লীর চারিপার্শ্বে কয়েক ক্রোশ মাত্র স্থান ব্যাপিয়া দিল্লী সাম্রাজ্য সংকুচিত হইয়া গেল। দিল্লীর ভীতি-বিমুক্ত দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। জৌনপুর, গুজরাট, মালব, ভরতপুর, কল্পী, গোয়ালিয়র, মেবার প্রভৃতি রাজ্যগুলি দিল্লীর আধিপত্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। দিল্লীর রাজমর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। সুলতানী সৈন্যের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল।

রাজনৈতিক ফলাফল

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, তৈমুরের আক্রমণের ফলে জনবল ও ধনবলে হিন্দুস্থান নিঃস্ব হইয়া গেল। তৈমুর কর্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ অঙ্কের দ্বারা পরিমিত হয় না। সমসাময়িক ইতিহাসকার বলিয়াছেন যে, তৈমুরের প্রতিটি সৈনিক স্বর্ণ-রৌপ্য-বস্ত্র ব্যতীত অন্ততঃ বিশজন দাসের প্রভু হইয়াছিল। উত্তর ভারতের যানবাহন পশুর অভাবে অব্যবহার্য হইয়া গেল। মৃতদেহের পূতিগন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া গেল, রক্তস্রোতে যমুনার জল কলুষিত হইল। পথিপার্শ্বে তৈমুরের সৈন্যগণ শস্যক্ষেত্র নষ্ট বা লুণ্ঠন করিল, ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইল।

অর্থনৈতিক ফলাফল

ধর্মবিচারে তৈমুর অভিযানের প্রারম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি

কাফেরের দেশকে ইসলামের পবিত্র ভূমিতে পরিণত করিবেন। কিন্তু তখন হিন্দুস্থান ছিল মুসলিম শাসিত দেশ। বাস্তবিক পক্ষে তৈমুরের অভিযান ছিল মুসলিমের বিরুদ্ধে মুসলিমের অভিযান। নবদীক্ষিত চাঘতাই তুর্কদিগকে ধর্মের নামে উদ্বোধিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুস্থানকে কাফেরের দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তৈমুরের রক্ত-তৃষাতুর তরবারি ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের রক্তে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিল। তৈমুরের লুণ্ঠনোন্মাদ সৈন্যগণ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সম্পদ সমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিল।

ধর্মীয় ফলাফল

তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের পরে : তৈমুরের আগমনে ও অত্যাচারে তুঘলক বংশের সন্তানগণ এত ভীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের পর তিন মাসের মধ্যেও দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। মল্লু ইকবাল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মামুদ শাহ তুঘলককে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার চার বৎসব পরে মূলতানের শাসনকর্তা খিজির খান মল্লু ইকবালকে হত্যা করিলেন। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলক বংশের অবসান হইল। মূলতানেব শাসনকর্তা খিজির খান দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

খিজির খান কর্তৃক দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

(Give in short the career and achievements of Ghyasuddin Tughluq.)

২। মুহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার বিবরণ দাও। মুহম্মদ তুঘলক কি বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন?

(Give an estimate of the character and achievements of Muhammed Tughluq. Was he a mixture of opposites?)

৩। ফিরূজ তুঘলকের শাসন পদ্ধতি ও হিন্দুনীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Describe in brief the administration of Firuz Tughluq with special reference to his Hindu Policy.)

৪। তৈমুরের ভারত আক্রমণের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(Narrate the causes and effects of Timur's invasion in India.)

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়দ ও লোদী বংশের রাজত্ব

দিল্লী সুলতানীর পতনের যুগ (১৪১৪-১৫২৬ খ্রীঃ)

অধ্যায় পরিচয়ঃ এই সুদীর্ঘ একশত বার বৎসরের মধ্যে আরবের সৈয়দ বংশের চারিজন সুলতান ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (৩৭ বৎসর) এবং ভারতীয় আফঘান বা পাঠান বংশীয় তিনজন সুলতান ১৪৫১ খ্রীঃ হইতে ১৫২৬খ্রীঃ পর্যন্ত (৭৫ বৎসর) রাজত্ব করেন। সৈয়দ বংশের সুলতানগণ সমরখন্দের বশংবদরূপেই দিল্লী ও নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করেন। সৈয়দ বংশের রাজত্ব ছিল সীমাবদ্ধ। নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁহারা এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করার মত শক্তি বা অবসর তাঁহাদের ছিল না। লোদী বংশের সুলতান বাহলুল ৩৮ বৎসর, সেকন্দর ২৮ বৎসর এবং ইব্রাহিম ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে লোদী বংশের সুলতানগণ শক্তিমান শাসক হইলেও তাঁহারা তুঘলক যুগের অধিকৃত রাজ্যখণ্ড পুনরধিকার করিতে পারেন নাই। বাহলুল লোদী ছিলেন সর্বগুণান্বিত, সেকেন্দর লোদী ছিলেন ধর্মান্ধ, ইব্রাহিম লোদী ছিলেন বক্রদৃষ্টি। দক্ষিণ ভারতে বাহমনী ও বিজয়নগর, মধ্য-ভারতে রাজপুতানা, পূর্বভারতে বঙ্গদেশ ছিল স্বাধীন। ইব্রাহিম লোদীর সময়ে তৈমুরের বংশধর বাবর পাণিপথের যুদ্ধ জয় করিয়া উত্তর-ভারতে মুঘল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১ খ্রীঃ) *

সৈয়দ বংশ পরিচয়ঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান ছিলেন আরব গোষ্ঠীর সন্তান। দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিলেও তিনি নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। তৈমুরের চতুর্থ পুত্র, সমরখন্দের আমীর শাহরুখের প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রতিবৎসর সমরখন্দে কর প্রেরণ করিতেন। তিনি শুক্রবারের নমাজের পর খুৎবাতে সমরখন্দেব আমীরের নামে প্রশস্তি পাঠ করিতেন এবং তুঘলক সুলতানদের নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল রায়ত-ই-আলা (প্রধান প্রজা— শ্রেষ্ঠ প্রজা)।

খিজির খান : খিজির খানের সময়ে এটাওয়া, কাটেহার, কনৌজ, পাতিয়ালা, কম্পিলা, দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রতি বৎসর পার্শ্ববর্তী দেশ লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতেন। তাঁহার সময় গুজরাট ও জৌনপুরের সুলতানগণ দিল্লীর উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। খোক্কর প্রদেশের রাজা যশরথ পূর্ব-পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মেওয়াট এবং দোয়াব অঞ্চলের আমীরগণ দিল্লীকে কর প্রদান করিতে অস্বীকার করিল। ক্রমাগত যুদ্ধ ও বিদ্রোহ দমনের চেষ্টার পর খিজির ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর ছায়ায় শান্তিলাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র মুবারক খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে তৈমুর আক্রমণের ফলে সঞ্জাত সংকটময় মুহূর্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার মত যোগ্যতা খিজির খানের ছিল না।

মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রীঃ) : মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অরাজকতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্বকাল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীর দরবারে দুইজন হিন্দু আমীর অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। ইয়া-হিয়া-বিন আহম্মদ সরহিন্দি 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসে মুবারক শাহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যোৎসাহী মুবারক খান ষড়যন্ত্রকারীদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

মামুদ খান (১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রীঃ) : খিজির খানের পৌত্র মামুদ খান নিঃসন্তান মুবারক খান কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যারম্ভেই বুঝিতে পারিলেন, আমীরগণ রক্তলোলুপ, ক্ষমতাবিলাসী, স্বার্থান্বেষী ; প্রায় সকল আমীরই বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি বাহলুল লোদী (লাহোরের শাসনকর্তা) নামক একজন আমীরের সহায়তায় গুজরাটের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন। মামুদ খান সন্তুষ্ট হইয়া বাহলুল লোদীকে খান-ই-খানান উপাধি প্রদান করেন।

কিন্তু বাহলুল লোদী খোক্কর অধিপতি যশরথের উৎসাহে দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দিল্লী আক্রমণ করিয়া তিনি বিফল হইলেন। এই দুঃসময়ে ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ খান পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দীন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫১ খ্রীঃ) : মামুদ শাহের মৃত্যুর পরে আমীরগণ তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই উজীর হামিদ খানের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। আলম শাহ হামিদ খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। হামীদ খান বাহলুল লোদীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া আলম শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা

করেন। বাহলুল দিল্লী অধিকার করিলেন; কিন্তু হামিদ খানের ষড়যন্ত্রে বিরক্ত ও ভীত হইয়া আলম শাহ সমস্ত রাজ্য বাহলুলের হস্তে সমর্পণ করিয়া হামিদ খানের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আলাউদ্দীন বদাউনে প্রস্থানে করিয়া সাধারণ গৃহস্থের মত মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেখানে জীবন যাপন করেন।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) *

লোদীবংশ পরিচয়ঃ রক্তে আফঘান, গোষ্ঠীতে দিলজাই, লোদীবংশ ভারতের ইতিহাসে পাঠান নামে পরিচিত। ফিরুজ তুঘলকের সময়ে এই বংশের সন্তান মালিক বহরাম মূলতানে আগমন করিয়া মালিক মর্দান দৌলতের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। বাহলুল ছিলেন বহরামের পৌত্র—মালিক কালার পুত্র। মালিক কালা লোদী খোক্কররাজ যশরথের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং খিজির খানের সময়ে বাহলুলের পিতৃব্য সুলতান শাহ লোদী সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুলতান শাহের মৃত্যুর পর বাহলুল লোদী সরহিন্দ-এর কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার প্রভু মুহম্মদ শাহকে মালবের শাসনকর্তা মামুদ খলজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ বাহলুল লোদী খান-ই-খানান উপাধি লাভ করেন। আলাউদ্দীন আলম শাহ সৈয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার উজীর হামিদ খান বাহলুল লোদীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেন। ভয়ে আলাউদ্দীন আলম শাহ দিল্লী ত্যাগ করিয়া বদাউনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিনা যুদ্ধে বাহলুল লোদী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বাহলুল লোদী আলম শাহের প্রাক্তন মন্ত্রী হামিদ খানকে কৌশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আলম শাহকে বদাউন হইতে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন আলম শাহ কণ্টকময় দিল্লীর সিংহাসনের গৌরব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ, আলম শাহ বাহলুলের আমন্ত্রণের পশ্চাতে অভিসন্ধি সন্দেহ
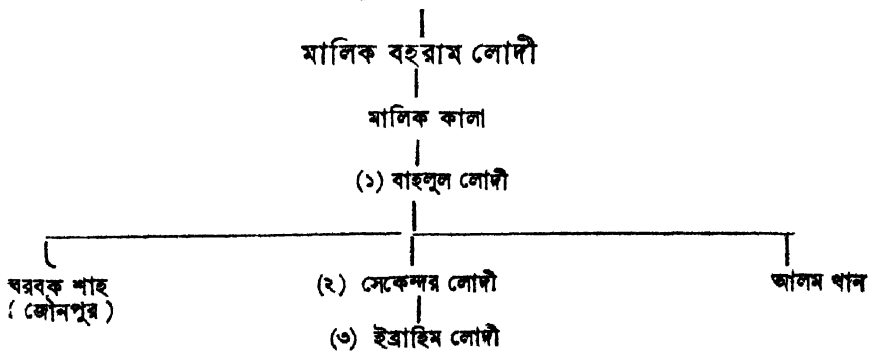
করিয়াছিলেন। আলম শাহ দিল্লী আগমনে অস্বীকার করায় বাহলুল লোদী বিনা যুদ্ধে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অন্যদিকে বাহলুল লোদী আলম শাহের নিকট হইতে "সিংহাসন-উত্তরাধিকারী" বলিয়া অভিনন্দন পত্র লাভে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বাহলুল লোদীর শাসন ঃ বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ বাহলুল লোদী আফঘান আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আফঘান জাতির স্বাধীন মনোভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আত্মীয় বন্ধুদের মনে ঈর্ষা সঞ্চার করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি চল্লিশ জন আফঘান আমীরের বসিবার উপযুক্ত একটি বিরাট আসন নির্মাণ করেন। আফঘানিস্থান হইতে দিলজাই গোষ্ঠীর আমীরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেককেই সুবৃহৎ জায়গিব এবং সামরিক সম্মান প্রদান করিলেন। দিল্লীর সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ দ্বারা একটি রক্ষা-কবচ সৃষ্টি করিলেন।

বিদ্রোহ দমন

বাহলুল লোদী প্রথম বৎসরেই দুর্ধর্ষ আহম্মদ খান মেওয়াটির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া রাজধানীর সমীপবর্তী সাতটি পরগণা দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয় বৎসরে অভিযান করিয়া সম্ভলের আমীর দরিয়া খানের নিকট হইতে সাতটি পরগণা দিল্লীর অধিকারভুক্ত করেন। যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা কো-ইল (বর্তমান আলিগড়)-এর ঈশা খান, সাকিতের মুবারক খান এবং মৈনপুরীর রাজা প্রতাপসিংহকে তাঁহাদের স্বল্প পরিসর রাজ্য মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রেওয়ারি, এটাওয়া, চন্দাবারের আমীরগণ দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিল। তিনি একই সময়ে মুলতান ও সরহিন্দের বিদ্রোহ দমন করিলেন। সাহস, ধৈর্য ও বুদ্ধিবলে দিল্লীর সুলতানের আধিপত্য তিনি সুদৃঢ় করিলেন।

আহম্মদ ইয়াদগার বলেন যে, বাহলুদ লোদী চিতোর জয় করিয়াছিলেন। বাহলুল লোদীর চিত্তোর জয়ের কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জৌনপুরের শার্কী সুলতান মামুদ শাহের মহিষী ছিলেন আলাউদ্দীন আলম শাহ সৈয়দের কন্যা। পিতার অবমাননা এবং বাহলুল লোদীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হইয়া মামুদ শাহ শার্কীর পত্নী দিল্লী আক্রমণে স্বামীকে প্ররোচিত করিলেন। মামুদ শাহ এক লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী এবং চৌদ্দশত হস্তী সমন্বিত একটি বাহিনীসহ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর আমীরগণ তাঁহার পক্ষে যোগ দিবেন। কিন্তু দিল্লীর আমীরগণ বাহলুল লোদীব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। সুতরাং মামুদ শাহ শার্কী বাহলুল লোদীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল বটে, কিন্তু মনের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না। ইতোমধ্যে অকস্মাৎ মামুদ শাহ শার্কীর মৃত্যু হইল। চারি বৎসর পর্যন্ত দুই

পক্ষের মধ্যে শান্তি অব্যাহত রহিল। তারপর হুসেন শাহ শার্কী দিল্লী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিবস ব্যাপী অমীমাংসিত যুদ্ধের পরে দিল্লী ও জৌনপুরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। গঙ্গানদীর জলধারা দ্বারা দুই রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হইল। বাহলুল লোদী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিলেন এবং জৌনপুর আক্রমণ করিলেন। সুদীর্ঘ যুদ্ধের পরে জৌনপুর দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। হুসেন শাহ শার্কী পরাজিত হইলেন এবং গোয়ালিয়রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহলুল লোদী তাঁহার পুত্র বরবক সাহকে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জৌনপুর বিজয় বাহলুল লোদীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। অচিরকাল মধ্যে কল্পী, ধোলপুর ও বড়হী বাহলুল লোদীর আধিপত্য স্বীকার করিল।

জৌনপুর কর্তৃক দিল্লী আক্রমণ

হুসেন শাহকে আশ্রয়প্রদানের শাস্তিস্বরূপ বাহলুল লোদী গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ আশী লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিয়া শান্তিস্থাপন করিলেন। গোয়ালিয়র হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষারম্ভে রোগাক্রান্ত হইয়া বাহলুল ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বাহলুলের মৃত্যু

বাহলুল লোদীর চরিত্র ও কৃতিত্ব : লোদী বংশ ছিল প্রকৃত আফঘান বা পাঠান। ফিরুজ তুঘলকের পরে ১৩৮৮ হইতে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিষষ্টি বৎসরের মধ্যে বাহলুলের মত সাহসী ও সফল সেনাপতি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ রূপ তাঁহার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। বাহলুল লোদী অতি ধীর পদবিক্ষেপে দিল্লীর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহলুল বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। প্রকৃত আফঘান জাতির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তিনি জানিতেন যে, আফঘান জাতি অত্যন্ত অভিমানী ও স্বাতন্ত্র্যবিলাসী। সেই অনুসারে তিনি চল্লিশ জন আমীরের বসিবার উপযোগী একটি আসন নির্মাণ করিয়া স্বগোষ্ঠীয় ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন করিয়াছিলেন।

বাহলুল লোদীর সুদীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর রাজত্বকাল এবং স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। ক্রমাগত যুদ্ধ সত্ত্বেও তিনি শাসন ব্যবস্থায় কয়েকটি নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

তৈমুরের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পরে হিন্দুস্থানের অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ফলে বহু জালমুদ্রা প্রচলিত হয়। বাহলুল লোদী মুদ্রা সংস্কার করেন। ফলে অচিরকাল মধ্যেই ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সহজ হইয়া উঠিল। বাহলুলী তঙ্কা মুঘল রাজত্বেও সগৌরবে প্রচলিত ছিল।

বাহলুল স্বয়ং সুশিক্ষিত না হইলেও তিনি বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বাহলুল শব্দের অর্থ—সর্বগুণান্বিত। বাস্তবিক পক্ষে সর্বগুণান্বিত না হইলেও তিনি ছিলেন বহুগুণান্বিত। তাঁহার বাহলুল নাম সার্থক।

সেকেন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ): বাহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র নিজাম খান 'সেকেন্দর শাহ্' উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। একদল আমীর তাঁহার বিরোধিতা করিল; কারণ সেকেন্দরের মাতা ছিলেন হিন্দু লৌহকার কন্যা। বিরোধী আমীরদল বাহলুল লোদীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জৌনপুরের সুলতান বরবক শাহের পক্ষপাতী ছিলেন। খান-ই-জাহানের চেষ্টায় সেকেন্দর লোদী শেষ পর্যন্ত দিল্লীর বহুবাঞ্ছিত সিংহাসন লাভ করিলেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

সেকেন্দর লোদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সমভাবে সন্ধি ও শান্তি নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে সেকেন্দর লোদী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা আলম খানকে এটাওযার জায়গির পদ প্রদান করিয়া শান্ত করিলেন। সিংহাসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পীর আমীর আজম হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া মুহম্মদ খান লোদীকে কল্পীর জায়গির প্রদান করেন। অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী তাতার খান লোদীকে পরাজিত করিয়াও তাঁহাকে জায়গির পদ হইতে বিচ্যুত করেন নাই। তারপর তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জৌনপুরের সুলতান বরবক শাহকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু জৌনপুরের সমস্তা ক্ষমত হস্তগত করিয়া বরবক শাহকে নামে মাত্র জৌনপুবেব সুলতান বলিয়া স্বীকার করিলেন। অল্পকাল মধ্যে বরবক শাহ্ পদচ্যুত হইলেন এবং সেকেন্দর লোদী স্বয়ং অনুষ্ঠানিকভাবে জৌনপুরের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

সেকেন্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুরের শাসন ভার গ্রহণ

দুই বৎসরের মধ্যে সেকেন্দর রাজ্যে বিদ্রোহ দমন এবং সুশৃঙ্খল শাসন প্রবর্তন করিলেন। তিনি স্বয়ং আফঘান আমীর গোষ্ঠিভুক্ত ছিলেন এবং আমীরদের সবলতা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি জানিতেন, আমীরগণের শক্তি ও সংঘ রাজ্যের বিশৃঙ্খলার মূল। তাঁহার পিতা বাহলুল লোদী ছিলেন তাঁহার অভিজ্ঞতার দর্পণ—সুতরাং তিনি আমীরদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং উচ্চ রাজকর্মচারীদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার অপরাধে তিনি অপরাধীর নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন এবং আত্মসাৎকারীকে রাজকোষের প্রাপ্য অর্থ প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিলেন। বাহলুল লোদী-নির্ধারিত রাজ দরবারে সুলতান ও আমীরবর্গের আসনসমতা তিনি বিলোপ করিলেন। প্রত্যেক আমীরের দরবারের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ

সেকেন্দর লোদীর শাসনব্যবস্থা

দিলেন। একদা জৌনপুরে পলো ক্রীড়ার ময়দানে কয়েকজন বিবদমান আমীর সুলতানের সম্মুখেই অভদ্রভাবে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল। সুলতান আমীরদের অশিষ্ট আচরণে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া আমীরদিগকে সর্বজন সম্মুখে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়াছিলেন। এই অসম্মানজনক ব্যবহারে বিরূপ হইয়া আমীরগণ সেকেন্দরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন এবং এবং তাঁহার ভ্রাতা ফতে খানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া সেকেন্দর বাইশ জন আমীরকে একসঙ্গে রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমীরদের বিষদন্ত নির্বিষ হইয়া গেল ।

পরিশেষে সুলতান সেকেন্দর লোদীকে আমীর, জায়গিরদার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এত ভয় করিতেন যে, সুলতানের ফারমান বা আদেশপত্রকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহারা তিন ক্রোশ পথ অগ্রসর হইতেন এবং রাজসুলভ মর্যাদা সহকারে উহা গ্রহণ করিতেন। সুলতানের ফারমান দরবারে পঠিত হইবার সময় প্রত্যেক আমীর দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতিটি বাক্য শ্রবণ করিতেন। সেকেন্দর লোদীর রাজাদর্শ ছিল বলবনের আদর্শের অনুরূপ।

হিন্দুশাস্ত্রে 'রাজা সহস্র চক্ষু'—সেকেন্দর লোদী হিন্দুর এই প্রবাদবাক্য সার্থক করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সহস্র গুপ্তচর ছিল এবং গুপ্তচরের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের ক্ষুদ্রতম সংবাদও জানিতে পারিতেন। প্রবাদবাক্য ছিল যে, দৈত্যদানব সেকেন্দর লোদীকে রাজ্যের গোপন সংবাদ নির্ভুলভাবে জানাইয়া দিত। মানুষ যে সংবাদ কল্পনা করিতে পারিত না, সেই সমস্ত সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হইত। বিচার ব্যাপারে মুসলিম আইন অনুসরণ করিলেও সেকেন্দর লোদী ন্যায়বিচার করিতেন। সুতরাং তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। শস্যের উপর শুল্ক রহিত হওয়ায় কৃষক ও বণিকগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সময় খাদ্য, বস্ত্র এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ ছিল।

সেকেন্দর শাহের গুপ্তচর বিভাগ

ফিরুজ তুঘলকের ন্যায় সেকেন্দর লোদীও ছিলেন হিন্দুমাতার সন্তান। সুতরাং হিন্দু জন্মের পাপস্খালনের জন্য হিন্দুর প্রতি তিনিও অমানুষিক কঠোর অত্যাচার করিয়াছিলেন। হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়া সেকেন্দর প্রমাণ করিলেন যে, তিনি হিন্দু নন। তাঁহার সময়ে থানেশ্বরের তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুর পুণ্যস্নান নিষিদ্ধ হইল, বহু স্থানে হিন্দুর মন্দির-বিগ্রহ ধ্বংস হইল এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর মসজিদ নির্মিত হইল। মথুরা, চন্দেরী, নগরকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দু তীর্থস্থান অপবিত্র করা হইল। বিখ্যাত জ্বালামুখী মন্দিরের বিগ্রহ বিচূর্ণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডগুলি কসাইদিগকে ওজনের বাটখারারূপে ব্যবহারের জন্য

সেকেন্দর লোদীর ধর্মনীতি

বিতরণ করা হইল। প্রয়াগে যমুনার পুণ্য সলিলে অবগাহন নিষিদ্ধ হইল। হিন্দু সন্ন্যাসী বুদ্ধন 'হিন্দু এবং ইসলাম—উভয় ধর্মই সত্য,' এই বাণী প্রচারের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের মত সেকেন্দর লোদীও আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত, প্ররোচিত এবং পুরস্কৃত করিতেন। সেকেন্দর লোদী মক্কা-যাত্রীদের সুবিধার জন্য একশতখানি নৌকা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সেকেন্দর লোদীর সামরিক অভিযান ঃ বরবক শাহকে পরাজিত করিয়া সেকেন্দর জৌনপুর অধিকার করেন। জৌনপুরের সীমানা তখন বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বিহার ছিল বাঙ্গলার অধীন। জৌনপুরের কতিপয় জায়গিরদার জৌনপুর ত্যাগ করিয়া হুসেন শাহ শার্কীর সঙ্গে বিহারে আগমন করেন। সেকেন্দব এইসব জায়গিরদারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অচিরকাল মধ্যে তিনি বিহার প্রান্তকে দিল্লীর সুলতানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ত্রিহুতের রাজাকে কর দানে বাধ্য করেন।

লোদী সাম্রাজ্যের সীমা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে বাঙ্গলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সেকেন্দর লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

সেকেন্দর লোদী ও বঙ্গদেশ

এই অভিযানের নেতা ছিলেন মুহম্মদ খান লোদী এবং মুবারক খান লোহানী। বুদ্ধিমান সেকেন্দর লোদী যুদ্ধ না করিয়া আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সহিত সন্ধি করেন। শর্ত হইল—কেহ কাহারও রাজ্যসীমায় অনধিকার প্রবেশ করিবেন না এবং বাঙ্গলার সুলতান দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে আশ্রয় প্রদান করিবেন না। গোয়ালিয়র, মালব ও ধোলপুর বিজয় সেকেন্দর লোদীর স্বপ্ন ছিল। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধোলপুরের রাজা বিনায়ক দেবকে পরাজিত করেন। তারপর গোয়ালিয়ররাজ মানসিংহের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান

সেকেন্দর লোদী ও রাজপুতানা

প্রেরণ করেন। রাজপুতানাকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী হইতে রাজপুতনার পার্শ্ববর্তী উগ্রসেনপুরে রাজধানী পরিবর্তন করেন এবং এই নগরীর নূতন নাম-করণ করিলেন আগ্রা। আগ্রা হইতে বারংবার অভিযান করিয়া তিনি রাজ-পুতানার কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। তাঁহার মালব ও গোয়ালিয়র

সেকেন্দর লোদীর মৃত্যু

বিজয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল ; মালব অভিযানই তাঁহার জীবনের সর্বশেষ অভিযান। ক্রমাগত অভিযানের পরিশ্রম এবং ব্যর্থতা তাঁহার শরীর ও মনের উপর যথেষ্ট আঘাত করিয়াছিল। মালব অভিযানের সময় তিনি পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভগ্নচিত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

সেকেন্দর লোদীর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ সেকেন্দর লোদী ছিলেন পাঠান পিতা এবং হিন্দু মাতার সন্তান। তাঁহার মুখমণ্ডলে ছিল হিন্দু মাতার

কমনীয়তা, সর্বদেহে ছিল পাঠান পিতার অঙ্গসৌষ্ঠব। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, সুঠাম গঠন, উজ্জ্বল বর্ণ, দীপ্ত চক্ষু সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। আচার-ব্যবহারে এবং দৈনন্দিন জীবনে সেকেন্দর লোদী রাজরক্তের পরিচয় দিতেন। শৈশব হইতেই তিনি সুশিক্ষিত, সুসাহিত্যিক এবং কাব্যরসিক ছিলেন। 'গুল-রুখ্' বা লাল ফুল—এই ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখিতেন। পিতার নিকট হইতে তিনি যুদ্ধনীতি, রাজনীতি এবং কূটনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দিল্লীর ক্ষীয়মাণ রাজশক্তিকে সেকেন্দর শাহ্ নূতন মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবিলাসী পাঠান আমীরদিগকে তিনি কঠোর হস্তে বশংবদ করিয়াছিলেন। বলবন এবং আলাউদ্দীন খলজীর অনুরূপ তিনি রাজপদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন এবং ফিরুজ তুঘলকের মত তিনি হিন্দুদিগকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খলজীর অনুকরণে সমগ্র ভারতবর্ষ বিজয়ের স্বপ্ন তিনি দেখেন নাই, কারণ তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। অবশ্য তিনি উত্তর ভারতে বহু জনপদ জয় করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে বিধর্মীর সহিত মৈত্রিস্থাপন করিয়াও আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মন্ত্রগুপ্তি ছিল তাঁহার কূটনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাজ্যশাসনের প্রারম্ভেই সেকেন্দর শাহ্ আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু ধারণার জন্য হিসাব-বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি রাজকীয় দলিলপত্র ফার্সী ভাষায় লিখিবার আদেশ দেন; ফলে রাজকার্যে নিযুক্তি অভিলাসী হিন্দুগণ ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আহম্মদ ইয়াদগার লিখিয়াছেন,—সেকেন্দর শাহ্ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। মুসলিমের জন্য দানব্যবস্থা ছিল তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। মহরম, ঈদ, শব-ই-বরাত, মুহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু-দিবস প্রভৃতি উৎসবের দিনে রাজকোষ হইতে নগদ মুদ্রা ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইত। উলামাদিগকে যথেষ্ট বৃত্তি এবং ওয়াকাফ দান করা হইত। মুসলমান বিধবা ও কুমারীকন্যার বিবাহের জন্য তিনি রাজকোষ হইতে নিয়মিতভাবে অর্থ প্রদান করিতেন। হিন্দুদিগের উপর সেকেন্দর শাহ্ অনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাচার করিয়া ইসলাম-প্রীতির প্রমাণ দিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ পড়িতেন এবং ইসলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিনিষেধ অনুসরণ করিতেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেও তিনি গোপনে মদ্যপান করিতেন, শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতেন এবং সংগীত উপভোগ করিতেন।

সেকেন্দর শাহ্ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজেও ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার আদেশে একখানি সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয় এবং ঐ পুস্তকের নাম হইল 'ফার ই হাঙগ্-ই সেকেন্দরী'।

সেকেন্দর লোদী রাজকার্যে সমসাময়িক মুসলিম সুলতানদের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমান সেকেন্দর সুবৃহৎ ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করিয়া নিজের

ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন করেন নাই। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাস্তববুদ্ধি ছিল তাঁহার প্রধান গুণ; মুসলিম প্রজার কল্যাণ কামনা ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রীঃ): ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী বিনা রক্তপাতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই দিল্লীর শেষ লোদী সুলতান। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পিতার অসমাপ্ত কার্য গোয়ালিয়র বিজয়। গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিৎ দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ইব্রাহিম লোদী মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ ত্রিশ সহস্র মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বের আরম্ভে আমীরদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পুনরায় প্রকটিত হইল। ইব্রাহিম লোদী তাঁহার পিতৃব্য জালাল খানের সহিত সাম্রাজ্য বিভাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যের দুই বিভাগ পরবর্তিকালে ইব্রাহিমের পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। জালাল খান অচিরকাল মধ্যে ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন।

জালাল খানের বিদ্রোহের সময়ে ইব্রাহিম দেখিয়াছিলেন যে, আমীরগণ সর্বক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য নহেন। সুযোগ পাইলেই তাঁহারা ষড়যন্ত্র করেন, বিদ্রোহ করেন; সুতরাং তিনি আমীরদিগের সহিত অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন; এমন কি তিনি তাঁহাদিগের সহিত নিম্নপদস্থ কর্মচারীর অনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক আমীর রাজদরবারে বক্ষোপরি বিপরীতভাবে হস্ত নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। যে সমস্ত আফঘান আমীর একদা বাহলুল লোদীর সহিত সমাসনে উপবেশন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের নিকট এই ব্যবস্থা অপমানজনক বোধ হইল। অচিরকাল মধ্যে আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইব্রাহিম লোদী কয়েকজন আমীরকে কারারুদ্ধ করিলেন। রাজদরবার এবং আমীরগণ দুই-ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ফলে আমীর এবং সুলতানের মধ্যে ভীষণ মতান্তর আরম্ভ হইল, পরিশেষে এই মতান্তর যুদ্ধে পরিণত হইল। নররক্তে রাজধানীর রাজপথ প্লাবিত হইল। শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম লোদী জয়লাভ করিলেন।

ইব্রাহিম লোদী ও আমীরদের মধ্যে মনোমালিন্য

এইখানেই বিরোধের পরিসমাপ্তি হইল না। ইব্রাহিম লোদী সামান্যমাত্র সন্দেহে আমীরদিগকে জায়গিরচ্যুত করিলেন, কাহাকেও পথিমধ্যে বেত্রাঘাত করিলেন, কাহাকেও বা কারারুদ্ধ করিলেন; ইহাতে রাজ্যমধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হইল।

পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ভীত ও তিক্ত হইয়া কাবুলের আমীর বাবরকে হিন্দুস্থান আক্রমণ ও ইব্রাহিম লোদীকে উচ্ছেদ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। দৌলত খান লোদী জানিতেন যে, ভারতের প্রতি

বাবরের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল এবং ইহার পূর্বেও বাবর ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছেন। বাবর স্বচ্ছন্দচিত্তে দৌলত খান লোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। অন্যদিকে ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবেন—এই আশায় বাবরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। রাজপুতানায় মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ মুসলমানের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে পুনরায় হিন্দুস্থানে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশায় বাবরের হিন্দুস্থান আক্রমণের বিরোধিতা করেন নাই। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পরে লোদী বংশের অবসান হইল। ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকাল ভারতেব মুসলিম ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণ-যবনিকা।

বাবরের হিন্দুস্থান আক্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ

বাবরের দিল্লীর সিংহাসন অধিকার

মুসলিমদের ভারত বিজয়ের স্বরূপঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩২০ বৎসরকাল দিল্লীর সিংহাসনে তুর্ক-আফঘান জাতি রাজত্ব করিয়াছিল। মুহম্মদ বিন কাসিমের ভারত বিজয়ের পশ্চাতে ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলাম সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। সুলতান মামুদ গজনীর ভারত আক্রমণের পশ্চাতে ছিল ব্যক্তিগত সামরিক যশের আকাঙ্ক্ষা, লুণ্ঠন-লালসা, পিতৃশত্রু জয়পালের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং পরোক্ষ আবেদন ছিল হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস; প্রত্যক্ষ রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। মুহম্মদ ঘুরী গজনীর উত্তরাধিকারিরূপে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যজয় করিয়াছিলেন। ঘুরীর সময়ে ভারতবর্ষ বহির্ভারতীয় মুসলিম রাজ্যের অংশরূপে শাসিত হইতেছিল। কুতুবউদ্দীনের সময় হইতে ভারতীয় মুসলিম রাজ্য ঘুররাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভারতের পূর্বভাগে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু পশ্চিম-ভারত বিজেতা মুহম্মদ ঘুরী এবং পূর্ব-ভারত বিজেতা ইবন বখ্‌তিয়ার খলজী স্বধর্মী মুসলিমের হস্তে একই বৎসরে নিহত হইয়াছিলেন। এই দুইটি হত্যাই ভারতে মুসলিম রাজ্যের নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎ এবং অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত। তুর্ক-আফঘান যুগে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, নরহত্যা, তুর্ক-আফঘান রাজত্বকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়াছে। তুর্ক-আফঘান রাজত্বের পতনের মূল কারণ এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সিংহাসনের পথ রক্তপিচ্ছিল, রাজার কোন বান্ধব নাই, রাজা নির্বান্ধব।

ইসলামের আদর্শকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া লুণ্ঠনাকাঙ্ক্ষী তুর্ক-আফঘান জাতিগুলি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন। ধর্মের আবরণ ছিল নবদীক্ষিত তুর্ক-

আফঘান জাতিকে উদ্বোধিত করিবার উপায় মাত্র। রাজ্যজয়ে অনেক সময় ধর্মের নামে মুসলিম গোষ্ঠিগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পরে ধর্মের আবেদন শিথিল হইয়া পড়িত। আরব জাতি যদি ভারতবর্ষ জয় করিত তাহা হইলে হয়ত মিশর, পারস্য অথবা আফঘানিস্থানের মত সমস্ত ভারতবর্ষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে তুর্ক-আফঘানগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, তখন ইসলামের কেন্দ্রশক্তি খিলাফৎ ছিল লুপ্ত। আরবজাতি বিজিত দেশের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিলোপ করিয়া দিত, তুর্ক-আফঘানগণ তাহা করে নাই। তুর্ক-আফঘান ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। ভারতবর্ষের বিজিত জাতিগুলির সহিত তুর্ক-আফঘান জাতি অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিয়াছিল। এই সামঞ্জস্যই ভারতে প্রাথমিক মুসলিম বিজয়ের স্বরূপ।

ভারতবর্ষ ছিল সুবিশাল দেশ। নদী, পর্বত, বনানী, মরুভূমি দ্বারা বিভক্ত। সংবাদ আদান-প্রদান ছিল কষ্টসাধ্য। ভারতবর্ষ বিজিতও হইয়াছিল খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের উপরে যুগপৎ ইসলাম ধর্ম এবং জীবনধারা প্রভাব বিস্তার করে নাই।

তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ: ভারতবর্ষে বিজেতা মুসলমান ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ—বিজিত হিন্দু ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রধানত ইহা ছিল মুসলিমদের পক্ষে বিরাট সমস্যা। আলাউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলক ভিন্ন কোন তুর্ক-আফঘান সুলতান সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন নাই।

(১) হিন্দুর অনমনীয় মনোভাব

হিন্দুগণ বিনা বাধায় অবনত মস্তকে মুসলমানের শাসন স্বীকার করে নাই। প্রায় প্রতি বৎসরই দেশের কোন না কোন অঞ্চলে পরাজিত হিন্দু বিদ্রোহ করিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে, হয়ত বা বিজিত হইয়াছে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত হইলেই তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে—যুদ্ধ করিয়াছে, হয়ত বা রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। মুসলিমগণ নীতিগতভাবে হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে—দেবতার বিগ্রহ বিচূর্ণ করিয়াছে, অপমানজনক জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছে, ইহাতে হিন্দুর মন আহত হইয়াছে। হয়ত তাহারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিতে পরে নাই কিন্তু মন ক্ষুব্ধ হইয়া ছিল। একদিকে

(২) সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব

মুসলিমদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ, অন্যদিকে হিন্দুর অনমনীয় মনোভাব এবং হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা তুর্ক-আফঘান রাজশক্তিকে ক্ষীয়মাণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বারংবার বহিরাগত মোঙ্গলদিগের আক্রমণ, বিশেষ করিয়া প্রথম দেড়শত বৎসর, তুর্ক রাজশক্তিকে ক্ষীণবল করিয়া দিয়াছিল। এই মোঙ্গলদিগকে

তুর্ক-আফঘান সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবন যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করিয়াছিলেন, ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে রাজধানীর উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দিয়াছেন; আলাউদ্দীন খলজী দিল্লীর প্রান্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে নও মুসলিম হত্যা করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়া বিতাড়িত করিয়াছেন, মুহম্মদ তুঘলক মোঙ্গল আক্রমণকারিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়াছেন; ফিরুজ তুঘলক মোঙ্গলদিগকে দাসরূপে ক্রয় করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত মোঙ্গল বীর তৈমুর তুর্ক-আফঘান রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, দিল্লীর সিংহাসনের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। তৈমুরের আঘাত তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

(৩) মোঙ্গল আক্রমণ

(৪) ফিরুজের দাস-বিলাস

দুর্ভাগ্যের বিষয় তুর্ক বা আফঘান কোন রাজবংশেই মুহম্মদ তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলক ব্যতীত দুইজন শক্তিশালী সম্রাট ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন নাই। তাঁহাবা কোন সুনির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং কোন একটি শাসনধারাও কোন রাজবংশের আদ্যন্ত অব্যাহত থাকে নাই। তুর্ক-আফঘানগণ রাজ্য জয় করিয়াছে, বিদ্রোহ দমন করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে, কিন্তু স্থায়ী শাসনসংস্থা স্থাপন করিবার মত দূরদৃষ্টি, অভিলাষ বা অবসর তাহাদের ছিল না। অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরোধ, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, হিন্দুর উপব অত্যাচার ও অপমান—এই সমস্ত ব্যাপার লইয়াই তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। ভারতবর্ষে ধর্মান্তরিত হিন্দুদিগকে তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ সৈন্যবিভাগে প্রবেশের অধিকার দান করেন নাই, সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা বিশেষ কোন সম্মানজনক স্থান রাজ্যমধ্যে তাহারা লাভ করে নাই। বহিরাগত মুসলিম জাতিগুলি ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, সুতরাং ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সাম্রাজ্য গঠন তুর্ক-আফঘান যুগে সম্ভব হয় নাই। তুর্ক-আফঘান যুগের অন্তভাগে নূতন কোন বহিরাগত সামরিক মুসলিম গোষ্ঠী ভারতে আগমন করিয়া রাজকীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে নাই। প্রথম যুগে আগত তুর্ক-আফঘাম সামরিক জাতিগুলি দীর্ঘকাল ভারতীয় মৃদু জলবায়ু এবং সহজ ও বিলাসময় জীবনযাত্রার প্রভাবে ক্ষীয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

(৫) সুনির্দিষ্ট শাসন প্রণালীর অভাব

(৬) ধর্মান্তরিত হিন্দুর বিরুদ্ধে উন্মা

(৭) ভারতের মৃদু জলবায়ুর প্রভাব

তুর্ক-আফঘান জাতির গোষ্ঠীয় মনোভাব, স্বাতন্ত্র্য বিলাস, হিংস্র স্বভাব, ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিভিন্ন রাজবংশকে পঙ্কিল করিয়া রাখিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ করিতে হইলে আলাউদ্দীন খলজী, ফিরুজ তুঘলক এবং সেকেন্দর লোদীর হিন্দু বিদ্বেষ নীতি, মুহম্মদ তুঘলকের সর্বকার্যে বিফলতা, ফিরুজ তুঘলকের

তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্যের পতনের পরোক্ষ কারণ

দাসপ্রথা ও জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন তুর্ক-আফঘান স্থলতানীর পতনের পরোক্ষ কারণ।

প্রাদেশিক রাজ্যেব অভ্যুত্থান, রাজপুত জাতির পুনরুত্থান, দক্ষিণে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের অভ্যুদয়, বারংবার মোজল আক্রমণ ও তৈমূরের অভিযান এবং সর্বশেষে বাবরের পাণিপথ-বিজয় তুর্ক-আফগান স্থলতানীর পতনেব প্রত্যক্ষ কারণ

প্রত্যক্ষ কারণ

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে বাহলুল লোদী অথবা সেকেন্দর লোদীর চরিত্র আলেচনা কর। ভারতে লোদী বংশের শাসনের ফলাফল আলোচনা কর।

(Sketch the career of Bahalul Lodi or of Sakandar Lodi. What were the achievements of Lodi rule in India ?)

২। ভারতবর্ষে মুসলিম বিজযেব স্বরূপ কি? তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

(What were the chief features of Muslim conquest of India ? What were the reasons of the fall of the Turko-Afghan empire ?)

৩। বাবরের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

(Describe the political condition of India on the eve of Babur's conquest.)

পঞ্চম অধ্যায়

দিল্লী সুলতানীর পতনের যুগে ভারতের প্রাদেশিক রাজ্য

অধ্যায় পরিচয়ঃ ভারতের তুর্ক-আফঘান রাজত্বের দুইটি ধারা। একদিকে রাজ্য জয় ও রাজ্যের প্রসারণ; অন্যদিকে রাজ্য ক্ষয় ও রাজ্যের সংকোচন। তৈমুরের আক্রমণের পর একশত পঁচিশ বৎসর কাল তুর্ক-আফঘান সুলতানদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সীমার বাহিরে মেবার প্রমুখ রাজপুত রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর, পশ্চিম ভারতে পঞ্জাব, সরহিন্দে লোদী-আফঘান রাজ্য, পূর্ব ভারতে বঙ্গদেশে পাঠান কররাণী বংশ, মধ্যভারতে মালবের লোদী-আফঘান, গুজরাটে মুহম্মদ শাহী বংশ, কাশ্মীরে শাহ মির্জা বংশ, উড়িষ্যায় গঙ্গ বংশ, আসামে আহোম রাজগণ এবং দাক্ষিণাত্যে বাহমনী বংশ তাহাদের শাসন সুসংবদ্ধ করিয়াছিল। মুঘল আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে আফঘান রাজত্ব ছিল শিথিল —হিন্দুস্থান ছিল বিচ্ছিন্ন। হিন্দু-মুসলমান কোন রাজ্যই দিল্লীর বশংবদ ছিল না। মুসলমান বিজয়ের প্রাথমিক যুগে ধর্মের উন্মাদনা পরবর্তী যুগের মুসলিমদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।

এই যুগের উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বঙ্গদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, জৌনপুর, কাশ্মীর, গুজরাট, মালব, মেবার, মাড়ওয়ার, অম্বর উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে খান্দেশ, বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য প্রধান। সমগ্র ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বঙ্গদেশ, বিজয়নগর ও বাহমনী সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গলা দেশ

মুহম্মদ ঘুরীর দিল্লী বিজয়ের দুই বৎসরের মধ্যে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন দুর্ধর্ষ তুর্কী সৈনিক দিল্লীতে আগমন করেন। তাঁহার নাম **ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী।** তাঁহার জন্মস্থান ছিল পারস্যের সীমান্তবর্তী গরমসির অঞ্চলে। ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন চুনারের নিকটবর্তী ভাগবত্‌ ও ভূইলি নামক দুইটি স্থানের জায়গিরদারের পদ লাভ করেন। তথা হইতে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন স্বাধীনভাবে হিন্দু জনপদ লুণ্ঠন করিতে করিতে বর্তমান বিহার শরিফে উপস্থিত হন এবং বৌদ্ধ বিহারকে দুর্গ মনে করিয়া ঐগুলি আক্রমণ করেন। তিনি নালন্দা ওদন্তপুরের বৌদ্ধ বিহার ও গ্রন্থাগার ধ্বংস করেন এবং অপরিমিত ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। ওদন্তপুর হইতে

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন খলজীর নদীয়া বিজয়

তিনি গঙ্গা অতিক্রম করিয়া সতর জন অনুচরসহ অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশে নদীয়া নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। তাঁহার মূল সেনাবাহিনী পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছিল। মুসলিম ইতিহাসকার ইসামী বলেন, বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন বা রায় লখ্‌মনিয়া অশ্ব পর্যবেক্ষণের জন্য নগরের বহির্দেশে সামান্য কয়েকজন দেহরক্ষী সহ উপস্থিত হইলেন। অতর্কিতে বৃদ্ধ রাজাকে আক্রমণ করিয়া ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সেই অবসরে পশ্চাদ্‌গামী তুর্কী সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নগর জয় করে। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন দিনাজপুরের নিকটে দেবকোটে সেনাবাস বা রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিহাসকার মিনহাজ বলেন, ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন অষ্টাদশ অশ্বারোহী সহ নদীয়া বিজয় করেন। এই কাহিনীর সহিত ইসামীর উক্তির সামঞ্জস্য নাই।

বাঙ্গলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন তিব্বতের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। জীবনে এই তাঁর প্রথম পরাজয়।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের তিব্বত অভিযান

পথশ্রমে, সৈন্যক্ষয়ে ও পরাজয়ের গ্লানিতে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দেবকোটের শিবিরে শয্যাশায়ী হন। তাঁহার অনুচর আলী মর্দান খান রোগশয্যায় প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়া নিরস্ত্র প্রভুর বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন (১২০৬ খ্রীঃ)।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন স্বাধীনভাবে বাঙ্গলার রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চল জয় করিলেও দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন বাঙ্গলা দেশকে দিল্লীর অধীন বলিয়া মনে করিতেন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দীনের আদেশে **আলী মর্দান খলজী** বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করেন। দিল্লী হইতে বাঙ্গলার দূরত্ব, মশক ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, খরস্রোতা নদনদী ও বাঙ্গলার হস্তী-বাহিনীর জন্য দিল্লীর সুলতানদিগের পক্ষে সেই যুগে বাঙ্গলা দেশের উপর

পরবর্তী শাসকগণ

প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব করা কষ্টসাধ্য ছিল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গলার শাসকগণ স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেন। ক্রমাগত বিদ্রোহের জন্য মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গলাকে 'বুঘলকপুর' বা বিদ্রোহের দেশ বলিয়া নিন্দা করিতেন। ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় বাঙ্গলার মালিক **তুঘ্রিল বেগ** স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বলবন তিন বৎসর চেষ্টা করিয়া তুঘ্রিলকে নিহত করেন এবং স্বীয় পুত্র **বুঘরা খানকে** বাঙ্গলার জাবিতান বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

খলজী রাজত্বকালে বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল না। ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাঙ্গলার মালিক **ঘিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহকে** পরাজিত করেন। তিনি বাঙ্গলায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা হ্রাস করিবার জন্য বাঙ্গলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—লখ্‌নৌতি, সোনার গাঁ ও সপ্তগ্রাম।

তিনি প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন মালিক বা শাসক নিযুক্ত করেন। তুঘলক বংশের অধঃপতনের যুগে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফকরউদ্দীন মুবারক নামে একজন আফঘান সৈন্যাধ্যক্ষ সোনার গাঁয়ে এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ লখ্‌নৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ ভাগে দিল্লীর দরবার হইতে ইলিয়াস নামে সম্রাটের একজন বিরাগভাজন আমীর বাঙ্গলা দেশে আলাউদ্দীন আলী শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আশ্রয়দাতা আলী শাহকে হত্যা করিয়া বাঙ্গলায় দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক বঙ্গ বিজয় পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর অধীনতা মুক্ত ছিল। এই ২৩১ বৎসর কালের মধ্যে ইলিয়াস শাহী বংশ, রাজা গণেশের বংশ, হুসেন শাহী বংশ এবং কররাণী বংশ বাঙ্গলা দেশ শাসন করে। ইলিয়াস শাহ (১৩৪৫-১৩৫৭ খ্রীঃ) বারাণসী পর্যন্ত ভূখণ্ডের উপর বাঙ্গলার ক্ষমতা বিস্তার করেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ফিরুজ তুঘলক বহু চেষ্টা করিয়াও ইলিয়াস শাহের একডালা দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। ইলিয়াসের পুত্র **সুলতান সেকেন্দর** বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাণ্ডুয়া নগরে চারি শত গম্বুজ শোভিত বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে আদিনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়া আদিনা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি আছে, সেকেন্দর শাহের পুত্র **ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহ** পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এই বংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুলতান। তাঁহার সময় চীনের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের দূত বিনিময় হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের ছয় বার দূত বিনিময় হইয়াছিল। এই সমস্ত দূত চীনা ভাষায় বাঙ্গলার সম্পদের চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহাদের মধ্যে মা হুয়ান এবং ফেসিঙ-এর বিবরণে বাঙ্গলা দেশের সমাজ, ধর্ম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য জানা যায়।

ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর ইলিয়াস শাহী বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই অবসরে দিনাজপুরের অন্তর্গত ভাতুরিয়ার অর্থশালী ব্রাহ্মণ জমিদার **রাজা গণেশ** বাঙ্গলা দেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেন (১৪১০-১৪১৮ খ্রীঃ)। অনেকের মতে রাজা গণেশই বিখ্যাত **দনুজমর্দন দেব**। দনুজমর্দনের ১৪১৭-১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে গণেশী বংশের তিনজন শাসক আনুমানিক ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

জনশ্রুতি আছে, রাজা গণেশ বা গণেশের পুত্র **যদু** বা **জয়মল** (১৪১৪—১৪৩১ খ্রীঃ) আজম শাহের কন্যা ফুলজানি বা আসমানতারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে অনেকেই ইহা অমূলক বলিয়া মনে

করেন। যদু রাজ্য রক্ষার জন্য পিতার নির্দেশক্রমে পিতার জীবদ্দশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যদুর নাম হইল **জালালউদ্দীন**। কথিত আছে, তিনি পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যদুকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন; ফলে যদু ভীষণ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া পড়েন। জালালউদ্দীন বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন। তিনি এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে পাণ্ডুয়া নগরে বিখ্যাত একলাখী মসজিদ নির্মাণ করেন। কাহারও মতে, রাজা গণেশ কর্তৃক নির্মিত একলক্ষী মন্দিরকে জালালউদ্দীন একলাখী মসজিদে পরিণত করেন। জালাল-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **শামসউদ্দীন আহম্মদ শাহ** ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (মতান্তরে ১৪৪২ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে রাজ্যে বিশৃঙ্খলার ফলে ইলিয়াস শাহী বংশ পুনরায় বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ দিকে বাঙ্গলা দেশে ক্রীতদাসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত কয়েকজন হাব্‌সী ক্রীতদাস বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিল।

রাজা গণেশের উত্তরাধিকারিগণ

চার জন হাবসী সুলতান ১৪৮৬ হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসর বাঙ্গলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। হাবসীদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং শেষ হাবসী সুলতান সিদি বদরকে হত্যা করিয়া তাহারা সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহকে বাঙ্গলার সুলতান নির্বাচিত করে।

হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ): হুসেন শাহ বিচক্ষণ যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক, বিদ্যানুরাগী, পরধর্মসহিষ্ণু ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কামরূপ (আসাম), কামতাপুর (রংপুর ও কোচবিহার) এবং উড়িষ্যার একাংশ জয় করেন। বিহার প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও মনীষা বিশেষ বিকাশ লাভ করে। তাঁহার সময়ে, বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী বিজয় গুপ্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের বিপ্রদাস মনসার কাহিনী অবলম্বন করিয়া পৃথক দুইখানি মনসামঙ্গল রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিখ্যাত প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হুসেন শাহের সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়ের বিখ্যাত দুইটি সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। বাঙ্গলার বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ তাঁহারই কীর্তি। তিনি প্রতি বৎসর পদব্রজে স্থানীয় মুসলিম তীর্থ ও পীরের কবর দর্শন করিতেন। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হইলেও রাজ্যের কর্মচারী নিয়োগে তিনি যোগ্যতার মর্যাদা দিতেন। হুগলীর গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খান) ছিলেন হুসেন শাহের প্রধান উজীর, গৌর মল্লিক ছিলেন অন্যতম সেনাপতি, রামকেলির (মালদহ নিবাসী) রূপ ও সনাতন গোস্বামী নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন ব্যক্তিগত কর্মচারী (দবির-ই-খাস ও সাকর মল্লিক), মুকুন্দ দাস

হুসেন শাহ

ছিলেন প্রধান চিকিৎসক, অনুশ ছিলেন মুদ্রাশালার প্রধান কর্মচারী। হুসেন শাহের সময় হিন্দুরা মোল্লা ও কাজীর অত্যাচার হইতে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারতের ভূমিকায় হুসেন শাহকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হুসেন শাহী রাজত্ব বাঙ্গলার মুসলিম ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ।

নসরৎ শাহ (১৫১৮-১৫৩৩ খ্রীঃ): হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ বিনা রক্তপাতে বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রিহুত জয় করিয়া মুঘলবীর বাবরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি পিতার ন্যায় শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।* তাঁহার সময় কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কিয়দংশ রচনা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ ও অন্যান্য কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়। হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান **ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ** শের খান কর্তৃক ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইলে বাঙ্গলায় শূর বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীতে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শূর বংশের অবসান হয়, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে শূর বংশ আরও নয় বৎসর অর্থাৎ ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল।

বিজয়নগর (১৩৩৬-১৫৬৫ খ্রীঃ)

বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা: বিজয়নগর ছিল প্রথম হয়সাল বংশীয় তৃতীয় বল্লাল কর্তৃক স্থাপিত একটি দুর্গ। বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সঙ্গমের দুই পুত্র হরিহর এবং বুক্কা। সঙ্গম বংশীয় আটজন নরপতি ১২৯ বৎসর (১৩৩৬-১৪৬৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। হরিহরের রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা নদী হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী এবং পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বুক্কার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর কাঞ্চী, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি নগরী জয় করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। সমসাময়িক

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য

বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দেব রায় (১৪২৫-১৪৪৭ খ্রীঃ) সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বাহমনী সুলতান আহম্মদ শাহের হস্তে পরাজিত হন। সে দিন ছিল হোলির উৎসব। আহম্মদ শাহ বিজয়নগরের ষাট হাজার হিন্দু নর-নারীর রক্তে তিন দিবসব্যাপী 'হত্যার হোলি' উৎসব অনুষ্ঠান করেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের সময় বিজয়নগর রাজ্য সিংহল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময় ইতালির নিকলো কন্তি ও সমরখন্দের তৈমুরলঙের পুত্র আমীর শাহরুখের দূত আবদুর রেজ্জাক বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করেন।

শালুব বংশ (১৪৮৬-১৫০৫ খ্রীঃ) **ঃ** সঙ্গম বংশের সর্বশেষ নরপতি দ্বিতীয় বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী নরসিংহ শালুব বিজয়নগরে শালুব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নরসিংহের নাম অনুসারে পর্তুগীজগণ বিজয়নগরকে নরসিংহ গাঁও নামে অভিহিত করিত।

তুলুব বংশ (১৫০৫-১৫৭০ খ্রীঃ) **ঃ** বিজয়নগরের তুলুব বংশীয় মন্ত্রী নরস নায়কের পুত্র বীর নরসিংহ শালুব বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া (১৫০৫ খ্রীঃ) বিজয়নগরে তুলুব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯ খ্রীঃ)। তিনি পর্তুগীজ আলবুকার্ককে ভাতকলে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বর্তমান মাদ্রাজ হইতে মহীশূর পর্যন্ত ভূখণ্ডে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক পাএস কৃষ্ণদেব রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণদেব রায় বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী ও উদার ছিলেন। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্র ঃ দাক্ষিণাত্যের রাজন্য-বর্গের মধ্যে কৃষ্ণদেব রায় চিরস্মরণীয়। যুদ্ধে অজেয়, শান্তিতে মানবহিতৈষী, ধর্মে যথার্থ বৈষ্ণব, পরমত সহিষ্ণু, পরাজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীল, বৈদেশিক পর্যটক ও রাজ-দূতের নিকট অতিথিবৎসল। বিগ্রহ, মন্দির ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে অপরিমিত দান কৃষ্ণদেব রায়কে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার দীর্ঘদেহ, সুগঠিত অবয়ব, বিনয়-নম্র সদা-প্রশান্ত মূর্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, দেশী-বিদেশী সকল দর্শককে মুগ্ধ করিত। তিনি সর্বদা শ্বেতবাস পরিধান করিতেন। তাঁহার শ্বেত বস্ত্রাবৃত দেহ ছিল শান্তির প্রতীক।

সদাশিব রায় ঃ কৃষ্ণদেব রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায়ের রাজত্বকালে তাঁহার মন্ত্রী রাম রায় ছিলেন সর্বাধিনায়ক। রাম রায় ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর

ও গোলকুণ্ডার সহযোগে আহম্মদনগর বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানগণ একযোগে আড়াই লক্ষ সৈন্যসহ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর আক্রমণ করেন। বিজাপুরের অদূরে তালিকোটে দুই সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতান পরাজিত হন। এই জয়ের মুহূর্তে হঠাৎ একটি হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া রাম রায়ের শিবিকার দিকে অগ্রসর হয় ও শিবিকা বাহকগণের হস্তচ্যুত হয়। এই সুযোগে আহম্মদনগরের সুলতান নিজাম শাহ স্বহস্তে রামরায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। রাম রায়ের মৃত্যুতে বিজয়নগরের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। রাম রায়ের ছিন্ন মুণ্ড বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া মুসলমানগণ শোভাযাত্রা করিল, মুসলিম সৈন্য বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া প্রায় একলক্ষ বিধর্মী হিন্দু প্রজা হত্যা করিল, তারপর একশত পঞ্চাশ দিন অর্থাৎ পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বিধর্মীর গৃহদাহ, বিধর্মীর সম্পত্তি লুণ্ঠন, বিধর্মীর রক্তপাত করিয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করিল, বিজয়নগরের সমস্ত মন্দির, বিগ্রহ, প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া একদিকে জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল, অন্যদিকে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিওয়েল তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক A Forgotten Empire গ্রন্থে লিখিয়াছেন—বিজয়নগর ধ্বংস পৃথিবীর সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাসে চরম দুর্ভাগ্য।

মন্ত্রী রাম রায়

বিজয়নগরের বৈদেশিক বিবরণ: ইতালিয় পর্যটক নিকলো কন্তি (১৪২০ খ্রীঃ), নুনিজ এবং বারবোসা (১৫১৬ খ্রীঃ), পর্তুগীজ পাএস (১৫২২ খ্রীঃ) এবং সমরখন্দের আবদুর রেজ্জাক বিজয়নগরের প্রত্যক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিজয়নগরের পরিধি ছিল পঞ্চাশ বর্গমাইল, সদা প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা ছিল নব্বই সহস্র; নগরটি সপ্ত প্রাচীর বেষ্টিত, সপ্ত সিংহদ্বার সমন্বিত। নগরবাসী সর্বদা মণিমুক্তার অলংকার পরিধান করিত; প্রকাশ্য রাজপথপার্শ্বে হীরক, মণিমুক্তা ও স্বর্ণ বিক্রীত হইত। রেশম, কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন নিত্যব্যবহার্য বিলাস সামগ্রী ছিল। বিজয়নগরের খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, পণ্যের সহজলভ্যতা ও রাজার আতিথেয়তা বিদেশীদিগকে সতত আকর্ষণ করিত।

ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগরের দান: আলাউদ্দীন খলজী এবং মুহম্মদ তুঘলকের পরে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম অগ্রগতি বিজয়নগরের রাজগণ প্রতিহত করিয়াছিল, মুসলিম বাহমনী সুলতানগণ দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ অঞ্চলে একপদও অগ্রসর হইতে পারে নাই; বিজয়নগর দুর্বল হইলে ইসলাম প্রচারবিলাসী বাহমনী সুলতানগণ দাক্ষিণাত্যকে সম্পূর্ণ ইসলামায়িত করিত। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল বিজয়নগর। উত্তর ভারতের ও রাজপুতনার সংস্কৃতি অনেকটা মুঘলযুগের সমন্বয়ী ধারায় রূপায়িত হইয়াছিল, কিন্তু বিজয়নগরের জন্য দাক্ষিণাত্যে উহা সম্ভব হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে মুসলিম

মুসলিম অগ্রগতি প্রতিরোধ

রাজন্যবর্গের ধর্মরাজ্য স্থাপন ও ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে বিজয়নগরই হিন্দু-রক্ষা প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছিল, বিজয়নগরের রাজন্য-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই হিন্দু সংস্কৃতি দাক্ষিণাত্যে অনেকটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে।

হিন্দুধর্ম রক্ষা প্রাচীর

বিজয়নগরের মন্দির ও বিগ্রহগুলি ভারতের শিল্প ও ধর্মের ইতিহাসে অপূর্ব অবদান। সর্বভারতীয় ধর্মের ভাষা সংস্কৃতের এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় তেলেগু এবং কানাড়া ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বিজয়নগর ভারতীয় সংস্কৃতি-উৎসকে, তথা সংস্কৃত ভাষাকে বহু দুর্দৈব হইতে রক্ষা করিয়াছে।

বিজয়নগরের মন্দির-শিল্প এবং ভাষা ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য বিচারে তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ দ্বিতীয় বুক্কার অপূর্ব কীর্তি। রাজা বুক্কা প্রস্তর খনিত করিয়া সুদীর্ঘ সপ্তক্রোশব্যাপী পয়ঃপ্রণালী (খাল) রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দর্শকগণকে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট করে।

বিজয় নগরের স্থাপত্য

বাহমনী রাজ্য (১৩৪৭-১৬৬৮ খ্রীঃ)

মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ ভাগে প্রথমে ইসমাইল মুখ নামক একজন মুসলমান নেতার অধীনে দৌলতাবাদে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৩৪৭ খ্রীঃ)। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই **হাসান খান** বা **জাফর খান** নামে একজন মুসলমান আমীরের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন। এই হাসান খানই ইতিহাসে **হাসান আলাউদ্দীন বাহমন শাহ** এবং **হাসান গঙ্গু বাহমনী** নামে পরিচিত। ডাঃ স্মিথ বলেন, হাসান পারস্য দেশীয় বীর বাহমনের বংশধর; সুতরাং তাহার নাম হইল হাসান বাহমন শাহ, বংশের নাম হইল বাহমনী বংশ, তাঁহার রাজ্য হইল বাহমনী রাজ্য। ফেরিস্তা বলেন, হাসান প্রথমে গঙ্গু নামক এক ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। পরবর্তিকালে রাজপদ লাভ করিয়া প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তিনি 'হাসান গঙ্গু বাহমন' উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের নামকরণ করেন বাহমনী রাজ্য।

বাহমনী বংশের আঠার জন সুলতান ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত একাত্তর বৎসর রাজত্ব করেন। প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল বর্তমান হায়দরাবাদের অন্তর্গত গুলবর্গা, পরে বিদর। গোয়া ও দাইবুল বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাহমনী রাজ্যের ইতিহাস অন্তর্দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা, নরহত্যা ও পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষের কাহিনী। বাহমনী বংশের আঠার জন সুলতানের মধ্যে পাঁচ জন নিহত, দুই জন মদ্যপান হেতু অকালে মৃত ও তিন জন সিংহাসনচ্যুত হন। অন্যদিকে বাহমনী সুলতানগণ দুর্গ

পরবর্তী সুলতানগণ

নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, সমাধি নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

হাসান গঙ্গুর রাজত্ব (১৩৪৭-১৩৫৭ খ্রীঃ) ঃ রাজ্যলাভের পর হাসান পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করিয়া রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্য চারিটি তরফ বা বিভাগে বিভক্ত ছিল—গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর। প্রত্যেক তরফের একজন শাসনকর্তা ছিলেন। হাসান ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে হিন্দুর জীবন অতিষ্ঠ হইয়াছিল।

হাসানের অষ্টম বংশধর **ফিরুজ শাহ বাহমন** (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ) এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে তাঁহার সমান যোগ্যতা ছিল। তিনি দুই বার বিজয়নগরের রাজাকে পরাজিত করেন এবং বিজয়নগরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তৃতীয় বারের যুদ্ধে তিনি বিজয়নগরের রাজার নিকট পরাজিত হন (১৪২০ খ্রীঃ)। অতঃপর তিনি ভ্রাতা আহম্মদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইসলাম ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। গুলবর্গার সুরম্য হর্ম্যশ্রেণী ও ভীমা নদীর তীরবর্তী বিশাল রাজপ্রাসাদ ফিরুজ শাহ বাহমনের শিল্পানুরাগের পরিচয়।

ফিরুজ শাহ বাহমন

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে বাহমনী রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময় আমীরগণ দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া যান। প্রথম দলে ছিলেন হাবসী ও ভারতীয় সুন্নী মুসলমানগণ এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষিণী তুর্কী, ইরাণী, মুঘল ও কতিপয় আরব। দ্বিতীয় দলের নায়ক ছিলেন ইরাণী মুহম্মদ ঘাওয়ান খাজা জাহান। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল পর পর তিন জন সুলতানের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার চেষ্টায় বিচার বিভাগের সংস্কার হয়। তাঁহার সময়ে কোঙ্কণ, উড়িষ্যা ও গোয়াতে বাহমনী বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্বয়ং অনাড়ম্বর এবং সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিদরের বৃহৎ মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগার তাঁহারই কীর্তি। কিন্তু তিনি ছিলেন পরধর্মদ্বেষী ও নিষ্ঠুর। হিন্দু পীড়ন ছিল তাঁহার শাসনকালের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দক্ষিণী মুসলমানগণ মামুদ ঘাওয়ানকে বিদেশী ও বিধর্মী মনে করিত। তাহাদের প্ররোচনায় বিজয়নগরের সহিত ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে বাহমনী সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহ তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (১৪৮১ খ্রীঃ)। মামুদ ঘাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনী রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

মন্ত্রী মুহম্মদ ঘাওয়ান

বাহমনী রাজ্যের পঞ্চশাখা ঃ মামুদ ঘাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনী

রাজ্যের ইতিহাস হইল **বেরার, বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা** ও **বিদর**—এই পাঁচটি খণ্ডরাজ্যের কাহিনী। মামুদ ঘাওয়ানের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হিন্দু **ফতেউল্লা ইমাদ শাহ** বেরারে **ইমাদ শাহী বংশ** প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জর্জিয়াবাসী ক্রীতদাস আমীর **ইউসুফ আদিল শাহ** বিজাপুরে **আদিল শাহী বংশ,** ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হিন্দু সন্তান **মালিক আহম্মদ শাহ** আহম্মদনগরে **নিজাম শাহী বংশ,** ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্ক জাতীয় **কুতুব শাহ** গোলকুণ্ডায় **কুতুব শাহী বংশ** এবং ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য দেশীয় আমীর **আলী বারিদ** বিদরে **বারিদ শাহী বংশ** প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ—এই পঞ্চ খণ্ডরাজ্যের বৈশিষ্ট্য। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদর ব্যতীত অন্য চারিটি রাজ্য মিলিত হইয়া তালিকোটের যুদ্ধে প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ধ্বংস করে। ইহার দশ বৎসরের মধ্যে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেরার আহম্মদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কয়টি রাজ্যই পরবর্তী কালে মুঘল সম্রাটগণ কর্তৃক একে একে বিজিত হয়।

সমসাময়িক বিজয়নগর ও বাহমনী রাজন্যবর্গ

১৩৩৬—১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ

বিজয়নগর		বাহমনী	
১ম হরিহর	১৩৩৬ —১৩৫৪খ্রীঃ	১ম আলাউদ্দীন	১৩৪৭ খ্রীঃ
বুক্কা	১৩৫৪ —১৩৭৭	১ম মুহম্মদ	১৩৫৮ „
২য় হরিহর	১৩৭৭ —১৪০৪	মুজাহিদ	১৩৭৩ „
২য় বুক্কা	১৪০৪ —১৪০৬	দায়ুদ	১৩৭৮ „
১ম দেবরায়	১৪০৬ —১৪২২	২য় মুহম্মদ	১৩৭৮ „
বীর বিজয়	১৪২২ —১৪২৫	ঘিয়াসউদ্দীন	১৩৯৭ „
২য় দেবরায়	১৪২৫ —১৪৪৬	শামসউদ্দীন	১৩৯৭ „
মল্লিকার্জুন	১৪৪৭ —১৪৬৫	ফিরুজ	১৩৯৭ „
১ম বীরূপাক্ষ	১৪৬৫ —১৪৮৫	আহম্মদ	১৪২২ „
প্রৌঢ় দেবরায় (২য় বীরূপাক্ষ)	১৪৮৫ —১৪৮৬	২য় আলাউদ্দীন	১৪৩৫ „
		হুমায়ুন	১৪৫৭ „
শালুব নরসিংহ	১৪৮৬ —১৪৯২	নিজাম	১৪৬১ „
ইম্মাদি নরসিংহ	১৪৯২ —১৫০৩	৩য় মুহম্মদ	১৪৬৩ „
বীর নরসিংহ	১৫০৩ —১৫০৯	মামুদ	১৪৮২ „
কৃষ্ণদেবরায়	১৫০৯ —১৫২৯	বাহমনী রাজ্য পঞ্চধাবিভক্ত	
অচ্যুত	১৫২৯ —১৫৪২		
সদাশিব	১৫৪২ —১৫৬৫	বাহমনী রাষ্ট্র পঞ্চক	
	১৫৬৫ —১৫৭০	তালিকোটের যুদ্ধ	১৫৬৫ „

রাজপুত রাজ্য

মেবার ঃ এই যুগে তিনটি রাজপুত রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে চিতোরের শিশোদীয় (গুহিলোত্) বংশের আবির্ভাব প্রমাণ করিয়াছেন। গুহিলোত্ রাজগণ সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেও বোধ হয় তাহারা বৈদেশিক গুর্জর জাতির শাখা। আলাউদ্দীন খলজী ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর জয় করিয়াছিলেন এবং পুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাণা হাম্মির ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া চিতোরে পুনরায় গুহিলোত্ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। রাণা হাম্মিরের পুত্র ক্ষেত্র সিংহ, পৌত্র লখা সিং চিতোরের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ বংশের দুর্বলতার সুযোগে রাণা কুম্ভ মালব এবং গুজরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মেবারকে রাজপুতানার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করেন। মালব বিজয়ের গৌরব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি চিতোরে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাণা কুম্ভের পৌত্র 'শত সমর বিজয়ী' রাণা সংগ্রামসিংহ (১৫০৯-১৫২৮খ্রীঃ) শিশোদীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি মালব এবং দিল্লীর সুলতানকে একাধিকবার পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে আশীটি যুদ্ধক্ষত চিহ্ন ছিল। যুদ্ধে তাঁহার একটি চক্ষু, একটি হস্ত নষ্ট হয় এবং পদ ছিল প্রায় অবশ। তিনি মালবের সুলতান দ্বিতীয় মামুদকে পরাজিত করিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পূর্বে তিনি বাবরকে পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পূর্ববর্তী মোঙ্গল অভিযানকারীদের মত বাবরও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। পরে বাবর রাজত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষায় দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলে সংগ্রাম সিংহ তাঁহার বিরোধিতা করেন; কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে গোলন্দাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে রাজপুত সৈন্য পরাজিত হইল। কিন্তু বাবর পাণিপথ বিজেতা হইয়াও মেবার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই।

শিশোদীয় বংশ

রাণা সংগ্রামসিংহ

মাড়ওয়ার ঃ রাজপুতনায় মেবারের পরেই মাড়ওয়ারের সম্মান। মাড়ওয়ারের রাঠোর রাজবংশ প্রাচীন রাষ্ট্রকূট জাতির সন্তান। বাস্তবিক পক্ষে মাড়ওয়ার রাজ্য ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চুণ্ডার (১৩৯৪-১৪২১ খ্রীঃ) অধীনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র যোধ (১৪৩৮-৮৮ খ্রীঃ) একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন এবং নিজের নামানুসারে উহার নামকরণ করিলেন যোধপুর। যোধপুরেই তিনি রাঠোর রাজধানী স্থাপন করেন। যোধের অন্যতম পুত্র বিকা ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিকানীর নগর স্থাপন করেন। তুর্ক-আফঘান সুলতানীর পতনের যুগে মাড়ওয়ারের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন মাল্‌দেব।

অম্বর ঃ অম্বরের বর্তমান নাম জয়পুর। জয়পুরে কাচ্ছাওয়াহা রাজ-

পুতগণ অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া গর্ব অনুভব করেন। অম্বর রাজ্য খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। কাচ্ছাওয়াহা রাজবংশের সহিত মেবারের শিশোদীয় বংশের শত্রুতা রাজস্থানের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে।

তুর্কী রাজত্বের সূচনায় গুজরাট একটি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। সমুদ্র-বাণিজ্য গুজরাটবাসিদিগকে অর্থশালী করিয়াছিল, উর্বরা ভূমি গুজরাটের কৃষকদিগকে চিরসুখী করিয়াছিল। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী রাজপুত রাজা কর্ণদেবকে পরাভূত করিয়া গুজরাট অধিকার করেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে গুজরাটে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মামুদ শাহ তুঘলকের সময় জাফর খান নামে একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তৈমুরের আক্রমণের পরে দিল্লী সুলতানীর দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তিনি 'মুজাফর শাহ' উপাধি ঘোষণা করিলেন (১৪০১-১৪১১ খ্রীঃ)। মালবের সঙ্গে গুজরাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সময়ে গুজরাটের বিশেষ ঘটনা। মুজাফর শাহ মালবের শাসনকর্তা হুশাঙ শাহকে পরাজিত করেন এবং ধার রাজ্য জয় করেন। তাঁহার পৌত্র আহম্মদ শাহ (১৪১১-১৪৪২ খ্রীঃ) গুজরাটের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি মালব, আসীরগড় প্রভৃতি রাজ্যের নরপতিগণকে পরাজিত করেন। তিনি আহম্মদনগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে আহম্মদ শাহই গুজরাটে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুক্তহস্ত দাতা এবং ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন, কিন্তু ভীষণ হিন্দু বিদ্বেষীও ছিলেন। আহম্মদাবাদের বিখ্যাত তিন দরওয়াজা ও বিখ্যাত জাম ই-মসজিদ আহম্মদ শাহের সময়েই নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র মামুদ বেগড়া ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি সাহসী যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁহার পর্বতপ্রমাণ দেহ এবং সম্মার্জনী সমতুল গুম্ফরাজি মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিত। তাঁহার খাদ্যবিলাস ও খাদ্যের পরিমাণ ছিল দর্শকের বিস্ময়। তিনি কাথিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত জুনাগড় ও চম্পানীর দুর্গ অধিকার করেন। কচ্ছের রাণা সুমরা ও শোধাকে তিনি পরাজিত করেন। মালব এবং রাজপুতানার কিয়দংশও তিনি জয় করেন। মিশরের খলিফার সঙ্গে মিলিত হইয়া ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ প্রাধান্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে তিনি সফলতা লাভ করেন নাই এবং পর্তুগীজদিগকে দিউ বন্দরে কারখানা

আলাউদ্দীন খলজীর গুজরাট অধিকার

আহম্মদ শাহ

মামুদ বেগড়া

স্থাপনের অনুমতি দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মুজাফর শাহ গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মেদিনী রায়কে পরাস্ত করিয়া মালবের সুলতান মামুদ খলজীকে মালবের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাবরের আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেন। দুইমাস পরে দ্বিতীয় মুজাফরের পুত্র বাহাদুর শাহ গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মুজাফর শাহ

মালব

১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী মালব জয় করেন। তৈমুরের আক্রমণ পর্যন্ত মালব দিল্লীর সুলতানের অধীন ছিল। তৈমুরের আক্রমণের পরেই মালবের শাসনকর্তা দিলওয়ার খান ঘুরী স্বাধীনভাবে মালব শাসন করেন কিন্তু তিনি কোন রাজ-উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্র হুসাঙ শাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৪০৬ হইতে ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। যুদ্ধ ছিল তাঁহার ব্যসন। তিনি অতর্কিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করেন। তারপর তিনি জৌনপুর, গুজরাট, বাহমনী রাজ্য এবং দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি মাণ্ডুতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র মামুদ শাহ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল এবং অকর্মণ্য। তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী মামুদ শাহ খলজী মালবে স্বাধীন খলজী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ শাহ, গুজরাটের সুলতান প্রথম মুহম্মদ শাহ এবং বাহমনী সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহ এবং মেবারের রাণা কুম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি মিশরের খলিফা কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা দক্ষিণে শতপুরা পর্বতমালা, পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, পশ্চিমে গুজরাট ও উত্তরে মেবার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইতিহাসকার ফেরিস্তা বলেন, রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা যুদ্ধশিবিরই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মামুদ খান খলজীর সময়ে চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ মালব জয় করেন।

হুসাঙ শাহ

মামুদ শাহ

উড়িষ্যা

পূর্ব ভারতে মুসলিম বিজয়ের সমকালে প্রাচ্য গঙ্গবংশ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিত। প্রাচ্য গঙ্গবংশের রাজ্যসীমা বাঙ্গলার দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম সীমা স্পর্শ করিত; সুতরাং সহজভাবেই মুসলিম-বিজেতা উড়িষ্যার প্রতি বারংবার লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে।

মুসলিম দৃষ্টিতে উড়িষ্যা

উড়িষ্যার মন্দির, বিগ্রহ এবং প্রচুর ধনসম্পদ মুসলমানদিগের সহজ আকর্ষণের বস্তু ছিল। কিন্তু অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারী প্রথম নরসিংহ বর্মণ (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীঃ) বাঙ্গলার মুসলিমগণকে বারংবার প্রতিহত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রাচ্য গঙ্গবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইল। এই সময়ে ফিরুজ তুঘলক উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পুরীর মন্দির ধ্বংস করেন।

উড়িষ্যা আক্রমণ ও পুরীর মন্দির ধ্বংস

১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কপিলেন্দ্র নামক একজন দুর্ধর্ষ বীর প্রাচ্য গঙ্গবংশকে বিতাড়িত করিয়া উড়িষ্যায় একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি দক্ষিণে বাহমনী এবং বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন-ব্যাপী সফল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীঃ) গোদাবরীর দক্ষিণে অবস্থিত অংশ বিজয়নগরের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতান প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করেন এবং অন্যদিকে বাঙ্গলাব কররাণী বংশ পূর্বদিক হইতে বারংবার উড়িষ্যাব পূর্বপ্রান্ত আক্রমণ করে। প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি কবিয়া রাজ্যেব কিয়দংশ রক্ষা কবেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুব পর গোবিন্দ নামক একজন কায়স্থ ভোয়ীবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ভোয়ী বংশেব রাজত্বকালে সুলেমান করবাণী উডিষ্যা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত কবেন। ইহার পূর্বেই শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম এবং বাঙ্গলাব সংস্কৃতি উড়িষ্যায় প্রচার করিয়াছিলেন।

কপিলেন্দ্র

চৈতন্যদেবের উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার

কাশ্মীর

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সোয়াত উপত্যকা হইতে শাহ মীর্জা নামক একজন ভাগ্যান্বেষী মুসলিম কাশ্মীরের হিন্দুরাজার অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুরাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ক্রমশ হিন্দুরাজার ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি 'শাহমীর শামসউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে মুসলমান বাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৩৩৯ খ্রীঃ)। দশ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার চারি পুত্র একাদিক্রমে ৪৬ বৎসব রাজত্ব করেন। শামসউদ্দীনের পৌত্র সেকেন্দর শাহ (১৩৯৪-১৪১৬ খ্রীঃ) ভীষণ হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অমরনাথের শিবমন্দির, মার্তণ্ড মন্দির, শঙ্করাচার্যের মঠ, ক্ষীর ভবানীর মন্দির এবং আরও অন্যান্য বহু হিন্দুতীর্থ। সেকেন্দর শাহ আনুষ্ঠানিক-ভাবে বহু হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্য, ইরাক এবং আরব হইতে বহু মুসলমান উলামা কাশ্মীরে অভ্যর্থিত হইয়া-

শাহ মীর্জা কর্তৃক কাশ্মীরে মুসলমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাশ্মীর হইতে একাদশটি ব্রাহ্মণ পরিবার ব্যতিরেকে সমস্ত ব্রাহ্মণ বিতাড়িত হইয়াছিল।

সেকেন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ খান **জয়নুল আবেদীন** উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার কঠোরতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নির্বাসিত বহু কাশ্মীরী পরিবারকে কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করেন, গোহত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং প্রজাবর্গেকে ধর্ম-স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি ফার্সী, হিন্দী, তিব্বতী ও কাশ্মীরী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সাহিত্য, শিল্প, চিত্রাঙ্কণ এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার আদেশে মহাভারত এবং রাজ তরঙ্গিনী ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহে কয়েকখানি আরবী এবং ফার্সী পুস্তক হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তিনি দেশে সুশাসন প্রবর্তন করেন এবং দস্যুতা নিবারণ করেন। তিনি করভার লঘু করিয়াছিলেন এবং মুদ্রা সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিতেন এবং রাজ্যে পণ্যের আদান-প্রদান সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কাশ্মীর অপূর্ব উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন 'কাশ্মীরের আকবর'।

উদার চরিত্র জয়নুল আবেদীন

জয়নুল আবেদীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হায়দার শাহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ ছিলেন দুর্বল। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের জ্ঞাতি মীর্জা হায়দর কাশ্মীর জয় করেন।

জৌনপুর

মুহম্মদ জুনা খান তথা মুহম্মদ তুঘলকের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ফিরুজ শাহ তুঘলক গোমতী নদীর তীরে জৌনপুর নগর স্থাপন করেন। তৈমুরের আক্রমণের পরে মালিক সারওয়ার নামক জৌনপুরের একজন শাসনকর্তা 'মালিক-উস-শার্ক' (পূর্ব দেশীয় মালিক) উপাধি গ্রহণ করেন; কিন্তু সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি আলিগড় হইতে ত্রিহুত পর্যন্ত ভূখণ্ড শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পালিত পুত্র মালিক করণফুল 'মুবারক শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া শার্কী বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং নমাজের সময় স্বীয় নামে খুৎবা পাঠ করিতেন। শার্কী বংশীয় সুলতানগণ দীর্ঘকাল বঙ্গদেশ, মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শার্কীবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম শাহ শার্কী (১৪০২-১৪৪৬ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দিল্লীর সহিত আজীবন সংগ্রাম। তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলতা লাভ করেন নাই। ইব্রাহিম শাহের রাজত্বকালে

শার্কী বংশ প্রতিষ্ঠা

জৌনপুর রাজ্যে বহু মকতব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল এবং রাজকোষ হইতে শিক্ষালয়ের জন্য মুক্তহস্তে বৃত্তি ও অর্থ প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ইসলামিক ধর্মগ্রন্থ এবং ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখিত হয়। তাঁহার সময়ে জৌনপুরে বহু নূতন পথ, প্রাসাদ, হামাম (স্নানাগার) এবং মসজিদ নির্মিত হয়। জৌনপুরের অটল মসজিদ ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শন। জৌনপুরের মসজিদগুলি গম্বুজহীন। উহা হিন্দুস্থাপত্যের ধারা সূচিত করে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় জৌনপুরে নূতন স্থাপত্যধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং শিক্ষিত, সংগীতজ্ঞ এবং নানা গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সময়ে শিক্ষা এবং সমৃদ্ধিতে জৌনপুর পারস্যের শ্রেষ্ঠ নগর সিরাজের অনুকল্প হইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে জৌনপুর ছিল 'ভারতেব সিরাজ'।

ইব্রাহিমের পরবর্তী শার্কীবংশ

ইব্রাহিমের পরবর্তী সুলতান মামুদ শাহ শার্কী চুণার জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কল্পী জয় করিতে পারেন নাই। তিনি দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বাহলুল লোদী* কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন হুসেন শাহ শার্কী। দিল্লীর সহিত সুদীর্ঘকাল সংগ্রামের পরে তিনি ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহলুল লোদীর সহিত চারি বৎসরের জন্য যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে তিনি ত্রিহুতের জমিদারদিগকে দমন করেন, উড়িষ্যা লুণ্ঠন করিয়া বিপুল সম্পদ আহবণ করেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতে পাবেন নাই। অবশ্য গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ হুসেন শাহ শার্কীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রভূত অর্থ প্রদান করেন।

যুদ্ধ বিরতির সময় উত্তীর্ণ হইলে দিল্লীশ্বর বাহলুল লোদীর সহিত হুসেন শাহ শার্কীর পুনরায় বিরোধ আরম্ভ হইল। হুসেন শাহ শার্কী পরাজিত হইয়া বিহারে পলায়ন করিলেন। বাহলুল লোদী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরবক শাহকে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হুসেন শাহ শার্কী বিহার হইতে দিল্লীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করেন। সেকেন্দর লোদী জৌনপুর দিল্লীর শাসনভুক্ত করিয়া ভবিষ্যৎ গোলযোগের মূল বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ শার্কীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শার্কী বংশের অবসান হইল। পঁচাশি বৎসরব্যাপী শার্কী বংশের শাসন মুসলিম ভারতের ইতিহাসে একখানি সুন্দর আলেখ্য।

অনুশীলনী

১। সুলতানী আমলে বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(Write a short account of Bengal during the Sultani period of Indian History.)

২। বাঙ্গলার ইলিয়াস শাহী বংশের প্রাথমিক রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
(Give a brief account of early Ilyas Shahi rule of Bengal).

৩। "হুসেনশাহী রাজত্ব বাঙ্গলার মুসলিম ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ"—এই বাক্যের সত্যতা নির্ণয় কর।
("Husain Shahi rule was the golden age of Muslim Bengal". —Justify the statement.)

৪। বাহমনী রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। এই রাজ্য বিভক্ত হইয়া কোন্ কোন্ স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল ?
(Write a short account of Bahmani kingdom. What were the kingdoms that arose out of its ruins.)

৫। বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান, পতন ও সমৃদ্ধির কাহিনী বর্ণনা কর।
(Give an account of the rise, fall and prosperity of Vijayanagar.)

৬। দিল্লী সুলতানীর পতনের যুগে ভারতের রাজপুতরাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
(Write a brief account of the Rajput kingdoms that arose after the fall of Delhi Sultanate.)

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন খলজী, (খ) রাজা গণেশ (গ) রাজা কৃষ্ণদেব রায় (ঘ) তালিকোটের যুদ্ধ (ঙ) জয়নুল আবেদীন (চ) ইব্রাহিম শাহ শার্কী।
(Write short notes on : (a) Ikhteeruddin Khalji (b) Raja Ganesh (c) Raja Krishnadev Roy (d) Battle of Talikote (e) Joynul Abedin (f) Ibrahim Shah Sharki,)

ষষ্ঠ অধ্যায়

তুর্ক-আফঘান যুগে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

অধ্যায় পরিচয়ঃ ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ছিল উদার ও প্রাণবন্ত। সেইজন্যই গ্রীক, শক, পহ্লব, হুণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি সহজেই ভারতে আসিয়া ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সুলতানী আমলে মুসলিমগণ সুদীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল এদেশে বসবাস করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে নিজেদেব স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নাই। ধর্মপ্রচারই ছিল মুসলমানদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ধর্মই ছিল হিন্দু জীবনের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং মুসলমান আগমনের প্রথম যুগে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ও বিক্ষোভ আরম্ভ হইল। কালের গতিতে এই বিক্ষোভ শান্ত হইলে ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান বিবোধের মাঝে মিলনের সন্ধান পাইল। তুর্কী জাতির মধ্যে মিলনাত্মক দিকও ছিল।

ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও হিন্দুর আত্মরক্ষাঃ মুসলমানগণ সিন্ধু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবষে ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিল। হিন্দু-সমাজে নিম্নবর্ণেব সঙ্গে উচ্চবর্ণেব পার্থক্য, উচ্চ বাজপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা, জিজিয়া কর, তীর্থকর ইত্যাদি আর্থিক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি লাভের প্রলোভন, কোন কোন ক্ষেত্রে সুফী, দরবেশ ও ফকিবের প্রভাব অথবা মুসলিম রাজপুরুষদের অত্যাচার ও অনুরূপ রাজনৈতিক কারণে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বহুপত্নীক মুসলমানগণ ভারতীয় নারী বিবাহ করায় ভারতবর্ষে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল।

ইসলাম ধর্মের প্রচারে হিন্দু-সমাজ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হিন্দুর চিন্তা অনুযায়ী রাজাই ধর্মরক্ষক। রাজার অভাবে ব্রাহ্মণগণ হিন্দু ধর্ম রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। রঘুনন্দন, বিজ্ঞানেশ্বর, কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ রক্ষণশীল ও কঠোর অনুশাসনের সাহায্যে হিন্দু ধর্ম এবং সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। মুসলমান ধর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কালক্রমে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ এবং স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথাও ব্যাপক হইল। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থায় হিন্দুসমাজ আপাতত রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল।

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষেব সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনৈতিক বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে। কিন্তু বহুকাল একত্র বসবাসেব ফলে, হিন্দুর সহনশীলতা গুণে

এবং অর্থনৈতিক কারণে এই দুই সম্প্রদায় ক্রমশ নিকটতর হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে প্রভাবিত করিতে থাকে। মুসলিম পরিবারে বহু ধর্মান্তরিত হিন্দু নারীর অবস্থান হেতু নানাপ্রকার হিন্দু সামাজিক রীতিনীতি মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়। হিন্দুগণ ধর্মান্তরিত হইলেও তাহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রথা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নাই। মুসলমান সুলতানগণ ভারতীয় সমাজের বৃত্তিভেদ নষ্ট করেন নাই অর্থাৎ হিন্দু তন্তুবায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও 'মৌমিন' নামে পরিচিত তাঁতী বা জোলাই রহিল। মুসলিম সমাজে রজক, ধীবর, ক্ষৌরকার ইত্যাদি জাতি আছে। সুতরাং ভারতীয় মুসলিম সমাজে হিন্দুর জাতিভেদের অনুরূপ বিভাগ এবং হিন্দু সমাজের বহু আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়া গেল। ভারতীয় নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রার প্রণালীতে হিন্দু নারীর অনুকরণ করিত। ইবন বাত্‌তুতার বিবরণীতে মধ্য যুগের মুসলিম সমাজেও সতীদাহ এবং জহর ব্রতানুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমান সুলতান এবং সেনাপতিরাও সময়ে সময়ে হিন্দু রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। ফিরুজ তুঘলক ও সেকেন্দর আলী হিন্দু মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের সিংহাসন লাভ কোন বাধা হয় নাই। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন ধর্ম সম্বন্ধে উদার ও সহনশীল ছিলেন। ইহার পূর্বেও আলবেরুণী প্রমুখ একাধিক মুসলিম সুধী ও সুলতান ভারতীয় বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মগ্রন্থাদির সহিত পরিচিত ছিলেন।

ধর্মে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী : সুলতানী আমলে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন সংঘাত, অন্যদিকে তেমন সমন্বয় চলিতেছিল। এই ধর্ম সমন্বয়ে হিন্দু সাধু, সন্ন্যাসী ও প্রচারক এবং মুসলিম ফকির, দরবেশ ও সুফী সাধকের অসামান্য অবদান রহিয়াছে। মুসলমানগণ ধর্মে একেশ্বরবাদী এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্যবাদী। অন্যদিকে হিন্দুগণ সাধারণত বহু দেবদেবী এবং সমাজে উচ্চ-নীচ জাতিভেদে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের ধারণা ছিল ; মুসলমানগণের সংঘাতে এই একেশ্বরবাদের আদর্শ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই যুগে পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে পঞ্জাব পর্যন্ত বহু ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে মধ্যভারতের **রামানন্দ**, বেনারসের **কবীর**, বাঙ্গলার **চৈতন্য**, পঞ্জাবের **নানক** এবং মহারাষ্ট্রের **নামদেব** বিখ্যাত।

রামানন্দ (চতুর্দশ শতাব্দী) **:** রামানন্দ রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তিনি সহজ সরল হিন্দী ভাষায় একেশ্বরবাদের আদর্শ প্রচার করেন। রামানন্দ মানুষে মানুষে প্রভেদ স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে—ভক্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। হিন্দু, মুসলমান, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে অনেকেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কবীর, রুইদাস প্রমুখ অনেকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া অভিহিত হন।

কবীর (পঞ্চদশ শতাব্দী) : কবীর ছিলেন জোলা জাতীয় মুসলমান সাধক। তিনি হিন্দুর মত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং তানপুরা সহযোগে রামনাম গান করিতেন। কবীরের প্রচারিত ধর্মের আদর্শ ছিল

প্রাচীন চিত্রে কবীর ও তাঁহার হিন্দু মুসলমান শিষ্যগণ

আত্মশুদ্ধি ও ভক্তি। তিনি রামকে রহিম, কৃষ্ণকে করিম এবং হরিকে হজরতের রূপান্তর বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার বহু হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য ছিল।

চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ) : চৈতন্য ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। অতি অল্প বয়সেই তিনি বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং কাশী, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপনার ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতে—ভগবৎপ্রেমই মুক্তির একমাত্র উপায়। **যবন হরিদাস** তাঁহার শিষ্য ছিলেন। বাঙ্গলায় সমাজ ও ধর্মজীবনের উপর চৈতন্যের প্রভাব অপরিসীম।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রীঃ) : নানক ছিলেন পঞ্জাবের জনৈক তেলির পুত্র। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, একেশ্বরবাদের আদর্শ প্রচার করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যাহা কিছু মহান তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি আপন ধর্মমত গড়িয়া তুলেন। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সমন্বয় তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। নাম (ঈশ্বরের গুণকীর্তন), দান (জীবের সেবা) ও স্নান (দৈহিক পরিচ্ছন্নতা) ছিল নানকের উপদেশ। গুরু নানকের উপদেশাবলী সংকলিত হইয়া **গ্রন্থসাহেব** (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণ

শিখ নামে পরিচিত। কথিত আছে, সত্যের সন্ধানে তিনি বাগদাদ ও মক্কা পরিভ্রমণ করেন।

ভারতের বহু মুসলমান সাধকও ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই সকল সাধক সুফী নামে পরিচিত। ভারতীয় সুফী সাধকগণের জীবনধারা অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী। ইসলামে সংগীত নিষিদ্ধ; অথচ সুফীগণ ভারতীয় আদর্শে সংগীতের মধ্য দিয়াই আল্লাহর নিকট আত্ম নিবেদন করেন। অনেক সুফীসাধক হিন্দু যোগীর মত ধ্যান, প্রাণায়াম করেন এবং নিরামিষ আহার করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফী সাধক মইনউদ্দীন চিশতী এবং নিজামউদ্দীন আউলিয়ার বহু হিন্দু শিষ্য ছিল।
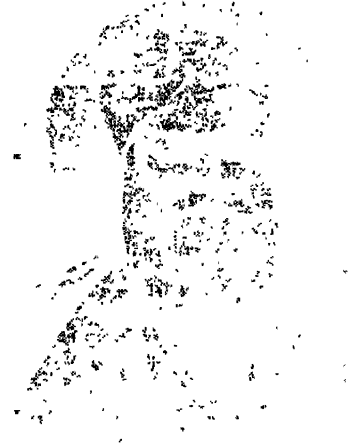
নানক

সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যপীর, ত্রিলোকপীর, ওলাবিবি প্রভৃতি নূতন দেবদেবীর কল্পনা করা হয় ও তাঁহাদের পূজা প্রচলিত হয়।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ তুর্কী আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেও ইহা মৃতপ্রায় হয় নাই। উত্তর ভারতে কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল। বৃহৎ হিন্দু তীর্থগুলি ছিল যেন এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রাহ্মণগণ টোল-চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত চর্চা করিতেন। এই যুগের

সংস্কৃত সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্য জয়দেব গোস্বামী, মাধবাচার্য, বিশ্বেশ্বর, রঘুনন্দন, রূপ-গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতের প্রতিভায় বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। সুলতান মামুদ গজনভী, মুহম্মদ ঘুরী, বলবন, রজিয়া এবং মুহম্মদ তুঘলক তাঁহাদের মুদ্রায় আরবী অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করিয়া ভারতীয় ভাষাকে নূতন মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। সুলতান সেকেন্দর লোদীর সময় হইতে হিন্দী ভাষায় আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইতে থাকে; বিজাপুরে ইউসুফ আদিল শাহের দরবারে মারাঠী ভাষায় দলিলপত্র লিখিত হইত।

লৌকিক ভাষা ও পল্লী-সাহিত্যের বিকাশ এই যুগের ধর্ম আন্দোলনের পরোক্ষ ফল। পূর্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ধর্ম এবং জ্ঞান প্রচারের জন্য সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের

লৌকিক ভাষার প্রসার

শ্রোতা ছিল উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুলতানী যুগের প্রচারকগণ জন-

সাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য সাধারণের বোধগম্য ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে গুরুমুখী, হিন্দী, মারাঠী ও বাংলা ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

হিন্দী ভাষা সুলতানী যুগে যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। কবীরের দোঁহাগুলি হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আমীর খসরু, মালিক মুহম্মদ জায়সী প্রভৃতি মুসলিম কবিও হিন্দী কাব্য এবং সাহিত্য রচনায় নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গুরু নানক এবং তাঁহার শিষ্যগণ **গুরুমুখী** ভাষায় ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম সংগীতাদি রচনা করিয়া এই ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। মহারাষ্ট্রের ধর্মপ্রচারক নামদেবের রচনাবলী **মারাঠী** ভাষার প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদাবলী মৈথিলী ভাষায় রচিত হইলেও ঐগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

সুলতানী আমলে বাঙ্গলা ভাষার বিপুল উন্নতি ও প্রসার ঘটে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গলা ভাষার অপূর্ব সম্পদ। বাঙ্গলার মুসলিম শাসকগণের আনুকূল্যে এই যুগে অনেকগুলি বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়।

বাঙ্গলা ভাষা

গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহ মহাভারতের অনুবাদ করান। গৌড়রাজের আনুকূল্যে কৃত্তিবাস তাঁহার বিখ্যাত রামায়ণ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা মালাধর বসুকে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরাগল খান কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারতের অনুবাদ করিতে আদেশ দান কবিয়াছিলেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান শ্রীকর নন্দীর দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন বাঙ্গলার বিখ্যাত মুসলিম কবি সৈয়দ আলাওল এই যুগে মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করেন।

এই সময়েই হিন্দী-ফার্সী ভাষার সমন্বয়ে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। হাসান আল দেহ্‌লবী নামক একজন কবি ফার্সী সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। উর্দু ভাষার ব্যাকরণ হিন্দী ব্যাকরণের অনুরূপ; কিন্তু অধিকাংশ শব্দ ফার্সী ও

ফার্সী ও উর্দু

হিন্দী হইতে গৃহীত। তুর্কী ভাষায় উর্দ শব্দের অর্থ শিবির, উর্দু অর্থে 'শিবিরে ব্যবহৃত ভাষা' বুঝায়। প্রথমে এই ভাষা প্রধানত শিবিরবাসী মুসলিম সৈন্যগণ হিন্দুর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যবহার করিত।

সুলতানী আমলে স্থাপত্য: প্রাচীন হিন্দুর মন্দিরেব অধিষ্ঠাতা ছিলেন বিভিন্ন দেবতা, বৌদ্ধ বিহারের অধিকাংশেই ছিলেন তথাগত বুদ্ধ, জৈন মন্দিরে ছিলেন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও পার্শ্বনাথ। একেশ্বরবাদী মুসলিমগণ মূর্তি, মন্দির বা বিহার সহ্য করিতে পারিত না। হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করা মামুদ গজনভীর অভিযানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি মন্দির-শিল্পীদিগকে গুজরাট হইতে বন্দী করিয়া নূতন গজনী নির্মাণের জন্য লইয়া

যান। প্রথমেই দাসরাজগণ ভারতে শিল্পী, রাজমিস্ত্রী লইয়া আসেন নাই এবং ভারতে পদার্পণ করা মাত্রই নূতন মসজিদ নির্মাণ করেন নাই। তাঁহারা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দেবালয়গুলি কোথায়ও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন, কোথায়ও বা হিন্দু মন্দিরকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করেন। যেমন, দিল্লীর কুতুব মসজিদ, আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া প্রভৃতি।

হিন্দু-মুসলিম শিল্প-রীতির সমন্বয়

হিন্দু মন্দিরের অভ্যন্তরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং সূক্ষ্ম কারুকর্ম মণ্ডিত স্তম্ভশ্রেণী ও প্রাচীরকে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। এইরূপে মসজিদে রূপান্তরিত মন্দিরগুলির এবং হিন্দু শিল্পিগণের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ের সূচনা হয়।

মুসলিমদের ধারণা—যে গৃহে একজন সুলতান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেখানে অন্য সুলতান বাস করিলে অমঙ্গল হয়। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী প্রায় প্রত্যেক সুলতানই নিজের জন্য একটি নগর কিংবা প্রাসাদ অথবা মহল নির্মাণ করিতেন। এই কারণে পুরাতন দিল্লীর নিকটে অনেকগুলি দিল্লী নির্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর পার্শ্বে শিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরুজাবাদ হিসার-ই-ফিরুজ প্রভৃতি শহর এবং উত্তর ভারতের জৌনপুর, পূর্বভারতে বাঙ্গলায় পাণ্ডুয়া, গুজরাটে আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নগর তুর্ক আফঘান যুগেরই কীর্তি।

সুলতানী যুগের স্থাপত্যে কয়েকটি আঞ্চলিক রীতি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এইগুলির মধ্যে দিল্লী, জৌনপুর, বাঙ্গলা ও গুজরাটের স্থাপত্য রীতির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দিল্লী ছিল সুলতানী যুগে প্রধান শাসন কেন্দ্র। সুতরাং দিল্লীর স্থাপত্যে মুসলমান প্রভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কুতুবমিনার ও তৎসংলগ্ন আলাই দরওয়াজা এবং সুলতান আলাউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত জমায়াৎ-খানা মসজিদ এবং নিজামউদ্দীন আউ-লিয়ার দরগা এই যুগের দিল্লীর স্থাপত্য রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। জৌনপুরের অধিকাংশ মসজিদই হিন্দু-মন্দির রূপান্তরিত করিয়া নির্মাণ করা হয়। সুতরাং জৌনপুরের স্থাপত্যে সেই হেতু হিন্দু প্রভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। অটলা মসজিদ জৌনপুরী স্থাপত্যরীতির চমৎকার
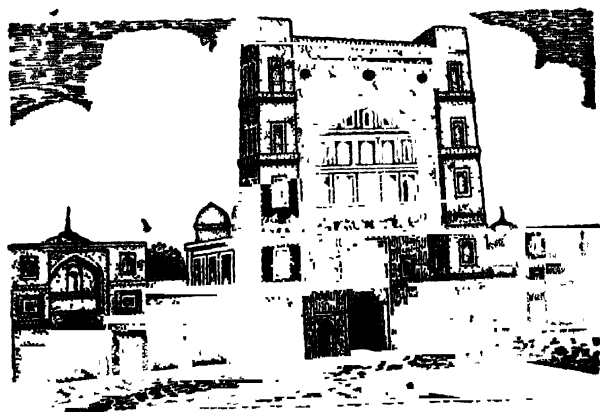
অটলা মসজিদ—জৌনপুর

আহম্মদাবাদে সিদি সৈয়দের মসজিদে প্রস্তরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য
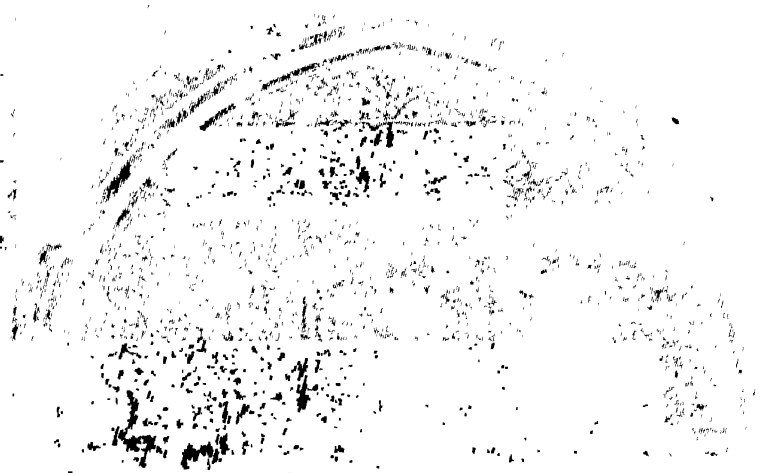
ছোট সোনা মসজিদ—পাণ্ডুয়া
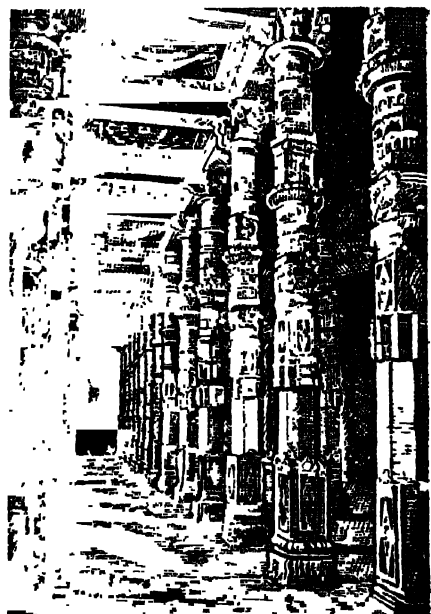
আড়াই দিন কা ঝোপড়া—আজমীর

উদাহরণ। বাঙ্গলা দেশে প্রস্তরের অভাবে ইষ্টক দ্বারা গৃহাদি নির্মাণ করা হইত। বাঙ্গলা দেশের মুসলিম স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাবে পদ্ম এবং অন্যান্য হিন্দু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নক্‌শার প্রচলন দেখা যায়। এই স্থাপত্যরীতি অনুসারে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল ইত্যাদি মসজিদ নির্মিত হয়। গুজরাটের শিল্পিগণ দারু ও প্রস্তরের উপর অতি সূক্ষ্ম কারুকর্মের জন্য বিখ্যাত ছিল। গুজরাটের বহু পুরাতন মন্দির ও গৃহাদি রূপান্তরিত করিয়া সুলতানী যুগে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত
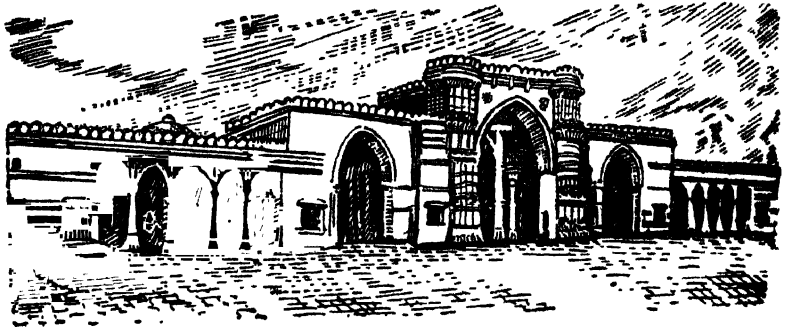
জাম-ই-মসজিদ—গুজরাট

হয়। গুজরাটের জাম-ই-মসজিদ ও আহম্মদাবাদের সিদি সৈয়দের মসজিদের সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং প্রস্তরের উপর জালির কাজ স্থানীয় শিল্প প্রভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুলতানী আমলে সামাজিক অবস্থা : সুলতানী আমলে ভারতে দুই শ্রেণীর লোক ছিল—বিজেতা মুসলমান এবং বিজিত হিন্দু। এই যুগে মুসলিম সমাজ বিদেশাগত তুর্ক-আফঘান এবং ভারতীয় ধর্মান্তরিত কিংবা ভারতবর্ষে জাত হিন্দু মাতা ও মুসলিম পিতার সন্তানগণকে লইয়া সংগঠিত ছিল।

মুসলমান সমাজ

সুলতান ও সুলতান-পরিবার ছিল সমাজের শীর্ষস্থানে। তাহাদের পরে ছিল সম্ভ্রান্ত শ্রেণী—আমীর, উচ্চ কর্মচারী, উলামা, কাজী প্রভৃতি। উহার নিম্নে মধ্যশ্রেণীতে ছিল চিকিৎসক, গণক, লেখক, বণিক, গায়ক, শিল্পী প্রভৃতি বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। সমাজের সর্বশেষ স্তরে ছিল আম বা জনসাধারণ। সুলতানী আমলে সমাজে দাস-প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। নাসীরউদ্দীন এবং মুহম্মদ তুঘলক ব্যতীত প্রায় সকল সুলতান ছিলেন বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল ও মদ্যপায়ী। নৃত্যগীত ও উৎসব দরবারের অঙ্গ ছিল। দিল্লীতে শুক্রবারের নমাজের পর দুই-তিন হাজার গায়ক, নর্তকী বাজীকর ইত্যাদির সমাবেশ হইত। পাখীর খেলা, পশুর লড়াই খুব জনপ্রিয় ছিল। মুসলমান সমাজে কঠোর অবরোধ প্রথা ছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধ দ্বারা বিবাদের

মীমাংসা হইত। হিন্দু শিল্পকার ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেও সর্বক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক বৃত্তি ত্যাগ করেন নাই।

হিন্দু সমাজ

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই জ্যোতিষ ও গণকের উপর বিশ্বাস করিত এবং কোষ্ঠিলিখন জনপ্রিয় ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ মদ্যপান করিত না, এবং সাধারণত নিরানিষ আহার করিত। পূজায় ছাগ-মেষ-মহিষ বলিদানের প্রথা ছিল। হোলী, বৈশাখী প্রভৃতি সামাজিক আমোদ-উৎসব হিন্দু-মুসলিম এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিত। নৃত্য, সংগীত, ক্রীড়া, শিকার গ্রাম্যমেলা প্রভৃতি ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের স্থল।

সুলতানী আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা: ভারতের ঐশ্বর্য, ধনরত্ন ইত্যাদি মুসলমানদিগকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। গজনীর সুলতান মামুদ ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা গজনীকে মধ্যযুগে এশিয়ার অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী নগরীতে পরিণত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খলজী প্রাক্-সুলতানী জীবনে দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত অর্থ উত্তর ভারতে আনয়ন করেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ ছিল মুসলিম সৈন্যদের প্রাপ্য।

হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা

এই ধনলোভই মুসলিম সৈন্যগণকে ভারত লুণ্ঠনে উৎসাহিত করিয়াছিল। সুলতানী যুগে ভারতের হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগকে জিজিয়া কর, তীর্থ কর দিতে হইত। আলাউদ্দীনের সময় ধারাবাহিক ভাবে হিন্দুর অর্থ অপহরণ আরম্ভ হয়। হিন্দুদিগকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শস্য কর দিতে হইত। হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা মুহম্মদ তুঘলকের তাম্র মুদ্রা প্রচলনের পর হইতে ফিরুজ তুঘলকের সময়ে একটু উন্নত হয়। সুলতানদের কারখানায় হিন্দু শিল্পী নিযুক্ত হইত। এই সময়ে পশ্চিমে গুজরাটের বরোচ, দক্ষিণের কালিকট, পূর্ব বাঙ্গলার সপ্তগ্রাম বিখ্যাত বন্দর ছিল; দ্রব্যমূল্যও অত্যন্ত কম ছিল—এক মণ গমের মূল্য এগার পয়সা, চিনির মণ ছিল পাঁচ পয়সা, আড়াই সের ঘি তিন পয়সা। তবুও নৈসর্গিক বা অন্য কোন কারণে অজন্মা হইলে খাদ্য চলাচলের সুব্যবস্থা ছিল না বলিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ হইত।

বৈদেশিক বিবরণ: সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের ধনরত্ন, ঐশ্বর্য, কৃষিসম্পদ ও শিল্প সাধনার বিষয় বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে ধারণা করা যায়।

ইবন বাতুতা

১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার তাঞ্জিয়ার নগরে **ইবন বাতুতা** জন্মগ্রহণ করেন। মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, আফঘানিস্তান প্রভৃতি নানাদেশ পর্যটন করিয়া তিনি ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাঁহাকে দিল্লীতে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় আট বৎসরকাল এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইবন

বাত্‌তুতার ব্যক্তিগত চরিত্র সৎ ছিল না। তিনি বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই একটি করিয়া বিবাহ করিতেন। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং সর্বদা ঋণী থাকিতেন। মুহম্মদ তুঘলক একাধিকবার তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্লথ চরিত্রের জন্য মুহম্মদ তুঘলকের সহিত মনোমালিন্য হয়। তিনি চীন দেশের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন; সেই সময় মুহম্মদ তুঘলক তাঁহাকে দূতরূপে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। চীনের পথে তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—বাঙ্গলা দেশে তখন এক মণ চাউলের মূল্য ছিল সাত পয়সা। হিন্দুস্থানেও দরবেশ আউলিয়াদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। হিন্দুকে শস্যের অর্ধাংশ কর দিতে হইত। ইবন বাত্‌তুতা পূর্ববঙ্গের সবুজ শস্যক্ষেত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং উহাকে 'নরক রাজ্যে স্বর্গ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী 'আল্ রিহালা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল ও তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ, ব্যবসাবাণিজ্য, পথঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু অমূল্য তথ্যে পূর্ণ। তাঁহার রচিত ভ্রমণ কাহিনীতে সত্যের সঙ্গে অনেক কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সময়ে চীনের দূতগণের সহিত চীনা দোভাষী পণ্ডিত **মা হুয়ান** এবং রাজা গণেশের সময় (১৪১৫ খ্রীঃ) **ফেসিঙ** ভারতবর্ষে আগমন করেন। বাঙ্গলা দেশ সম্পর্কে তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে সে যুগের বাঙ্গলা দেশের অবস্থা ও বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়। বাঙ্গলা দেশ রেশম ও কার্পাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গলা দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হইত। বাঙ্গলার বাদ্যযন্ত্র, অলংকার, মূল্যবান জরীর শিরোপা, চিত্রিত মাটির বাসন, ইস্পাতের ছুরি-কাঁচি, বৃক্ষবল্কল কিংবা ভূর্জপত্রে লিখিত পঞ্জিকা প্রভৃতির উল্লেখ তাঁহার বিবরণীতে পাওয়া যায়।

সুলতানী আমলে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস বস্তুত বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যেরই ইতিহাস। ঐ যুগে বহু বিদেশী পর্যটক এই দুইটি রাজ্য পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের বিবরণ হইতে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য তথা সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন জন বিদেশী পর্যটক বিজয়নগর পরিদর্শন করেন—ইতালির **নিকলো কন্তি** (১৪২০ খ্রীঃ), সমরখন্দের **আবদুর রেজ্জাক** (১৪৪৩ খ্রীঃ) এবং পর্তুগীজ **পাএস** (১৫২২ খ্রীঃ)।

নিকলো কন্তির বিবরণ হইতে জানা যায়,—একমাত্র রাজধানী বিজয়নগরের পরিধি ছিল ষাট মাইল। নগরটি দুর্ভেদ্য শৈলবেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেখানে অস্ত্রধারণক্ষম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার।

আবদুর রেজ্জাক বিজয়নগরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছিল সাতটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাকারগুলি একই কেন্দ্রের চতুর্দিকে নির্মিত। বিজয়নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুর্গ হিরাতের সুলতানের দুর্গ অপেক্ষাও দশ গুণ বৃহৎ ছিল। রাজপথে, বাজারে প্রায় সর্বত্রই হীরা, মুক্তা, চুনী, পান্না প্রভৃতি বিক্রয় হইত; সর্বশ্রেণীর লোকই মূল্যবান অলংকার পরিধান করিত। ইহা হইতে জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

পাএস-এর মতে, বিজয়নগর রোম নগরীর ন্যায় বৃহৎ ছিল। এই নগরে লক্ষাধিক বাসগৃহ ও গণনাতীত নাগরিক ছিল। নগরের জলাশয় ও উদ্যানগুলি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পরবর্তী যুগের পর্তুগীজ পর্যটক **ন্যুনিজের** বিবরণেও বিজয়নগরের সম্পদ ও সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য এই সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজয়নগরের সাধারণ শ্রেণী ছিল দরিদ্র।

অনুশীলনী

১। তুর্ক-আফঘান যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা বর্ণনা কর।

(Describe the course of the cultural fusion during Turkc-Afghan Period).

২। তুর্ক-আফঘান আমলের স্থাপত্য, ভাষা ও সাহিত্যের বিবরণ দাও।

(Briefly sketch of achievements during the Turko-Afghan rule in the field of architecture, language and literature).

৩। সুলতানী আমলে হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর ইসলামের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল?

(Describe the influence of Islam on Hindu society, culture and religion in the Sultani period).

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) কবীর (খ) নানক (গ) চৈতন্য (ঘ) রামানন্দ (ঙ) ইবনবাতুতা (চ) মা হুয়ান।

(Write short notes on: (a) Kabir, (b) Nanak, (c) Chaitanya, (d) Ramananda, (e) Ibn Battuta, (f) Ma Huan).

সপ্তম অধ্যায়

মুঘল-আফঘান সংঘর্ষের যুগ (১৫২৬-৫৬ খ্রীঃ)

বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ

অধ্যায় পরিচয়ঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ। এই যুগে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অতি শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—ইংলণ্ডে যেমন টুডার, ফ্রান্সে বুরবোঁ, পারস্যে সাফাবী, চীনে মিঙ রাজবংশ, ভারতেও তেমনি মুঘল রাজবংশ। এই দুই শতাব্দীর মধ্যেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, আফ্রিকার উপকূল ভাগ মানব অধ্যুষিত হইয়াছে, ইওরোপ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যুগেই ইওরোপের মনোরাজ্যে এক নূতন বিপ্লব (রেনেসাঁ) আরম্ভ হইয়াছিল; এই চিন্তা বিপ্লবের পবিণতি হইল ধর্ম বিপ্লবে। ধর্ম বিপ্লবের ফলে খ্রীষ্টান জগৎ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলা, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-বিজ্ঞান—সব কিছুই এক নূতন পথে পরিচালিত হইল। ভারতবর্ষও মুঘল যুগে একটা নূতন প্রবাহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মুঘল যুগে ভারতবর্ষে তুর্ক-আফঘান যুগের অবিরাম রক্তস্রোত স্তব্ধ হইয়া গেল, একটি রাজবংশ সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী ব্যাপী রাজদণ্ড পরিচালনা কবিল। একটি রাজভাষা, একটি কেন্দ্রীয় শাসন এবং একই সমন্বয়ী দৃষ্টিধাবা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, কলা, স্থাপত্য ও ভাষায় নূতন ধারা সূচিত হইয়াছিল।

ভারতে মুঘল যুগের তিনটি প্রধান বিভাগঃ (১) বাবর—হুমায়ুন বা সংঘর্ষের যুগ—শূরবংশের ছেদ চিহ্ন (১৫২৬-৫৫ খ্রীঃ), (২) গৌরবময় যুগ—আকবর হইতে আওরঙ্গজেবের যুগ (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রীঃ) (৩) পতন বা কঙ্কাল-বহনের যুগ—১ম বাহাদুর শাহ হইতে ২য় বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৮৫৭ খ্রীঃ)।

পুরুষসিংহ বাবর

বাবরের পিতা মীর্জা ওমব শেখ ছিলেন সমরখন্দের বিখ্যাত চাঘতাই তুর্কবীর তৈমুরের পঞ্চম বংশধর ও মাতা কতলুঘ নিগার খানুম ছিলেন কারাকোরামের মোঙ্গল বংশীয় বিখ্যাততর চেঙ্গিস খানের ত্রয়োদশ অধস্তন বংশধরের কন্যা। বাস্তবিক পক্ষে বাবরের পিতৃবংশ বা মাতৃবংশ কেহই মুঘল ছিল না। তৈমুর ছিলেন ধর্মে মুসলিম, চেঙ্গিস ছিলেন শামানী বৌদ্ধ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া হইতে বহু যাযাবর তুর্ক, তাতার, তুর্কোমান, মোঙ্গল, উজবেক প্রভৃতি জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সকলেই ভারতবাসীর নিকট সাধারণভাবে মুঘল নামে পরিচিত। বাবর বংশ পরিচয়ে ছিলেন তুর্কজাতীয়

পিতৃ-পরিচয়

চাঘতাই শাখার সন্তান। কিন্তু চাঘতাই তুর্ক নাম ভারতের ইতিহাসে অচল। বাবরের প্রতিষ্ঠিত বংশ ভারতের ইতিহাসে **মুঘল বংশ*** নামে পরিচিত। কথিত আছে, ভ্রম সহস্রবার উচ্চারিত হইলে সত্যরূপে বিকৃত হয়। ভারতের ইতিহাসে মুঘল নাম নির্বিচারে গৃহীত। মুঘল রাজবংশের সন্তানদের উপাধি ছিল মীর্জা।

বাবরের জন্ম

বীর বাবরের জন্মস্থান ফরঘনা, বর্তমান পারস্য ও তুর্কীস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চল। জন্ম—১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। পিতা ওমর শেখ স্থূলবুদ্ধি হইলেও পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তুর্কী ছিল বাবরের পিতৃভাষা, ফার্সী ছিল তাঁহার অধীত ভাষা। বাবরের তুর্কী ভাষায় রচনা রসাল, ছন্দোময় গন্থ; তাঁহার ফার্সী ভাষায় রচনা গম্ভীর কিন্তু অপুষ্ট। শৈশব হইতে বাবর ছিলেন অতিমাত্রায় পক্ক। তাঁহার
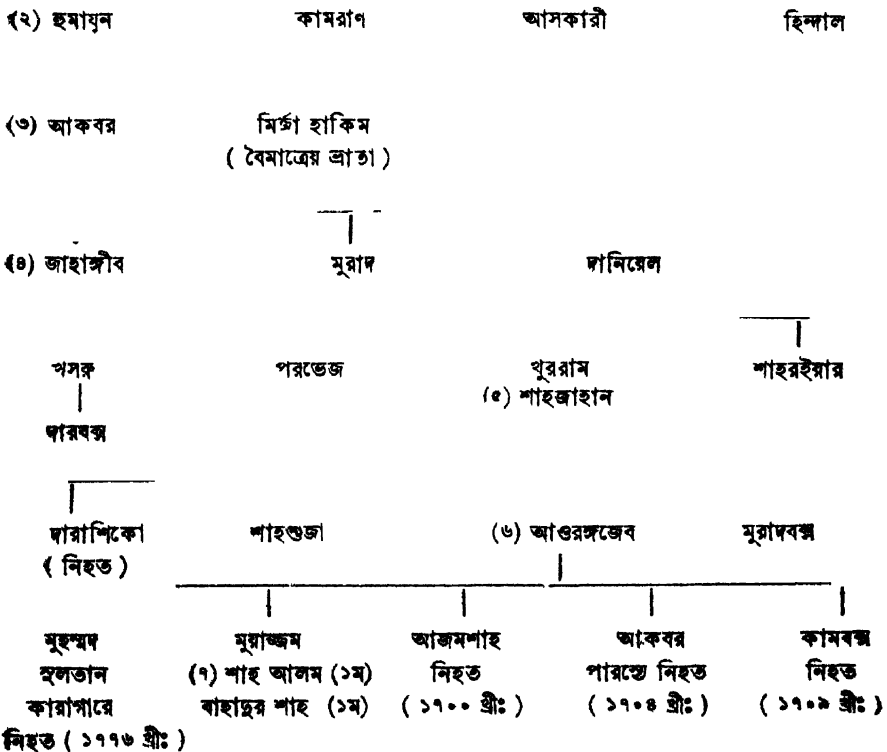
আত্মচরিতে পিতা ও পিতৃ-বন্ধুদের সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক ঘটনার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় বাবর বার বৎসর পূর্বেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।)

শৈশব ও শিক্ষা

অনেক সময় বাবর পিতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতেন। সেই সুযোগে বাবর রাজ্যের দুর্গম পার্বত্য পথ, দুর্ভেদ্য বনভূমি, মুক্তাঙ্গন শিবিরের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। শৈশবের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাবরকে তাঁহার ভবিষ্যতের জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

বাবর—প্রাচীন চিত্র

এশিয়ার ইতিহাসে ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপেই বাবর বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্-ভারতীয় জীবন ছিল তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রচ্ছদপট ও শিক্ষাক্ষেত্র।

পিতা ওমর শেখের অপঘাত মৃত্যুর পর বাবর একাদশ বৎসর বয়সে ফরঘনা রাজ্যের অধিপতি হইলেন। পিতামহী আইসান বেগমের পরামর্শে ও ব্যবস্থায় তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হইলেও বাবরের স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজ্য এবং সমরখন্দের সিংহাসন। কিন্তু দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যক্রমে বাবর তিনবার সমরখন্দ অধিকার করেন এবং তিনবারই বিতাড়িত হন। বাবর ফরঘনারাজ্যও তিনবার অধিকার করেন, তিনবার ফরঘনা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। একমাত্র বাদকসান ব্যতিরেকে মধ্য এশিয়ার কোন ভূখণ্ড বাবরের অধিকারভুক্ত ছিল না। এই সময়ের মধ্যে বাবর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল অধিকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কাবুল তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই।

রাজ্যচ্যুত বাবরের কাবুল অধিকার

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই প্রায় প্রতি বৎসরই বাবর কখনও আত্মরক্ষার্থে, কখনও রাজ্যজয়ের প্রেরণায় মোঙ্গল, উজবেগ, পারসিক এবং আফঘানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। ফলে মধ্য এশিয়ার জাতিবর্গের রণকৌশল আয়ত্ত করেন। পারসিকদিগের নিকট হইতে বাবর কামান, গোলা-বারুদ ব্যবহার শিক্ষা করেন। পারসিকগণ

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা

তুর্কীদের নিকট হইতে কামান ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। সতত চলমান অশ্বযুদ্ধে বাবর তুর্কীদের নিকট হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।
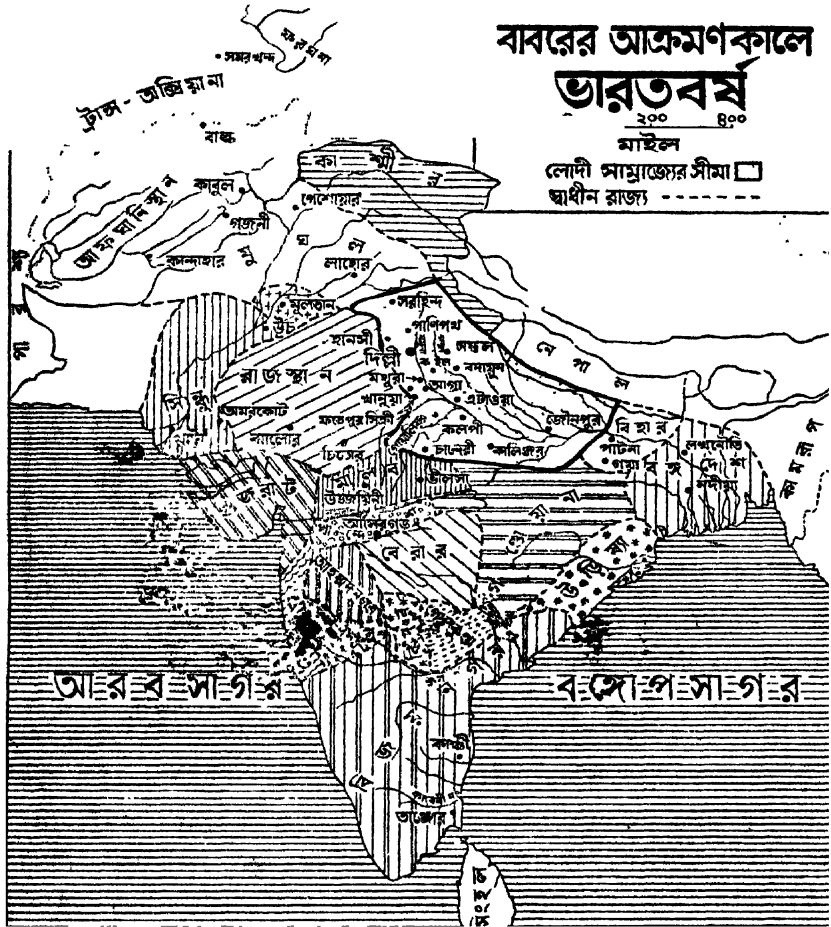
বাবর ভাগ্যক্রমে ওস্তাদ আলী এবং মুস্তাফা নামক দুইজন তুর্কী গোলন্দাজ সৈনিকের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বাবর কয়েকটি কামান, বন্দুক ও গোলা-বারুদ নির্মাণ করেন এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। বন্দুক-কামানের সাহায্যে বাবর পরবর্তিকালে পাণিপথ এবং খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। অবশ্য

গোলন্দাজ বাহিনী গঠন

আশৈশব যুদ্ধ, ভাগ্যবিপর্যয় এবং ক্রমাগত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ বাবরের দেহে শক্তি, চিত্তে বল, মনে স্থৈর্য, বিপদে ধৈর্য ও হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়াছিল। প্রকৃত সৈনিকের মত বাবর মৃত্যুকে করপুটে নিবদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, মৃত্যুর সঙ্গে তিনি চিরকাল খেলাই করিয়াছেন।

১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষুনদীর তীরবর্তী একজন সর্দারের একশত এগার বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতার নিকট তৈমুরের ভারত-বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাবর ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পিতৃভূমি সমরখন্দ জয়ের স্বপ্ন বিফল হইলেও বাবর পিতৃপুরুষ তৈমুর কর্তৃক বিজিত রাজ্য হিন্দুস্থানকে বিস্মৃত হন নাই। বাবর আত্ম-জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন--হিন্দুস্থানকে তৈমুর কর্তৃক বিজিত রাজ্যাংশরূপেই তিনি কল্পনা করিতেন। বাবর পাণিপথের যুদ্ধের পুর্বে পাঁচবার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিযানের লক্ষ্য ছিল কোহাট এবং মূলতান, দ্বিতীয় অভিযানে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে মান্দাবার হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয়বার ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সীমান্তবর্তী ইয়ুসুফ জাই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং বিজোরের দুর্গ অধিকার করিয়া ঝিলাম নদীর তীরবর্তী ভেরা বিজয় করেন। তারপর দিল্লীর সুলতানের উদ্দেশ্যে তৈমুর-বিজিত হিন্দুস্থানের অংশ দাবি করিয়া দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত লাহোর অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেই বৎসরই বাবর শীতের প্রারম্ভে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে বাদকসানে বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হিন্দুস্থান জয়ের পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযান

এক বৎসর পরে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ শিয়ালকোট জয় করেন। কিন্তু কান্দাহারে গোলযোগের সংবাদ পাইয়া অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি কান্দাহারে স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করেন।

১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীর আমন্ত্রণে বাবর লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু দৌলত খানকে লাহোর প্রত্যর্পণ করেন নাই। সুতরাং দৌলত খান লোদী লাহোর হইতে নিরাশ হইয়া বাবরের পক্ষ ত্যাগ করেন। ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত আলম খান লোদী দিল্লীর সিংহাসন লাভের আশায় বাবরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

দৌলত খান লোদীর আমন্ত্রণ

বাবর আলম খানকে দিল্লী আক্রমণে সাহায্য করিতে পারেন নাই। কারণ তখন তিনি বাল্খের উজ্‌বেগ বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে দৌলত খান লোদী বাবরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আলম খান লোদীসহ দিল্লী অভিযানে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পরস্পর অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার

হিন্দুস্থান আক্রমণের নূতন পরিকল্পনা

ফলে দৌলত খান এবং আলম খানের সৈন্য ইব্রাহিম লোদীর হস্তে পরাজিত হইল। বাবর এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া নূতন ভাবে নূতন সৈন্য দ্বারা নূতন রণকৌশল অবলম্বন করিয়া হিন্দুস্থান বিজয়ের পরিকল্পনা করিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধ (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রীঃ): ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে শীতের প্রারম্ভে বাবর দ্বাদশ সহস্র সৈন্য এবং ওস্তাদ আলী ও মুস্তাফার অধীনে ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনীসহ হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযানে যাত্রা করেন। বাদকসান হইতে জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন, গজনী হইতে খাজা কালান সসৈন্যে যোগদান করেন। দৌলত খান লোদী বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইল। আলম খান বহু আশা করিয়া অথচ ভীত হইয়া বাবরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যোগদান করিলেন। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ কাবুলের অধিপতি বাবরের বিরোধিতা করেন নাই, বোধ হয় তিনি সহযোগিতা অথবা নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। রাণা সংগ্রামসিংহ সম্ভবত ধারণা করিয়াছিলেন যে, বাবব পূর্বগামী মোঙ্গলদের ন্যায় বিজিত অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

বাবরের হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযান

বাবর সৈন্য, অশ্ব, কামানসহ দিল্লীব অদূরে **পাণিপথের** বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শিবির স্থাপন করিলেন এবং পরিখা খনন কবিলেন। ইব্রাহিম লোদী বাববেব পাণিপথে শিবির সংস্থাপনের বার্তা শ্রবণ কবিয়া এক লক্ষ সৈন্য, এক সহস্র হস্তী এবং গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতেব রাজপুতবাহিনীসহ পাণিপথের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। আট দিন পর্যন্ত দুই পক্ষই নিশ্চেষ্ট বহিলেন। বাবরের কামানবাহিনী সম্মুখ দিক এবং অশ্ববাহিনী পার্শ্বদিক হইতে আক্রমণ করিল। প্রভাতে নয় ঘটিকাব সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দ্বিপ্রহরের পূর্বেই বাবরের গোলন্দাজবাহিনী ইব্রাহিমের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপুল ত্রাস সঞ্চার করিল। ইব্রাহিম লোদী বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন। পঞ্চদশ সহস্র আফঘান সৈন্যেব রক্তে পাণিপথের রণক্ষেত্র রঞ্জিত হইয়া গেল। রাজা বিক্রমজিৎ যথার্থ বাজপুতের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ইহাই ইতিহাস বিখ্যাত **পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ।** ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যুর পর আফঘান সৈন্য যুদ্ধেক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল, বিজয়ী বাবর অনায়াসেই দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া প্রভূত ধনরত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা লাভ কবেন। এইখানেই কোহ-ই-নুর হীরক হুমায়ুনের হস্তগত হইল।

ইব্রাহিম লোদীর রাজপুত বাহিনী সহ পাণিপথে উপস্থিতি

ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত

বাবরের পাণিপথ বিজয় ভারতে মুঘল রাজ্য স্থাপনের একটি সোপান

মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে ভারত বিজয় ছিল তখনও বহুদূরে। ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আফঘান সর্দারগণ তখনও অপরাজিত। তখন মধ্য-ভারতে রাজপুত জাতিও অনমনীয় ছিল। ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে দিল্লীর সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। ফলে সম্বল, মেওয়াট, বায়েনা, ধোলপুর, গোয়ালিয়র, কল্‌পী, এটাওয়া, বিহার এবং বাঙ্গলায় স্বাধীন আফঘান রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে বাবরের কয়েকজন অনুচর ভারতের উষ্ণ জলবায়ু অসহ্য বিবেচনা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বাবর নানা প্রকার অশুভ লক্ষণ সত্ত্বেও ধৈর্যচ্যুত বা নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি সদর্পে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি হিন্দুস্থান ত্যাগ করিবেন না; কাবুলের পরিবর্তে দিল্লী হইবে মুঘল রাজধানী।

বাবর পাণিপথ বিজয়ের পরেই হুমায়ুন ও খাজা কালানকে আগ্রা এবং অন্য একদল সৈন্যকে দিল্লী অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। বাবর ইতোমধ্যে আল্লার অনুগ্রহে কাফেরের দেশ বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মুসলিম ফকিরদের কবরতীর্থ পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। হুমায়ুন বাবরকে বিখ্যাত কোহ্-ই-নুর (কোহ্—পর্বত, নুর—আলো, কোহ-ই-নুর অর্থাৎ আলোর পর্বত) উপহার প্রদান করেন। পুত্রের ব্যবহারে প্রীত হইয়া বাবর নগদ সত্তর লক্ষ মুদ্রা (দাম) সহ সেই মূল্যবান হীরকখণ্ড হুমায়ুনকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বাবর হিন্দুস্থান বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক মুঘল আমীরকে ছয় হইতে দশ লক্ষ দাম পুরস্কার দিলেন। সৈন্য, পাইক, পিয়াদা, মশালচী, বাবুরচী, কেহই লুণ্ঠনের অংশ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বাবর ফরঘনা, খোরাসান, কাশগর, ইরাণের বন্ধুদিগের নিকট বহু স্বর্ণ-রৌপ্যখণ্ড এবং ভারতের দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী উপহার প্রেরণ করিলেন এবং ইসলামের বিজয় ঘোষণা করিয়া মক্কা, মদিনা, সমরখন্দ ও হিরাতে শ্রদ্ধার্ঘ প্রেরণ করিলেন। শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কাবুলের প্রত্যেক নরনারী একটি রৌপ্য মুদ্রা উপহার লাভ করিল। দিল্লী, আগ্রা ও গোয়ালিয়রের বহুযুগ-সঞ্চিত ধনরাশি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিলেন, লোকে বাবরকে "কালান্দর" বা ফকির বাদশাহ্ বলিয়া অভিনন্দিত করিল।

বাবরের তীর্থ পরিদর্শন

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ

ইহার পর হুমায়ুন জৌনপুর ও গাজীপুর অধিকার করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাবর গোয়ালিয়র অধিকার করিলেন। অন্যান্য মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষগণ এটাওয়া, কল্‌পী, ধোলপুর অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট রহিল পূর্ব-ভারতে অযোধ্যা-বিহার-বঙ্গের আফঘান শক্তি এবং মধ্য-ভারতে রাজপুত শক্তি।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রীঃ)ঃ চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ ধারণা

করিয়াছিলেন যে, বাবর তাঁহার পূর্ব-পুরুষ তৈমুরের মত দিল্লীর সুলতানকে পরাজিত করিবেন, দেশ লুণ্ঠন করিবেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন; তখন তিনি বিচূর্ণ ধ্বংসীভূত মুসলিম রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। রাণা সংগ্রামসিংহ ছিলেন রাজপুত কুলমণি। তিনি গুজরাট, ভিলসা, রণথম্বর ও চান্দেরী জয় করিয়া মধ্য-ভারতে রাজপুতদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

রাণা সংগ্রামসিংহের সহিত যুদ্ধের কারণ

পাণিপথ বিজয়ের পরে বাবর সংগ্রামসিংহের অগোচরে কল্পী ও বায়েনা অধিকার করিলেন। ইহাতে সংগ্রামসিংহ অসন্তুষ্ট হইলেন। তারপর তিনি শুনিলেন যে, বাবর হিন্দুস্থান ত্যাগ করিবেন না। এই সম্ভাবনায় বাধ্য হইয়া রাণা সংগ্রামসিংহ আগ্রার অদূরে বায়েনা আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন বায়সিনের সামন্ত সালেউদ্দীন, মেওয়াটের (আলোয়ার) ধর্মান্তরিত আমীর হাসান খান।

রাজপুত-আফঘান সম্মিলিত বাহিনী

রাজপুত-আফঘানদের যৌথবাহিনী আগ্রার আঠাশ ক্রোশ দূরে ভরতপুরের নিকটবর্তী পর্বতের সানুদেশে **খানুয়া** নামক স্থানে সম্মিলিত হইল।

মুঘল সৈন্য কর্তৃক হিন্দুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা

বাবর এইবার প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বিধর্মী কাফেরের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বাবর রাণা সংগ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদ্ বা ধর্মযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিলেন। সুরাপানকে তিনি ইসলাম-বিরোধী কর্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সমগ্র মুঘল শিবিরে সুরাপান নিষিদ্ধ হইল। স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতু নির্মিত সুরাপাত্র চূর্ণ করিয়া কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। মুসলমানদের উপর হইতে অবাঞ্ছিত "তামঘা কর" (stamp duty) রহিত হইল। মুঘল সৈন্য কোরাণ স্পর্শ করিয়া বাবরের প্রতি আনুগত্য ও হিন্দুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিল।

খানুয়ার যুদ্ধ

খানুয়ার রণাঙ্গনে বাবর ও সংগ্রামসিংহের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। বাবর পুনরায় পাণিপথের রণকৌশল অবলম্বন করিলেন। গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ রুমীখান প্রধানত কামানের সাহায্যে শত্রুসৈন্যের ব্যূহ ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। দশ ঘণ্টা যুদ্ধের পর রাণা সংগ্রামসিংহ আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। তাঁহার সম্মিলিত বাহিনী স্বদেশে, স্বস্থানে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইল (১৬।১৭ মার্চ, ১৫২৭ খ্রীঃ)।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাবর সগৌরবে মেওয়াটের রাজধানী আলোয়ারে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যা ভিন্ন প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত বাবরের ক্ষমতা স্বীকার করিল। খানুয়ার যুদ্ধ পাণিপথের পরিপূরক, ফলে অনুরূপ।

সংগ্রামসিংহের আত্মীয় মালবের রাজা মেদিনী রাও বিগত কয়েক

বৎসরের পরিস্থিতির সুযোগে বুন্দেলখণ্ড ও চান্দেরী (ভূপাল) দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; বাবরের কয়েকজন শত্রুকে দুর্গে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। পর বৎসর (১৫২৮ খ্রীঃ) বাবর মেদিনী রাওয়ের অধীনস্থ দুর্ভেদ্য চান্দেরীর দুর্গ অবরোধ করিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুঘলদিগের বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রাজপুতগণ দুর্গ মধ্যে অবস্থিত সমস্ত নারীদিগকে হত্যা করিল এবং শত্রুনিধন অথবা মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হইল। বন্দিত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়—এই ছিল রাজপুতদের সঙ্কল্প। রাজপুতগণ বাবরের বহু সৈন্য নিহত করিল কিন্তু মেদিনী রাও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার রাজপুত সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরে রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যু ঘটিল এবং রাজপুতগণের ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবনের আশাও চির-তরে বিলুপ্ত হইল। চান্দেরী জয়ের পরেই বাবর হুমায়ুনকে সুদূর উষ্ণ শুষ্ক বাদকসানে শাসনকর্তা রূপে প্রেরণ করেন।

চান্দেরী দুর্গ জয় (১৫২৮ খ্রীঃ)

রাজপুত শক্তি বিনষ্ট করিয়া এবার বাবর আফঘান গোষ্ঠীদের দমনের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। উত্তর ভারতে ইব্রাহিম লোদী, মধ্য ভারতে রাণা সংগ্রামসিংহ বিজিত হইলেও পূর্ব ভারতে আফঘান গোষ্ঠী তখনও মুঘল বীর বাবরকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করে নাই। অযোধ্যার বিখ্যাত আফঘান বীর মামুদ লোদী পরাজিত হইয়া বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদী খানুয়ার যুদ্ধের পরে বিহারে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বাবরের বিরুদ্ধে বেনারস পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বাবর ঘর্ঘরা ও গঙ্গার মিলন-স্থলে মামুদ লোদীকে পরাজিত করিলেন। বাহার খান লোদী প্রভৃতি কতিপয় আফঘান সর্দার বাবরের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাঙ্গলার সুলতান নসরৎ শাহ বাবরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। বাবর প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি নসরৎ শাহের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবেন না। নসরৎ শাহও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি বাবরের শত্রুকে আশ্রয় দান করিবেন না। ফলে বিহার অঞ্চলে মুঘল প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। বাঙ্গলা স্বাধীন রহিল। ঘর্ঘরার যুদ্ধই বাবরের জীবনে সর্বশেষ যুদ্ধ।

ঘর্ঘরার যুদ্ধ (৬ই মে, ১৫২৯ খ্রীঃ)

বাবরের শাসন-ব্যবস্থা : পাণিপথ বিজয়ের পরেই বাবর তাঁহার পারি-বারিক উপাধি 'মীর্জা' পরিত্যাগ করিয়া 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করিলেন। দিল্লীতে মুঘল অধিকৃত হিন্দুস্থানের রাজধানী স্থাপিত হইল। আগ্রা নগরীতে নূতন রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইল। শিক্রী, বায়েনা, ধোলপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে বহু নূতন প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মিত হইল। হিন্দুস্থানের দুরন্ত গ্রীষ্ম, অবাধ্য ধূলার ঝঞ্ঝা এবং অনমনীয় 'লু' বাতাস হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাবর বহু স্নানাগার,

বাবরের 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ

লতাগুল্ম বেষ্টিত প্রাচীর-উষ্ঠান, ধরিত্রী অভ্যন্তরে শীতল কক্ষ নির্মাণ আরম্ভ করেন; বিজিত ভূখণ্ড শাসনের উদ্দেশ্যে সামরিক শাসন প্রয়োগ করেন। শাসকগণ স্বীয় সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইলেন। বাবর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার ভাবপ্রবণতা রাজকোষকে একাধিকবার বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত বাবর অর্থ ভাণ্ডার পূরণের জন্য নবনিযুক্ত কর্মচারীর নিকট হইতে উপঢৌকন স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। কালক্রমে রাজ-কর্মচারীর পদ পণ্য দ্রব্যের পর্যায়ে পরিণত হইল। হুমায়ুন ইহাব কুফলভাগী হইয়াছিলেন।

সামরিক শাসন প্রবর্তন

শাসন-ব্যবস্থায় ত্রুটি

বাবরের ধর্ম ঃ বাবর সুন্নী মুসলমান হইলেও হিংস্র পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। প্রয়োজনের সময় বাবর পারস্যের সুন্নী-বিরোধী সাফাবী বংশীয় শিয়া সুলতানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বাবর দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, আজীবন যুদ্ধে সফলতাব জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেন, বিজয়লাভ করিলে আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে কোরাণ-নিষিদ্ধ সুরাপানের জন্য অনুশোচনা করিয়াছেন এবং আল্লার অনুগ্রহেব জন্য সুরা বর্জন করিয়াছেন। বিধর্মী হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিনি ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। খানুয়ার যুদ্ধের পর বিধর্মী হত্যা কবিয়া তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 'গাজী' বা বিধর্মী হন্তা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেদিনী রাও পরাজিত হইলে তিনি দুর্গবাসী নিরপরাধ হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়া আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি মুসলিম ফকিরের কবরে তীর্থযাত্রা করিয়া পুণ্য অর্জন কবিতেন। অযোধ্যা বিজয়ের পরে শ্রীরামচন্দ্রের বাসভূমি অযোধ্যার মন্দির ধ্বংস করেন এবং উহাব উপর মসজিদ নির্মাণ করেন। বাবর প্রার্থনায় বিশ্বাস করিতেন। কথিত আছে, হুমায়ুনের রোগশয্যার পার্শ্বে প্রার্থনা করিয়া পুত্রের রোগ নিজ শবীরে আনয়ন করেন। ধর্মের ব্যাপারে বাবর অবশ্য পূর্বগামী মুসলিম বিজেতাগণ অপেক্ষা উদার ছিলেন, কিন্তু তিনি সমসাময়িক মুসলিম ধর্ম ও চিন্তার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই।

বাবরের জীবনের শেষ বৎসর ও মৃত্যু ঃ ঘর্ঘরার যুদ্ধের পর বাবর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ হুমায়ুন একদা বাদশাহের বিনা অনুমতিতে বাদকসানের কার্যভার ত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাজনীতির বিচারে রাজার অনুমতি ভিন্ন শাসনকর্তার পক্ষে কর্মস্থল ত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, সুতরাং উজীর নিজামউদ্দীন খলিফা এই অপরাধে হুমায়ুনকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য

হুমায়ুনের কার্যভার ত্যাগে বাবরের বিরক্তি

বাবরকে পরামর্শ দিলেন। বাবরও হুমায়ুনের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখ দর্শন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বাবর অবিলম্বে তাঁহাকে পূর্বতন জায়গির সম্ভলে প্রেরণ করিলেন। সম্ভলে হুমায়ুন কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে স্নেহময় পিতা পুত্রের অসুস্থতায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে নৌকাযোগে আগ্রায় আনয়ন করেন। হুমায়ুনের সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হইল। কথিত আছে, বাবর তখন আবু কাআকা নামক একজন বিখ্যাত ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, ফকির আবু কাআকা উপদেশ দিলেন—হুমায়ুনের সর্বোত্তম সম্পদ আল্লার নামে উৎসর্গ করিলে হুমায়ুন নিরাময় হইবে। বাবর বলিলেন হুমায়ুনের সর্বোত্তম সম্পদ তাঁহার পিতা বাবর; সুতরাং বাবর পুত্রের জন্ম নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। ইহার পর পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে হুমায়ুন নিরাময় হইলেন, বাবরের দেহে হুমায়ুনের রোগ সংক্রমিত হইল। বাবর মৃত্যুশয্যায় নিজামউদ্দীন খলিফার প্রতিবাদ সত্ত্বেও হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাবরের শেষ উপদেশ ছিল কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের রাজ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিবে না। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর বাবর স্বস্তির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাবরের কর্মময় জীবনের অবসান হইল। বাবরের মৃতদেহ প্রথমে আগ্রার উদ্যান আরামবাগে সমাধিস্থ করা হয়, পরে অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী কাবুলে বাবরের পরিকল্পিত মনোরম উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধিক্ষেত্র নির্বাচনেও বাবরের সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ এবং প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসন দান

বাবেবে মৃত্যু

পুরুষসিংহ বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর এক অপূর্ব চরিত্র। কৈশোরে পিতৃহীন, মধ্যজীবনে রাজ্যহীন, শেষ জীবনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা—বাবর ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বাবর দোষে-গুণে মানুষ ছিলেন; তাঁহার দোষ ছিল শত, গুণ ছিল সহস্র। বাবর তাঁহার মাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, মাতামহী ও মাতামহকে ভালবাসিতেন, কিন্তু পিতার উল্লেখে অনেক সময় পরিহাস করিয়াছেন। তাঁহার বহু পত্নী ছিল। পত্নীদের প্রতি তিনি প্রীতিমান্ ছিলেন। বাল্যবন্ধু, যৌবনের সহচর, কর্মজীবনের অনুচরদের প্রতি বাবরের প্রবল আকর্ষণ ছিল। প্রথম জীবনে অন্যান্য মীর্জাদের ন্যায় তিনি সুরাসক্ত ছিলেন, তাঁহার মানসিক শক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া খানুয়ার যুদ্ধের পূর্ব দিবসে চিরজীবনের সুরাপান অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। মানসিক শক্তির অনুরূপ ছিল তাঁহার দৈহিক শক্তি। তিনি ত্রিশ ঘণ্টা অবিরাম অশ্ব-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়াছেন, পথিমধ্যে দুইবার নদী সন্তরণ করিয়াছেন। তিনি দুই কক্ষ মধ্যে দুইটি মানুষকে নিবদ্ধ করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন। বাবরের

বাবরের আত্মবিশ্বাস

দেহে ক্লান্তি-বোধ ছিল না। কোন বিফলতাই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। আশা ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস ছিল তাঁহার সকল কর্মের প্রেরণা, বাহিরে তাঁহার কর্ম-চাঞ্চল্য ছিল যথেষ্ট ; ভাব-প্রবণতা ছিল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনের পান-পাত্র তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছেন—যুদ্ধান্তে দিবস শেষে চন্দ্রালোকে মুক্ত নীলাকাশের নীচে বন্ধুবান্ধবসহ কাব্য, সংগীত ও সুরার সম্মেলনে সমবেত হইতেন ; বন্ধুগণ প্রত্যেকে স্বরচিত অথবা কোন বিখ্যাত কবি রচিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন। সম্মেলনের অন্তে বাবর বন্ধুদিগকে কবিতার সৌন্দর্য অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের সুরা পরিবেশনে সম্মানিত করিতেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করিতেন। রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সৈন্য-শিবির বাবরের অধিকতর প্রিয় ছিল।

কাব্য ও কবিতা বাবরকে আনন্দ দিত। বাবরের তুর্কী রচনা ছিল সাবলীল ও নির্ভুল। তাঁহার রচিত আত্মজীবনী বা 'তুজুক' সমগ্র জীবনী-সাহিত্যের অপরূপ সম্পদ। নির্ভীকতা, গোপনহীনতা, সত্য সংবাদ পরিবেশন, প্রকৃতির প্রতি আবেদন এবং ভাষার সাবলীলতা বাবরের আত্মজীবনীকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে আত্মপ্রচারের কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার রচিত তুর্কী কবিতা (দিওয়ান) অদ্যাপি তুর্কী কাব্য-রসিকদের চিত্ত বিনোদন করে। পারস্য ভাষায় বাবর 'রুবাইয়াৎ' নামক একপ্রকার নূতন ছন্দ আবিষ্কার করেন। একদিকে শিল্প, সংগীত ও সুরা বাবরকে আনন্দ দিত, অন্যদিকে যুদ্ধসজ্জা, রণবাদ্য ও শত্রুর রক্তস্রোত বাবরের রক্তধারা চঞ্চল করিয়া তুলিত। বাবরের চরিত্রে দুইটি বিভিন্ন ধারার সম্মেলন সত্যই অপূর্ব।

বাবরের সাহিত্যানুরাগ : 'জীবন-স্মৃতি' রচনা

বাবর ছিলেন যোদ্ধ পরিবারের সন্তান, জন্মে সৈনিক, সৈনিকের রক্তধারা তাঁহার রক্তস্রোতে নিত্যপ্রবাহিত। তাঁহার প্রতি শিরা-উপশিরা ছিল মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস এবং তুর্কী বীর তৈমুরের রক্তধারায় উদ্বেলিত। মৃত্যুর সঙ্গে ছিল তাঁহার চিরবান্ধবতা ; মৃত্যুই যেন তাঁহাকে বহুবার অনুগ্রহ করিয়া জীবন দান করিয়াছিল। যুদ্ধে বহুবার মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তৎক্ষণাৎ নূতন আগ্রহে জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। সৈন্যদিগকে বিপদের সম্মুখে ফেলিয়া বাবর স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য নিরাপদ আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেন নাই। বিনিদ্র ও বিশ্রামহীন জীবন সৈন্যদের সঙ্গে বাবরও সমভাবে ভোগ করিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনের মত সৈন্যদের জীবনও মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। সেই জন্য অনুচরগণ বাবরকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং প্রভুর জন্য যে-কোন দুঃখ-দৈন্য অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিত। বাবর অবশ্য পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস, তৈমুর অথবা সমসাময়িক রাণা সংগ্রামের মত সুনিপুণ রণনেতা ছিলেন না। ফরঘনা, সমরখন্দ, উজবেকিস্থানের আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে বাবর বিশেষ রণকৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে বাবর তুর্কী গোলন্দাজ মুস্তাফা

রুমী ও আলী খানের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখনও গোলা, বারুদ, কামান আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ যুদ্ধ করিত, যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তখনও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। যুদ্ধ জয়ের জন্য বাবর বহুবার শত্রুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পাণিপথের যুদ্ধের পশ্চাতে তাঁহার রণকৌশল, রণ-সম্ভার এবং শত্রুমধ্যে বিভেদ নীতি সমভাবে কাজ করিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে বিজয়ী না হইলে বাবরের নাম এশিয়ার ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। সৈনিকরূপে বাবরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি পাণিপথ ও খানুয়া বিজয়; ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বাবর পথপ্রদর্শক মাত্র। বাবর ভারতবর্ষে কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই, অবশ্য সে সময়ও তাঁহার ছিল না। বাবরের রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছিল। আকবরের আবির্ভাব না হইলে ঐতিহাসিকগণ বাবরকে তরমিসরী খানের মত একজন আক্রমণকারিরূপে উল্লেখমাত্র করিয়া তাঁহার কাহিনী সমাপ্ত করিতেন। হুমায়ুনের প্রতি ভ্রাতাদের জন্য রাজ্যাংশ বণ্টনের নির্দেশ দান করিয়া বাবর হুমায়ুনের পরাজয় এবং পরবর্তিকালে রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ভাগ্যবিড়ম্বিত হুমায়ুন

(১৫৩০-১৫৪০ খ্রীঃ, ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রীঃ)

জন্ম ও বাল্য-পরিচয়ঃ হুমায়ুনের পিতা বাবর, মাতা মাহাম বেগম; হুমায়ুনের নাম নাসীরউদ্দীন হুমায়ুন। শৈশবে পিতার শিক্ষা-ব্যবস্থায় হুমায়ুন পিতৃভাষা তুর্কী, মাতৃভাষা ফার্সী এবং ধর্মের ভাষা আরবী শিক্ষা করেন। তিনি বোধ হয় ভারত বিজয়ের পরে হিন্দুস্থানী ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পিতার সঙ্গে কৈশোর হইতেই সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিশ বৎসর বয়সে হুমায়ুন প্রথমে বাদকসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাণিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সামরিক শৌর্যের পরিচয় দান করেন। ১৫২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধের পর হুমায়ুন শাসনকর্তারূপে বাদকসানে গমন করেন। দুই বৎসর পর তিনি বাদশাহের অনুমতি ব্যতিরেকে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। পূর্বেই উজীর নিজামউদ্দীন খলিফা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বাবরকে

বাবর কর্তৃক হুমায়ুন উত্তরাধিকারী মনোনীত

প্ররোচিত করেন এবং হুমায়ুনের পরিবর্তে বাবরের ভগ্নীপতী মাহাদী খাজাকে দিল্লীর সিংহাসন দানের প্রস্তাব করেন, বাবর সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। বাবর মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুনকে দিল্লীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বাবরের সর্বশেষ নির্দেশ ছিল—হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা কামরাণ, আসকারী এবং হিন্দালকে রাজ্যাংশ প্রদান করিবেন।

পিতার মৃত্যুর পরে হুমায়ুন বিনা যুদ্ধে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। সিংহাসনের পথে কণ্টক ছিল না, কিন্তু চতুষ্পার্শে—নিকটে ও দূরে বহু কণ্টক ছিল। বাবর পশ্চিমে কাবুল, বাল্খ, বাদকসান হইতে পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুশৃঙ্খল শাসনপদ্ধতি বা শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারেন নাই।

ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মুহম্মদ লোদী তখনও মুঘল হস্ত হইতে আফঘান সাম্রাজ্য পুনরাধিকারের প্রয়াস ত্যাগ করেন নাই। সাসারামের জায়গিরদার-পুত্র শের খান বাঙ্গলা ও বিহারে বিচ্ছিন্ন আফঘান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বাঙ্গলার আফঘান সুলতান নসরৎ শাহ আফঘান জাতির পুনরুত্থানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। আলম খান লোদী বাবরকে ভারতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাবর কর্তৃক ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের পরে আলম খান গুজরাটে বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের প্রবল শত্রু ছিলেন তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ মীর্জা গোষ্ঠী। হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি মুহম্মদ জামান মীর্জা, তৈমুর বংশধর মীর্জা মুহম্মদ সুলতান, বাবরের ভগ্নীপতি মীর্জা মাহাদী খাজা প্রভৃতি অনেকেরই বাবরের বিজিত ভূখণ্ডের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি ছিল।

হুমায়ুনের প্রাথমিক অসুবিধা

বাবরের দ্বিতীয় পুত্র কামরাণ ছিলেন কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা; দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল প্রচুর। আসকারী এবং হিন্দাল ছিলেন অপরিণত, স্বল্পবুদ্ধি, কলহপ্রিয়, অথচ উচ্চাভিলাষী, সুতরাং তাঁহারা ছিলেন কূটবুদ্ধি আমীরদের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ।

হুমায়ুন নিজেই ছিলেন নিজের প্রধান শত্রু। নববিজিত শত্রুপরিবৃত বিচ্ছিন্ন শিশু রাজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কূটনীতিজ্ঞ শাসকের। মাত্র বাইশ বৎসর বয়স্ক অনভিজ্ঞ হুমায়ুন তাঁহার পরিবেশের জটিলতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল না, চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না। তাঁহার সামরিক প্রতিভাও অহিফেনের প্রভাবে কর্পূরের মত ক্ষীয়মাণ হইয়া গিয়াছিল।

হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

হুমায়ুন প্রথমেই তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া রাজ্যের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিলেন। ভ্রাতা কামরাণের অংশে কাবুল ও কান্দাহার, আসকারীর অংশে সম্ভল এবং হিন্দালের অংশে পড়িল মেওয়াট (আলোয়ার), গুরগাঁও (পূর্ব-দক্ষিণ পঞ্জাব) ও মথুরা। জ্ঞাতিভ্রাতা সুলেমান মীর্জা বাদকসানের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। কামরাণ কাবুল হইতে পঞ্জাব এবং হিসার-ই-ফিরুজ পর্যন্ত

হুমায়ুনের ভ্রাতৃপ্রীতি

ভূখণ্ডে তাঁহার অধিকার বিস্তার করিলেন। কাবুল, কান্দাহার, পঞ্জাব হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে হুমায়ুনের পক্ষে বহিরাগত নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িল। হিসার-ই-ফিরুজ হস্তান্তরের ফলে পঞ্জাব ও দিল্লীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি পিতৃবন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের সন্তুষ্টির জন্য প্রায় প্রত্যেকের জায়গিরের সীমা বৃদ্ধি করিলেন—ফলে প্রকৃত সাম্রাজ্যের সীমা সংকীর্ণ হইয়া গেল—হুমায়ুনের রাজত্বের ব্যর্থতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গেল।

হুমায়ুনের বিপত্তি

হুমায়ুনের শাসনকাল : ১৫৩০ হইতে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর যাবৎ হুমায়ুনের শাসনকাল ছিল ঘটনাবহুল। ঘটনার চাকচিক্য ছিল না, অথচ গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট—১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অভিযান, ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের মামুদ লোদীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান, ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে শের খানের বিরুদ্ধে চুণার দুর্গ অবরোধ, শেরখান কর্তৃক মৌখিক বশ্যতা স্বীকার ও হুমায়ুনের আগ্রা প্রত্যাবর্তন। ১৫৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন নিজের পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সুতরাং চারিদিকে যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ইন্ধন সঞ্চিত হইতেছিল, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া দিল্লীতে বন্ধুবান্ধব সহ আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইয়া রহিলেন। এদিকে তিনি দিল্লীর অদূরে দীন-পানাহ্ (ধর্মের আশ্রয়)) নামক নূতন নগর নির্মাণ আরম্ভ করিলেন, অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে শের খান বাঙ্গলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাহাদুর শাহ গুজরাটে দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

হুমায়ুন এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহ : মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের সুযোগে বাহাদুর শাহ ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মালব, ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাইসিন দুর্গ অধিকার করিয়া চিতোরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। চিতোরের রাজমাতা কর্ণাবতী এই বিপদে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনকে ভ্রাতা সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট ভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ রাখী প্রেরণ করিলেন এবং বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন রাখী গ্রহণ করিয়া রাজপুত-রমণীকে ভগ্নীর সম্মান দান করিলেন এবং চিতোরের সাহায্যের জন্য সসৈন্যে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কাযকালে 'রাখীবদ্ধ ভাই' হুমায়ুন মুসলিম সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে কাফের 'রাখীবদ্ধ ভগ্নীর' রক্ষার জন্য সাহায্য করেন নাই। হুমায়ুন এইখানে মারাত্মক ভুল করিলেন, তিনি চিতোরের ধর্মভগ্নীকে সাহায্য করিলে হয়ত রাজপুতদের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন এবং হয়ত বা শের শাহের বিরুদ্ধেও সফলতা লাভ করিতে পারিতেন। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ তুর্কী সেনাপতি রুমী খান ও পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সহায়তায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধের সময় চিতোরের প্রান্তদেশে হুমায়ুন নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে অবস্থান

বাহাদুর শাহের চিতোর আক্রমণ

করিলেন। চিতোরের পতন হইল। রাজপুত নারীগণ শত্রুহস্তে অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। জহর ব্রতের অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিয়া রাজপুত নারী আত্মসম্মান রক্ষা করিলেন।

চিতোরের পতনের পরে হুমায়ুন তাঁহার স্বধর্মী বাহাদুর শাহকে মান্দাশোরের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। বাহাদুর শাহ মাণ্ডু হইতে চম্পানীর, আহমদাবাদ ও কাম্বের পথে পলায়ন করিয়া পরিশেষে দিউ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়ের মুহূর্তে হুমায়ুনের স্বরূপ প্রকাশ পাইল। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া হুমায়ুন বিজয় উৎসবের তরল আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা আসকারীকে আহমদাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। আসকারী স্বীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। বাহাদুর শাহ এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া দিউ দ্বীপ হইতে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুমায়ুনেব বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই সংকটেব মুহূর্তে হুমায়ুন অকস্মাৎ সংবাদ শুনিলেন যে, শের খান বিহারে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন, সুতরাং পরিস্থিতি আরও জটিল হইল। হুমায়ুন গুজরাট ত্যাগ করিয়া বিহারের দিকে যাত্রা করিলেন। হুমায়ুনের অনুপস্থিতিতে বাহাদুর শাহ গুজরাট ও মালব পুনরুদ্ধার করিলেন। অবশ্য ইহাব কিছুকাল পরেই বাহাদুর শাহ পর্তুগীজদের হস্তে নিহত হইলেন। কিন্তু বিহার ও বাঙ্গলায় শেব খানের শক্তি ঐ সময়ে এতদূব বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, হুমায়ুনের পক্ষে গুজবাটে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।

বাহাদুর শাহের সহিত হুমায়ুনের সংঘর্ষ

হুমায়ুনের সামরিক সাফল্য

বাহাদুর শাহ কর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার

হুমায়ুন এবং শের খান ঃ বাবর ভাবতে আফঘান শক্তি পঙ্গু করিয়াছিলেন কিন্তু নিশ্চিহ্ন করিবার মত সময় তাঁহাব ছিল না। পশ্চিম প্রান্তে গুজবাটে বাহাদুর শাহ এবং পূর্ব প্রান্তে বাঙ্গলায় নসরৎ শাহ বাবরেব শক্তিকে তাঁহাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিতে দেন নাই। বাবরের উত্তরাধিকারিরূপে হুমায়ুন এই দুই শক্তিকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দ্বৈধী ভাবের জন্যই তিনি গুজরাটে বাহাদুর শাহের যুদ্ধ অসমাপ্ত রাখিয়া সুদূর বাঙ্গলা দেশে শের খানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দীর্ঘকাল চুণার দুর্গ অবরোধ, বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়ে ছয় মাস বিলাস-বিভ্রমে সময় যাপন, চৌসার যুদ্ধের পূর্বে শের খানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন এবং শের খানের কূটনীতির গতি অনুধাবনের অক্ষমতা—শের খানের নিকট হুমায়ুনের পরাজয়ের প্রধান কারণ। কনৌজের যুদ্ধ চৌসার যুদ্ধেরই পরিণতি। হুমায়ুন কোন দিক দিয়াই শের শাহের সমকক্ষ ছিলেন না; বাবরও যদি শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেন, তবে কাহার পরাজয় হইত বলা কঠিন। হুমায়ুনের কনৌজে পরাজয়ের পরে যদি তাঁহারা তিন ভ্রাতা সমবেত ভাবে শের শাহের বিরোধিতা

হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ

করিতেন, হুমায়ুন অন্তত মুঘল শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারিতেন। একদিকে শের শাহের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সামরিক কুশলতা এবং শুভগ্রহ; অন্যদিকে হুমায়ুনের চরিত্রের শিথিলতা সমভাবে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ।

ভ্রাতা ও বন্ধুদের নিকট আশ্রয়লাভে বিফল হইয়া হুমায়ুন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইলেন। সিন্ধুর সুলতান শাহ হুসেন তাঁহার বিরোধিতা করিলেন। হুমায়ুন এই সময় হিন্দালের সুফী গুরু মীর্জা আকবর জামীর সুন্দরী কিশোরী কন্যা হামিদাবানুকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ব্যাপারে হিন্দাল অসন্তুষ্ট হইলেন।

আশ্রয়-সন্ধানে হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তর গমন

হুমায়ুন পারস্যের পথে অমরকোটে রাণা বীরশালের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কারণ তখন তাঁহার পত্নী হামিদাবানু বেগম আসন্ন প্রসবা। হিন্দু রাজা রাজ্যহীন বিপন্ন মুসলিম বাদশাহকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমরকোটেই হিন্দুর গৃহে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে (২০শে নভেম্বর) হুমায়ুনের পুত্র আকবর ভূমিষ্ঠ হইলেন। শেষ পর্যন্ত বীরশালের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় হুমায়ুন সিন্ধু ত্যাগ করিয়া কান্দাহারে আসকারীর নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। এই সুযোগে আসকারী ভ্রাতার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিলেন। তখন হুমায়ুন পারস্যের তরুণ সুলতান শাহ তাহমাস্পের নিকট উপস্থিত হইলেন। শাহ তাহমাস্প হুমায়ুনকে চতুর্দশ সহস্র সৈন্য সাহায্যের-প্রতিশ্রুতি দান করেন। শর্ত হইল, হুমায়ুন শিয়া মতবাদ গ্রহণ করিবেন এবং কান্দাহার বিজিত হইলে পারস্যের হস্তে উহা প্রত্যর্পণ করিবেন।

হামিদাবানুর সহিত হুমায়ুনের বিবাহ

অমরকোটে আশ্রয়-লাভ : আকবরের জন্ম

পারস্য সম্রাট তাহমাস্পের সহায়তা লাভ

এই সৈন্যসাহায্যে হুমায়ুন ভ্রাতা কামরাণকে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন (১৫৪৫ খ্রীঃ); কিন্তু পারস্যরাজের হস্তে কান্দাহার সমর্পণ করেন নাই। পরাজিত কামরাণের চক্ষু উৎপাটন করিয়া হুমায়ুন তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। আসকারীও মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দাল একদা নৈশ আক্রমণের সময় পরলোক যাত্রা করিলেন। হুমায়ুন ভ্রাতৃকণ্টক হইতে নিষ্কণ্টক হইলেন। এই সময়ে শূর বংশের গৌরব-দীপশিখা নির্বাণোন্মুখ।

কাবুল ও কান্দাহার জয়

মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা : শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অযোগ্যতা ও আত্মকলহের সুযোগে হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দর শাহ শূরকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিলেন। এইভাবে জীবনের শেষ দিকে তিনি তাঁহার হৃত সাম্রাজ্যের কতকাংশ পুনরধিকার করিয়া মুঘল প্রাধান্যের সূত্রপাত করিলেন। কিন্তু ইহার দশ মাস পরেই পাঠাগারের সোপান হইতে পদস্খলনে হুমায়ুনের মৃত্যু হয় (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হুমায়ুনের মৃত্যু

হুমায়ুনের ধর্ম ঃ ধর্মে হুমায়ুন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম ছিলেন; প্রতিদিন তিনি পাঁচবার নমাজ পড়িতেন; তিনি ফকিরের সমাধিতে তীর্থযাত্রা করিতেন। তাঁহার পিতা বাবর ছিলেন সুন্নী, পত্নী হামিদাবানু ছিলেন শিয়া, তাঁহার বন্ধু ও ভগ্নীপতি বৈরাম খানও ছিলেন শিয়া। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্য-সুলতানের প্রেরণায় শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি শিয়াদের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন এবং শিয়াদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। হুমায়ুন প্রকাশ্যে কাফের বিদ্বেষী না হইলেও কালিঞ্জরের বিখ্যাত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; তিনি নিয়মিত জিজিয়া কর, তীর্থস্নান কর, কেশমুণ্ডন কর আদায় করিতেন। রাণী কর্ণাবতীর সহিত রাখীবন্ধন ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও বিপদ কালে ভগ্নীর সাহায্যার্থে অগ্রগামী হইয়াও শেষ পর্যন্ত গুজরাটের স্বধর্মী মুসলিম সুলতানের বিরুদ্ধে বিধর্মী হিন্দুকে সাহায্য করেন নাই। হুমায়ুন জীবনের বহুক্ষেত্রেই অব্যবস্থিত চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন।*

হুমায়ুনের শিয়া মতবাদ গ্রহণ

হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ হুমায়ুনের পিতা ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর বাবর, মাতা ছিলেন পারস্য দেশীয়া কমনীয়া মাহাম বেগম। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন পিতার নির্দেশ পালন করিতে ত্রুটি করেন নাই। হুমায়ুন মাত্র একবার পিতার বিনানুমতিতে বাদকসান হইতে কার্য ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। মাতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। পিতার নির্দেশ অনুযায়ী হুমায়ুন বিরুদ্ধাচারী ভ্রাতা কামরাণ, আসকারী এবং হিন্দালকে রাজ্যখণ্ড বণ্টন করিয়া দিলেন। এই রাজ্য বণ্টনই হুমায়ুনের জীবনে একাধিক বিপদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কারণ। হুমায়ুনের বহু পত্নী ছিল। সাধারণ ভাবে তিনি পত্নীদের প্রতি প্রীতিমান্ ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুপ্রীতি হুমায়ুনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞাতি ভ্রাতা জামান মীর্জা এবং সুলতান মীর্জাকে বিদ্রোহের অপরাধ সত্ত্বেও একাধিকবার ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পিতার মত হুমায়ুনও কর্মচারী, সৈনিক ও অনুচরবর্গের সঙ্গে সমভাবে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। পিতা যেমন ফরঘণা ও সমরখন্দ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দশ বৎসর যাযাবরের মত জীবন যাপন করিয়াছেন,

হুমায়ুনের মাতৃভক্তি

পিতার নির্দেশে ভ্রাতাদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন

পিতা-পুত্রের চরিত্রের সাদৃশ্য

* ভূপাল হইতে প্রচারিত একখানি ফারমানে উল্লেখ আছে যে বাবর তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশে গোহত্যা করিয়া হিন্দুর মনে ব্যথা দিতে নিষেধ করেন, কারণ হিন্দুর সঙ্গে সদ্ভাব না রাখিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বর্তমান ঐতিহাসিকগণ বলেন—'এই ফারমান সন্দেহজনক'।

হুমায়ুনও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দশ বৎসর ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত বাবর কাবুল ও ভারতবর্ষ বিজয় করেন, হুমায়ুনও কাবুল এবং ভারতবর্ষ জয় করিয়া পিতার আশা পূর্ণ করেন।

হুমায়ুনের পাণ্ডিত্য

হুমায়ুনও পিতার ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী এবং গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার রচনা ছিল শব্দবহুল এবং অলংকারপুষ্ট; তিনি প্রায়ই দ্ব্যর্থক ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রচনায় বানান ভুল এবং তাঁহার কবিতার মধ্যে ছন্দপতন ছিল বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সামাজিক ব্যবহারে হুমায়ুন ছিলেন মার্জিত ও ভদ্র এবং আলাপে মিষ্টভাষী। তাঁহার দানশীলতা ও উদারতা বন্ধুবান্ধবদিগকে যথেষ্ট আকর্ষণ করিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী হুমায়ুন

মুসলিম দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি প্রায়ই গ্রহ-নক্ষত্রের গতি অনুসারে জীবনযাত্রা চালিত করিতেন এবং গণক ও জ্যোতিবিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি সপ্তাহের সাত দিনে সাত প্রকারের বিভিন্ন বর্ণ-বিশিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতেন, যেমন—রবিবারের অধিপতি রবি বা সূর্য; সূর্যের প্রিয় বর্ণ ছিল হরিদ্রাবর্ণ; সুতরাং হুমায়ুন রবিবারে হরিদ্রাবর্ণ ভূষণ ব্যবহার করিতেন, তেমনি শনিবারে শনিগ্রহের প্রিয় কৃষ্ণবর্ণ ভূষণ এবং সোমবারে গ্রহপতির চন্দ্রের প্রিয় শ্বেতভূষণ ব্যবহার করিতেন, ইত্যাদি। তিনি দরবারের পার্শ্বে একটি প্রাসাদে সাতটি কক্ষ নির্মাণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেকটি কক্ষের বর্ণ ছিল বিভিন্ন; তাঁহার কর্মচারীদের সঙ্গে তাহাদের কর্মানুযায়ী সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন কক্ষে সাক্ষাৎ করিতেন, যথা—সৈনিক বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে শুক্রবারে রক্তবর্ণ কক্ষে রক্ত ভূষণ পরিধান করিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, কারণ শুক্রবারের অধিপতি শুক্রগ্রহ, শুক্রগ্রহের প্রিয় বর্ণ ছিল রক্তবর্ণ। এইগুলি ছিল হুমায়ুনের অদ্ভুত খেয়াল।

হুমায়ুনের সাপ্তাহিক কর্ম সূচী

চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী

ব্যক্তিগত জীবনে হুমায়ুন ভ্রাতৃবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের প্রথম বাইশ বৎসর পিতার সহিত মুঘল সৈন্যের পার্শ্বরক্ষা করিয়াছেন, পাণিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে হুমায়ুন অনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন না, ভীরুও ছিলেন না, যুদ্ধে প্রাণ বিপন্ন করিতেও তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না; সৈন্যদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে অস্বীকার করেন নাই। কৃতজ্ঞতাবশত হুমায়ুন ভিস্তি-ওয়ালা নিজামকে একদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। অবশ্য পিতার মত তাঁহার ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি ছিল না। তিনি অনুচরদিগের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বাবরের মত

হুমায়ুনের কৃতজ্ঞতা

তাঁহার অধ্যবসায় বা অনলস কর্মপ্রচেষ্টা ছিল না। কার্যের প্রারম্ভে হুমায়ুনের বিপুল উৎসাহ ছিল। মধ্যভাগে হঠাৎ বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা ও বিলাস-ব্যসন তাঁহার সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ পঙ্গু করিয়া দিত। এইভাবে তিনি গুজরাট

অস্থিরমতি হুমায়ুন

অভিযানের পর এবং বাঙ্গলার গৌড় অধিকার করিয়া বিলাস-উৎসবে অত্যন্ত মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছিলেন। কার্যশেষে অবসাদ হুমায়ুনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিত এবং হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমসাময়িক শের শাহের মত তিনি কিন্তু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, বিচক্ষণ সৈন্যাধ্যক্ষ অথবা সুনিপুণ শাসক ছিলেন না।

শাসকরূপে হুমায়ুন প্রথমে ১৫৩০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর এবং শেষে ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দশ মাস হিন্দুস্থান শাসন করেন। গুজরাট, রাজপুতানা, বিহার এবং বাঙ্গলার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর যুদ্ধ করিয়াছেন। ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে দশ বৎসরে হুমায়ুন অনেক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন

শাসন কার্যে হুমায়ুনের বিফলতা

করিতে পারিতেন। শের শাহ পাঁচ বৎসরেই একটি নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় বার রাজ্যলাভের পরে শের শাহের অনুকরণ করিয়া হুমায়ুন পুরাতন ব্যবস্থা নূতনভাবে প্রবর্তন করিতে পারিতেন; কিন্তু শাসন প্রবর্তন করার মত দূরদৃষ্টি, বুদ্ধি ও উৎসাহ তাঁহার ছিল না।

হুমায়ুন দরবারে সম্ভ্রান্তদের মধ্যে তিনটি বিভাগ প্রবর্তন করেন, যথা—

দরবারে সম্ভ্রান্তদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ

আমীর, উলামা এবং ইয়ার বা সখা। অবশ্য এই শ্রেণী-বিভাগের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার শাসন সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনা ছিল না, দায়িত্ব-জ্ঞানও ছিল না। পরিকল্পনা করিলেও কার্যকরী করিবার মত ধৈর্য ও নিষ্ঠা তাঁহার ছিল না।

অহিফেনসেবী হুমায়ুন

জীবনের শেষভাগে হুমায়ুন অত্যন্ত অহিফেন ভক্ত হইয়াছিলেন। অহিফেন হুমায়ুনের সমস্ত শক্তিকে ধূমে পরিণত করিয়াছিল। তিনি 'অহিফেন সেবীর স্বর্ণ স্বর্গ' স্বপ্ন দেখিতেন।

'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ ভাগ্যবান। বাস্তবিক তিনি ভাগ্যবান; কারণ তিনি

ভাগ্যহীন হুমায়ুন

ছিলেন বাবরের পুত্র এবং আকবরের পিতা। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত ভাগ্যহীন, জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি বিফল। জীবনে বহুবার তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল। এমন কি জীবনের শেষ দিনেও পদস্খলনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(*শূরবংশ—১৫৪০-১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)

শূর-শ্রেষ্ঠ শের শাহ

বংশ পরিচয়ঃ শের শাহ ছিলেন জাতিতে পাঠান, বংশে শূর, জন্মে হিন্দুস্থানী। শের শাহের পিতৃদত্ত নাম ছিল ফরিদ (মাণমুক্তা), ব্যাঘ্রহন্তা-রূপে বাহার খান লোহানীর প্রদত্ত নাম ছিল শের খান, চুণারের দুর্গাধিপতি-রূপে তাঁহার পরিচয় ছিল হজরত-ই-আলা; দিল্লীর অধিপতিরূপে তাঁহার স্বয়ং-গৃহীত উপাধি ছিল 'শের শাহ'। এই পাঠান বীরের কাহিনী মুঘল বীর বাবরের জীবন-কাহিনীর মত চমকপ্রদ।

তাঁহার পিতামহ ছিলেন ইব্রাহিম শূর, পিতা ছিলেন হাসান খান শূর। ইব্রাহিম শূর কর্মের সন্ধানে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাহলুল লোদীর সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্তা জামাল খানের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। ফরিদ খান এই সময়ে ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৮৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সেকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে জামাল খান জৌনপুরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে হাসান খান শূর বিহারের অন্তর্গত সাসারামে জায়গির পদ লাভ করেন।

পিতৃ পরিচয়

শের শাহের মাতা ছিলেন হাসান শূরের চারি পত্নীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা, শের শাহ ছিলেন হাসান খান শূরের অষ্ট পুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। হাসানের

*শূর বংশ পরিচয়

ইব্রাহিম খান
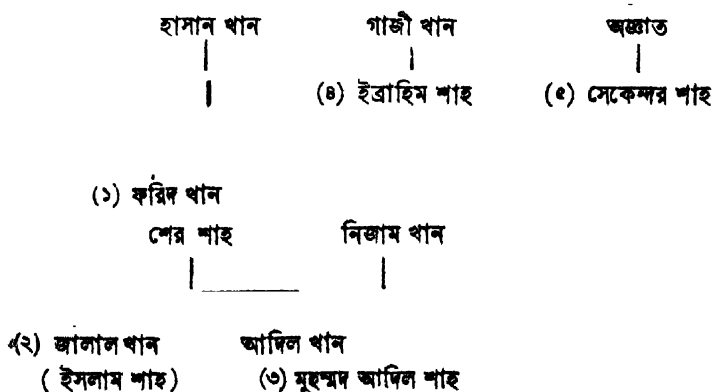
প্রিয়তমা কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন বোধ হয় ধর্মান্তরিতা হিন্দু নর্তকী। ফরিদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার জন্য হাসান খান পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ কনিষ্ঠা পত্নীকে ঈর্ষান্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বিমাতার তিক্ত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাইশ বৎসর বয়সে ফরিদ খান সাসারাম ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে পিতার পৃষ্ঠপোষক জামাল খানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সামান্য সৈনিকের কার্য গ্রহণ করিলেন। সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ফরিদ খান ইসলামের ইতিহাস, আরবী ও ফার্সী ভাষা এবং সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। 'তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। বিখ্যাত ফার্সী কবি সাদীর রচিত গুলিস্তাঁ ও বুলিস্তাঁ কাব্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার প্রিয় পুস্তক ছিল 'সেকেন্দরনামা' নামক ইতিহাস। তাহার রচনাবলী দ্বারা অচিরকাল মধ্যে ফরিদ প্রভু জামাল খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জামাল খানের মধ্যস্থতায় পুত্রের গুণাবলী শ্রবণে প্রীত হইয়া পিতা হাসান পুত্রকে তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফরিদ খান পিতার জায়গিরের কর্মকর্তারূপে স্থানীয় শাসন ও ভূমি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং জায়গিরের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন।

বাল্যজীবন

শিক্ষাকাল

সাসারামের প্রজাবর্গ ফরিদ খানের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। ফলে বিমাতার বিরক্তি আরও তিক্ততর হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদ পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর শরণাপন্ন হইলেন। অচিরকাল মধ্যে হাসান খানের মৃত্যু হইলে ইব্রাহিম লোদী সাসারামের জায়গির ফরিদ খানের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ফরিদ খান স্থায়িভাবে সাসারামে বসবাস আরম্ভ করিলেন।

সাসারামের শাসনকার্যে পারদর্শিতা

কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুদ খান জায়গির বণ্টন উপলক্ষ্য করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন। ফরিদ খান পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা বাহার খান লোহানীর অধীনে কর্ম আরম্ভ করিলেন। একদা শিকারের সময় একটি ব্যাঘ্রকে তরবারির একটিমাত্র আঘাতে হত্যা করিয়া বাহার খানের প্রিয় পাত্র হইলেন। বাহার খান ফরিদকে 'শের খান' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং শিশুপুত্র জালাল খানের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অবিলম্বে শের খান দক্ষিণ বিহারের উপ-শাসক (নায়েব) নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে বাহার খান ঈর্ষান্ধ লোহানী আমীরবর্গের প্ররোচনায় শের খানকে পিতার জায়গির হইতে বিচ্যুত করিলেন।

বাহার খান লোহানীর অধীনে চাকুরি: 'শের খান' উপাধি লাভ

পাণিপথ বিজয়ের এক বৎসর পরে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবর বিহার আক্রমণ

করিলেন। শের খান বাবরকে সাহায্য করিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ চতুর্থ বার সাসারামের জায়গির লাভ করিলেন।

কিন্তু আফঘানদের প্রতি মুঘল সহকর্মীদের গর্বিত ব্যবহারে অপমানিত বোধ করিয়া শের খান দক্ষিণ বিহারের আফঘান সুলতান বাহার খান লোহানীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শিশুপুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যে বাহার খানের মৃত্যু হইল। শের খান কিশোর জালাল খানের প্রতিনিধি বা উকিল নিযুক্ত হইলেন। কালক্রমে শের খান দক্ষিণ বিহারের সমস্ত রাজক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর বাঙ্গলার সুলতান নসরৎ শাহ দক্ষিণ বিহার আক্রমণ করিলে শের খান তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই সময় শের খান চুণার দুর্গ আক্রমণ করিয়া কিল্লাদার তাজ খানকে নিহত করেন। তাজ খানের বিধবা পত্নী লাদমালিকা স্বামিহন্তাকে বিবাহ করিয়া দুর্গটি নববিবাহিত স্বামী শের খানের হস্তে অর্পণ করেন। চুর্ণার দুর্গের সমস্ত অর্থ ও সম্পদ শের খানের হস্তে ন্যস্ত হয়।

জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত

চুণার দুর্গ অধিকার

শের খানের শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে চুণার দুর্গ অবরোধ করেন। শের খান হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করেন। তখন শের খানের উপাধি হইল হজরৎ-ই-আলা।

হুমায়ুন কর্তৃক চুণার দুর্গ অবরোধ

অন্যদিকে বিহারের আফঘান সর্দারগণ জালাল খানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু শের খান অনায়াসে বিহার-বঙ্গের সম্মিলিত বাহিনীকে **সূরজগড়ের যুদ্ধে** (১৫৩৪ খ্রীঃ) পরাভূত করিয়া বিহারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এই যুদ্ধই শের খানের জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ রাজত্বের সূচক। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন গুজরাট অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগে শের খান বাঙ্গলায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য অভিযান করেন। বাঙ্গলার সুলতান নিরুপায় হইয়া হুমায়ুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন গুজরাটের অর্ধসমাপ্ত অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়া শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমেই বাঙ্গলায় উপস্থিত না হইয়া হুমায়ুন শেব খানের নববিজিত চুণার অবরোধ করিলেন—ছয় মাসব্যাপী অবিরাম চেষ্টার ফলে চুণার অধিকৃত হইল। শের খান এই ছয় মাসের মধ্যে মুঙ্গের ও গৌড় পর্যন্ত ভূখণ্ড জয় করিয়া গৌড় অবরোধ করিলেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে রোহতাস গড়ের হিন্দুরাজার নিকট শের খান তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের জন্য দুর্গমধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। নারীর সম্মান রক্ষার

সূরজগড়ের যুদ্ধ জয়

শের খান কর্তৃক বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ

হুমায়ুনের চুণার অধিকার

শের খান কর্তৃক রোহতাস দুর্গ জয়

জন্য হিন্দু রাজা মুসলিম পুরনারীদিগকে গভীর রাত্রিতে শিবিকার অন্তরালে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হতভাগ্য হিন্দুরাজা জানিতেন না যে, শিবিকান্তরালবর্তী পুরনারীগণ বোরখা-পরিহিত সশস্ত্র আফঘান সৈন্য। নারীবেশী আফঘান সৈন্যের নিশীথ আক্রমণে দুর্গ হিন্দুরাজার হস্তচ্যুত হইল (১৫৩৮ খ্রীঃ)। তারপর শের খান গৌড় অধিকার করিলেন। গৌড়ের সুলতান মামুদ শাহ হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। বাঙ্গলার হস্তী-বাহিনীর এক বিরাট অংশ, কয়েকটি কামান এবং বাঙ্গলার সুলতানের ধনপূর্ণ রাজকোষ শের খানের হস্তগত হইল।

শের খান কর্তৃক গৌড় জয়

হুমায়ুন চুণার দুর্গ জয় করিয়া মামুদ শাহের সাহায্যার্থ বঙ্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। শের খান তাঁহার অর্থ-সম্পত্তি গৌড় হইতে রোহতাস দুর্গে স্থানান্তরিত করিলেন এবং ভবিষ্যতে অনর্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হুমায়ুনকে রাজধানী গৌড়ে প্রবেশের সুযোগ দান করিলেন। হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড়ে প্রবেশ করিলেন। বিজয়ের উল্লাসে গৌড় নগরে হুমায়ুন সুদীর্ঘ আট মাস বিজয় উৎসব সম্পন্ন করিলেন এবং গৌড় নগরের নামকরণ করিলেন 'জিন্নতাবাদ' বা স্বর্গভূমি।

হুমায়ুন কর্তৃক গৌড় পুনরধিকার

একদিকে হুমায়ুনের উৎসব রজনী ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম; অন্যদিকে শের খানের অনলস বিরামহীন পশ্চিমাভিমুখী অভিযান। শের খান হুমায়ুনের অজ্ঞাতে বিহার হইতে দিল্লী পর্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ডে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিলেন। ইতোমধ্যে শের খান দিল্লী ও বাঙ্গলার মধ্যবর্তী অঞ্চলের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিলেন, বারাণসী অধিকার করিলেন এবং জৌনপুর হইতে কনৌজ পর্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চলের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিলেন।

শের খান কর্তৃক বারাণসী ও জৌনপুর জয়

হুমায়ুন ভ্রাতা হিন্দালকে যোগাযোগ সংরক্ষণের জন্য বিহারের প্রান্তদেশে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শের খানের অগ্রগতির সংবাদে হুমায়ুনের বিপদ আশঙ্কা করিয়া হিন্দাল আগ্রায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণার আয়োজন করিলেন। হুমায়ুন নিজের অসহায় অবস্থা সম্যক অনুধাবন করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অনতিবিলম্বে দ্রুতগতিতে রাজধানী আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন (মার্চ, ১৫৩৯ খ্রীঃ)।

শের খান কর্মনাশা নদীর তীরে চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুনের পথরোধ করিলেন। শের খান এবং হুমায়ুনের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী সুদীর্ঘ তিনটি মাস পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। অগ্রগামী দলের নেতা হুমায়ুনের ভ্রাতা আসকারী হুমায়ুনের সাহায্যার্থে কোন সৈন্য প্রেরণ করিলেন না। আসন্ন বর্ষায় নদীপথ বিপদসংকুল হইয়া উঠিল। এইবার শের খানের সুযোগ উপস্থিত হইল।

অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণের ফলে মুঘল শিবিরে খাদ্যদ্রব্য অব্যবহার্য হইয়া গেল। হুমায়ুন প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে হুমায়ুন শের খানের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শের খান সন্ধির প্রস্তাবের সুযোগে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যথা-প্রয়োজন সময় লাভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত শের খানের ধূর্ততায় সন্ধির প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

অবিলম্বে শের খান সৈন্য সমাবেশ করিয়া প্রচার করিলেন যে, তিনি শাহাবাদ অঞ্চলে পার্বত্য হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইতেছেন। সুতরাং মুঘল শিবিররক্ষিগণ নিশ্চেষ্ট রহিল। হঠাৎ রাত্রির গভীর অন্ধকারে শের খানের সৈন্য তিনদিক হইতে মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া মুঘল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। যুদ্ধে মুঘল পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। গঙ্গাতীরে বক্সারের নিকট **চৌসা** নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল (১৫৩৯ খ্রীঃ)। হুমায়ুন হস্তী-পৃষ্ঠে শিবির ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করা অসম্ভব দেখিয়া নিজাম নামক একজন ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া কোন মতে জীবন রক্ষা করিলেন। হুমায়ুনের শিবির লুণ্ঠিত হইল। হুমায়ুনের অন্যতমা মহিষী বেগা বেগম এবং অন্যান্য মুঘল অন্তপুরিকাগণ শের খানের হস্তে বন্দিনী হইলেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই বহু সংখ্যক মুঘল সৈন্য শের খান কর্তৃক ধৃত হইল; অবশিষ্ট সৈন্য নদী অতিক্রমণের সময় সলিল সমাধি লাভ করিল। হুমায়ুন অবিলম্বে দুইজন দেহরক্ষিসহ আগ্রায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। চৌসার যুদ্ধের ফল শের খানের জীবনে সুরজগড়ের যুদ্ধ অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধের ফলে শের খান বাঙ্গলা, বিহার এবং জৌনপুরের স্বাধীন অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শের খানের শক্তি ও সম্মান দিল্লীর বাদশাহের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। শের খান মুঘল শক্তি বিতাড়িত করিয়া হিন্দুস্থানে পুনরায় আফঘান রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন আফঘান জাতি মুঘল বিতাড়নের উদ্দেশ্যে শের শাহের পতাকাতলে সমবেত হইল।

চৌসার যুদ্ধ
(১৫৩৯ খ্রীঃ)

শের খান অনুভব করিলেন যে, চৌসার যুদ্ধেই মুঘল-আফঘান যুদ্ধ পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই। সুতরাং শের খান ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। চৌসার যুদ্ধের পর শের খান নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং জ্যোতিষীদের নির্দেশে শুভদিনে চৌসার রণক্ষেত্রে নিজ অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শের খান 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিলেন। শের শাহের নামে খুৎবা পঠিত হইল। তাঁহার শিরোপরি রাজছত্র শোভিত হইল। শের শাহ ভবিষ্যৎ

'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ

যুদ্ধের সম্ভাবনায় কনৌজ ও কল্পী অঞ্চলে বহু দুর্গ নির্মাণ করিলেন; রাজস্ব সংগ্রহ, বিচার-ব্যবস্থা এবং সুশৃঙ্খল শাসন প্রবর্তন আরম্ভ করিলেন। শের শাহ বন্দিনী মুঘল অন্তঃপুরিকাদিগকে অভিষেক উৎসবের শেষে সসম্মানে হুমায়ুনের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর শের শাহ মালব, গুজরাট এবং মাণ্ডুর আফঘান সর্দারদিগের নিকট হুমায়ুনকে আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের জন্য অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভীতি প্রদর্শনও ছিল।

হুমায়ুন আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শের শাহের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আসকারী এবং হিন্দাল মানসিক ঈর্ষা এবং চাঞ্চল্য সত্ত্বেও আফঘান শক্তির বিরুদ্ধে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনের পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু কামরাণ হুমায়ুনের সঙ্গে যোগদানে বিরত রহিলেন। হুমায়ুন চল্লিশ সহস্র মুঘল সৈন্য সহ কনৌজের পথে শের শাহকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। শের শাহের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র পনর হাজার। শের শাহও কনৌজের পথে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি আসন্ন বর্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি শের শাহের প্রকৃত সহায় হইল—এক মাসের মধ্যে প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রবল বারিবর্ষণের ফলে মুঘলদিগের কামান অব্যবহার্য হইয়া গেল। শিবির হইতে কর্দমসিক্ত পথে যুদ্ধক্ষেত্রে কামান আনয়ন করাও অসম্ভব হইল। কনৌজের অনতিদূরে **বিল্বগ্রাম** নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইল। এবারও শের শাহ হুমায়ুনকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিলে হুমায়ুন কনৌজ রণক্ষেত্র হইতে আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। শের শাহ কনৌজ অধিকার করিয়া হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ক্ষিপ্রগতি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। পুনরায় যুদ্ধের জন্য হুমায়ুন আগ্রায় অপেক্ষা না করিয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শের শাহ দেড় মাসের মধ্যে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের শাহ হিন্দুস্থানের সার্বভৌম অধিকারী হইলেন, হুমায়ুন প্রাণরক্ষার্থে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

বিল্বগ্রামের যুদ্ধ

শের শাহ কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

হুমায়ুন লাহোরে তাঁহার ভ্রাতা কামরাণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিন মাস যাবৎ মুঘলরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামরাণ হুমায়ুনকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। এদিকে শের শাহের সৈন্য বিতস্তা নদী অতিক্রম করিলে মুঘল সৈন্য ভয়ে লাহোর পরিত্যাগ করিল। কামরাণের সাহায্য লাভে বিফল মনোরথ হইয়া হুমায়ুন সিন্ধুর পথে অগ্রসর হইলেন। কামরাণ পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলে শের শাহ পঞ্জাব অধিকার করিলেন।

হুমায়ুনের রাজ্যলাভের পুনঃপ্রচেষ্টা

হুমায়ুন ও কামরাণের কাবুলে প্রত্যাবর্তনের পরে শের শাহ্ পঞ্জাবের দুর্ধর্ষ গাক্কার জাতিকে দমনের জন্য ঝিলাম নদীর তীরে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং এই দুর্গটির নামকরণ করিলেন রোহতাস। কিন্তু এই সময় বাঙ্গলার শাসনকর্তা পুনরায় বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন। সুতরাং শের শাহ্ গাক্কার দমন অসম্পূর্ণ রাখিয়া বাঙ্গলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শের শাহের পঞ্জাবে অবস্থান কালে বাঙ্গলার শাসনকর্তা খিজির খান শের শাহের আনুগত্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। শের শাহ্ দ্রুত বাঙ্গলা দেশে আগমন করিয়া খিজির খানকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। ক্রমাগত বিদ্রোহের স্থল বাঙ্গলা দেশে তিনি আর কোন নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন নাই, পরন্তু বাঙ্গলা শাসনের জন্য নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেকটি সরকারে একজন শিকদার নিযুক্ত করিলেন। শিকদারগণের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হইলেন কাজী ফজিলত। তাঁহার কর্তব্য হইল সরকারের শাসন-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ, দিল্লী সরকারে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ এবং রাজ্য মধ্যে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ নিরসন। ফলে বাঙ্গলা দেশে দিল্লীর প্রত্যক্ষ অধীনে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত হইল এবং বাঙ্গলা দেশে বিরামহীন বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূরীভূত হইল।

বাঙ্গলা দেশে বিদ্রোহ দমন : বাঙ্গলায় নূতন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন

১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন সিন্ধুর পথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তখন কয়েকজন জাঠ সামন্ত সমগ্র সিন্ধুদেশ শাসন করিতেন। লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি ছিল তাঁহাদের ব্যবসায়। শের শাহ্ সমগ্র মূলতান ও সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া ইসমাইল খান নামক একজন স্থানীয় সর্দারকে মূলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

সিন্ধু ও মূলতান জয়

মীর্জা আসকারী ও হিন্দাল ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের স্বাধীন শাসনকর্তা মল্লু খানের পুত্র কুতুব খানকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। সুতরাং শের শাহ্ মালব বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। পথে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা শের শাহের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন। অচিরকালমধ্যে শের শাহ মালব অধিকার করিলেন (১৫৪২ খ্রীঃ) এবং আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ্যে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

গোয়ালিয়র ও মালব জয়

মধ্যভারতে রাইসিন রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও উহার রাজা পুরণমল বিশেষ সম্মানিত ও সমৃদ্ধ শাসক ছিলেন। পুরণমল শের শাহের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং শের শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। তাহা সত্ত্বেও শের শাহ ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মাণ্ডুরাজ্য অতিক্রম করিয়া রাইসিন দুর্গ অবরোধ করেন; কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। শের শাহ সন্ধির

রাইসিন দুর্গ জয় (১৬৭৩ খ্রীঃ)

প্রস্তাব করিলেন এবং কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, পুরণমল বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য নষ্ট করা হইবে না, সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে না এবং নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না। পুরণমল বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু শের শাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নারীর অপমান ভয়ে আশঙ্কিত হইয়া পূরণমল স্বহস্তে তাঁহার পরিবারের সমস্ত নারী হত্যা করিলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গও রাজার উদাহরণ অনুসরণ করিয়া পুরনারী নিধন যজ্ঞে অগ্রসর হইলেন। এক রাত্রিতেই নারীমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর রাজপুতগণ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে শের শাহের বহু সৈন্য নিহত হইল; কিন্তু রাইসিন দুর্গে একটি রাজপুত পুরুষও জীবিত রহিল না। রাইসিনের বিশ্বাসঘাতকতা শের শাহের চরিত্রের চরমতম কলঙ্ক।

শের শাহের বিশ্বাস-ঘাতকতা

যোধপুরের অধিপতি মালদেব ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনকে আশ্রয় দানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শের শাহ্ হুমায়ুনকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণের জন্য মালদেবকে নির্দেশ দান করেন। মালদেব এই নির্দেশের পরে মুঘল-পাঠান সংগ্রামে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিলেন। নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও শের শাহ্ মালদেবকে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ মালদেবের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। মরুপ্রান্তরে শের শাহের সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে এবং অশ্ব তৃণাভাবে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইল। ইহাতে শের শাহের অবস্থা সংকটাপন্ন হইল। এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য শের শাহ মালদেব ও তাঁহাব সর্দারগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাল পত্র রচনা করিলেন। জাল পত্রখানি এমন ভাবে রচিত হইল—যেন মালদেবের সৈন্যাধ্যক্ষ শের শাহের নিকট লিখিতেছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মালদেবকে বন্দী করিয়া শের শাহের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই পত্রখানি গুপ্তচর কর্তৃক মালদেবের শিবিরের অদূরে কৌশলক্রমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মালদেব এই পত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে বিভ্রান্ত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাজপুতগণ বহু চেষ্টা করিয়াও মালদেবের সন্দেহ নিরসন করিতে পারিলেন না। রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ জয়ন্ত এবং কুম্পা নিজেদের সততা এবং রাজভক্তি প্রমাণের জন্য মাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ শের শাহের অর্ধলক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। প্রথমে শের শাহের জীবন সংকটাপন্ন হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ সহস্র রাজপুত সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। শের শাহ আফঘান সৈন্যের রক্তপাত দর্শনে আতঙ্কিত

যোধপুর বিজয় (১৫৪৪ খ্রীঃ)

শের শাহের প্রতারণার কৌশল

হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি এক মুষ্টি বজ্‌রার জন্য হিন্দুস্থানের সিংহাসন হারাইতে বসিয়াছিলাম।" মালদেব পরিশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর পুনরাক্রমণের সময় ছিল না। মালদেব

যোধপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তথা হইতে গুজরাটের প্রান্তদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শের শাহ আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত নানা সম্পদপূর্ণ ভূভাগ অধিকার করিলেন।

রাজস্থান অভিযান শেষ করিয়া শের শাহ কালিঞ্জর আক্রমণ করেন

(নভেম্বর, ১৫৪৪ খ্রীঃ)। কিন্তু এক বৎসর চেষ্টা করিয়াও দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। শের শাহ দুর্গপ্রাচীর কামান দ্বারা চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রাচীরের পার্শ্বে উচ্চ স্তম্ভের উপরে কামান সজ্জিত করা হইল। শের শাহ একটি স্তম্ভশীর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কামানে অগ্নি-সংযোগের আদেশ দিলেন—কিন্তু একটি অগ্নি-গোলক রুদ্ধ দুর্গদ্বার হইতে প্রতিহত হইয়া পার্শ্বস্থিত বারুদস্তূপের উপর পতিত হইল। ভীষণ শব্দে বিচ্ছুরিত বারুদরাশি শের শাহকে স্পর্শ করিল। শের শাহ আহত হইলেন এবং সৈন্যগণ তাঁহার অর্ধদগ্ধ দেহ শিবিরে আনয়ন করিল। অল্পক্ষণ পরেই শের শাহ সংবাদ শুনিলেন, কালিঞ্জর দুর্গ বিজিত হইয়াছে। শের শাহ তখন পরলোকের যাত্রী—তাঁহার আননে বিজয়ের সম্মিত উল্লাস (মে, ১৫৪৫ খ্রীঃ)।

কালিঞ্জর বিজয় (১৫৪৫ খ্রীঃ)

শের শাহের মৃত্যু (১৫৪৫ খ্রীঃ)
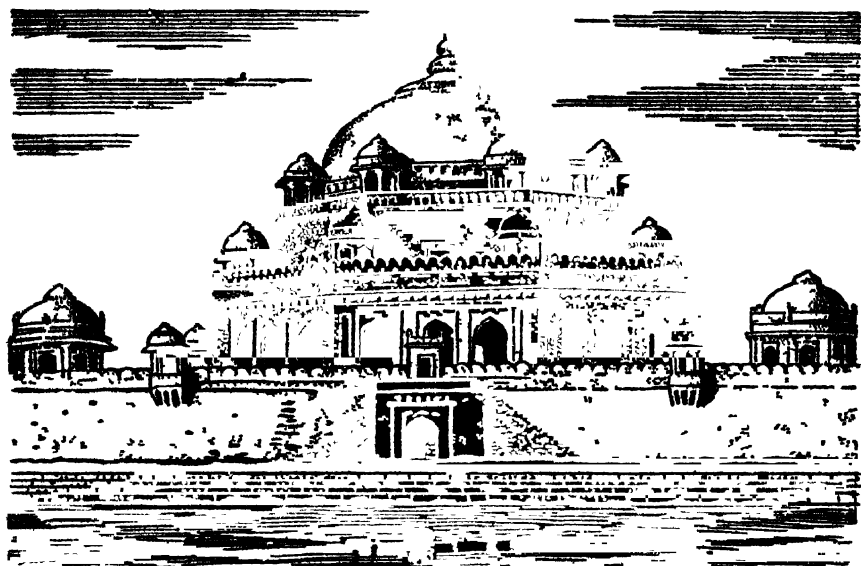
সাসারামে শের শাহের সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ

শের শাহের মৃতদেহ তাঁহার কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমি সাসারামে সমাধিস্থ হইল। সেই সমাধির উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ মুসলিম সমাধি-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা : সুদক্ষ সেনানায়ক অপেক্ষা সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থাপক রূপেই শের শাহ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

তাঁহার অল্পকাল স্থায়ী রাজত্বকাল ছিল যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। তথাপি নব-স্থাপিত সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের ব্যবস্থা যে তাঁহার অসাধারণ

প্রতিভার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ববর্তী সুলতানী যুগের ন্যায় এই শাসন সামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রজার মঙ্গল সাধন রাজ্যের মূল নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। সামরিক প্রতিভার সহিত এইরূপ শাসন দক্ষতার সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। মুসলমান শাসিত ভারতবর্ষে শের শাহই সর্বপ্রথম একটি কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র প্রচলন করেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবর্গের সমন্বয় সাধন করাই ছিল শের শাহের শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি। (শের শাহ স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন; তাঁহার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রধান শাসক, বিচারক ও সেনানায়ক। কোরাণের নির্দেশকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া শের শাহ 'শাহী আইন' (রাজ-প্রবর্তিত আইন) প্রচলন করেন। রাজ্যের সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী হইলেও শের শাহ চারি জন প্রধান উজীর বা মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন—(১) দিওয়ান-ই-ওজারাত=রাজস্ব মন্ত্রী, (২) দিওয়ান-ই-আরিজ=সৈন্য বিভাগীয় মন্ত্রী, (৩) দিওয়ান-ই-রিসালাত=পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী এবং (৪) দিওয়ান-ই ইনসা=লেখন ও দলিল বিভাগীয় মন্ত্রী। ইহা ভিন্ন বিচার এবং সংবাদ (ডাক) বিভাগের জন্যও মন্ত্রী ছিল। রাজপ্রাসাদের জন্য খান-ই-সামান নামক তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী বা মন্ত্রী নিযুক্ত ছিল। এই সকল মন্ত্রী শের শাহের নির্দেশ অনুসারে তাঁহাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেন।)

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

(শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শের শাহ তাঁহার সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা,—(১) কিল্লা বা সামরিক শাসন কেন্দ্র—লাহোর, পঞ্জাব, মালব এবং আজমীরে কিল্লাদার শাসন করিতেন। (২) ইকতা—অনেকটা মুঘল-যুগের সুবার মত অথবা আধুনিক প্রদেশের অনুরূপ। তখন সুবা নাম ছিল না। শাসনকর্তার উপাধি ছিল ইক্‌তাদার; জায়গিরদার উপাধিও ছিল। (৩) বাঙ্গলার বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা—১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভবিষ্যৎ বিদ্রোহ নিরসনের উদ্দেশ্যে শের শাহ বাঙ্গলা দেশে কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন নাই। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তিনি বাঙ্গলা দেশকে সাতচল্লিশটি সরকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া শিকদার নিযুক্ত করেন। উহাদের উপর একজন কেন্দ্রীয় শিকদার নিযুক্ত থাকিত। এই তিন প্রকার বিভাগ ভিন্ন কয়েকটি বিভিন্ন আয়তনের বশংবদ হিন্দুরাজ্যও ছিল। হিন্দু সামন্ত ও রাজন্যবর্গই ঐগুলি শাসন করিতেন।)

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

সুলতানী যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রায় স্বাধীন ভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। শের শাহের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের আজ্ঞানুবর্তী। তাঁহারা সকলেই ছিলেন সেনানায়ক। শের শাহ

প্রায়ই কর্মচারী স্থানান্তর বা "বদলী" করিতেন। ইকতা অথবা সরকারের আয়তন এবং কর্মচারীর ক্ষমতা সর্বত্র একরূপ ছিল না।

প্রত্যেক প্রদেশই কতিপয় সরকারে বিভক্ত ছিল, সরকারের দুই প্রকার কর্মচারী ছিল—শিকদার এবং আমীন বা মুনসিফ। প্রধান শিকদার ছিলেন শিকদার-ই-শিকদারান, প্রধান মুনসিফ ছিলেন মুনসিফ-ই-মুনসিফান। শিকদার ছিলেন সাধারণভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী—মুনসিফ ছিলেন বিচার ও রাজস্বের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাঁহাদের অধীনে নানাপ্রকার নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ছিল। প্রত্যেক সরকারের অধীনে কতকগুলি পরগণা, প্রত্যেক পরগণায় শিকদার, মুনসিফ, ফোতাদার (কোষাধ্যক্ষ) ও কারকুন (লেখক) ছিল। কানুনগো নামক কর্মচারী পরগণার ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত সংবাদ রাখিত; আমীন ভূমি পরিমাপ করিত, কারকুন ফার্সী ও হিন্দী দুই ভাষায় হিসাব লিখিত। দেহাত বা গ্রাম শাসনের জন্য পাটোয়ারী (হিন্দুযুগের পত্রধারী), চৌধুরী (হিন্দুযুগের চতুর্ধারিণ) এবং চৌকিদার নামক বিভিন্ন প্রকার কর্মচারী ছিল। গ্রামবৃদ্ধগণ (পঞ্চায়েৎ) গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা, সেচ-ব্যবস্থা করিতেন; সময় সময় তাঁহারা কলহ-বিবাদের মীমাংসাও করিতেন। গ্রামগুলি হিন্দুযুগের ধারা অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুশাসিত ছিল।

সরকার

পরগণা

শের শাহের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থা। প্রারম্ভে তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ আয়-ব্যয় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা যথা-প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং ব্যয় করিতেন। শত্রুর লুণ্ঠিত দ্রব্যের পঞ্চমাংশ (খামুস), বিধর্মী প্রদত্ত জিজিয়া কর, ভূমি রাজস্ব (খারাজ), নবনিযুক্ত কর্মচারী প্রদত্ত উপঢৌকন এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার শুল্কই ছিল রাজস্বের উৎস। প্রাচীন ভারতের রাজস্ব-ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের সংস্থা ছিল অতি সুসংবদ্ধ। তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজস্ব-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। মুহম্মদ তুঘলকের আর্থিক ব্যবস্থা বহু অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল। ফিরোজ তুঘলকের আর্থিক ব্যবস্থা ধর্মগন্ধি ছিল এবং তাঁহার অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল মুসলিম প্রজাবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ। তৈমুরের আক্রমণে তুর্ক-আফঘান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি চূর্ণ হইয়া যায়। বাহলুল লোদীর অর্থ নৈতিক সংস্কারগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কারণ তাঁহার রাজ্য ছিল আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেকেন্দর লোদীই মুসলিম ভারতে প্রথম আয়-ব্যয়ের হিসাব ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। বাবর-হুমায়ুনের ইতিহাসে কোন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ নাই, তাঁহারা পূর্ববর্তী সুলতানদের রাজস্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম-প্রণালীর কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাই। শের খান সাসারামে পিতার জায়গির শাসন

রাজস্ব ব্যবস্থা

করার সুযোগে নানা প্রকার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বল্পপরিসর রাজত্বকালে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্থা ও ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ; শের শাহ পুরাতনকে নূতন রূপে গঠন করেন।

শের শাহের রাজকোষ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল,—কেন্দ্রীয় রাজকোষ এবং প্রাদেশিক রাজকোষ। কেন্দ্রীয় রাজকোষের আয়ের উৎস ছিল—(ক) খারাজ বা ভূমিরাজস্ব, (খ) খাম্‌স বা লুণ্ঠনের পঞ্চমাংশ, (গ) জিজিয়া কর, (ঘ) বাণিজ্য শুল্ক, (ঙ) প্রান্তীয় শুল্ক, (চ) লবণ শুল্ক, (ছ) মুদ্রাশালার আয় (টাকশাল), (জ) উত্তরাধিকার-বিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং (ঝ) নবনিযুক্ত কর্মচারী প্রদত্ত উপহার।

প্রাদেশিক রাজকোষের আয়ের উৎস ছিল কয়েক প্রকার স্থানীয় কর ও শুল্ক। যথা—পথকর, জলকর, যানবাহনের উপর কর, বাস্তুভিটার উপর কর, গৃহপালিত পশুর উপর কর ইত্যাদি।

কিন্তু রাজ্যের প্রধান আয় ছিল ভূমিরাজস্ব। শের শাহ তাঁহার পিতার অধীনে জায়গির পরিচালনার সময় নানা প্রকার রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলতার সহিত পরিচিত ছিলেন। জায়গিরের অত্যাচার, প্রজার দুঃখ-দুর্দশা এবং রাজস্ব বিষয়ক তঞ্চকতার বিষয় তিনি সম্যক অবগত ছিলেন ; সুতরাং তিনি প্রথমেই ভূমির পরিমাপ করিলেন এবং উর্বরতা অনুসারে ভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। তারপর উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ কর নির্ধারণ করিলেন। শের শাহ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রচলন করেন। প্রজার স্বত্ব ও কর স্থির করিয়া তিনি প্রজাকে পত্র (পাট্টা) প্রদান করিতেন এবং প্রজাও রাজকোষে প্রদেয় রাজকর স্বীকার করিয়া স্বীকৃতি-পত্র (কবুলিয়ত) প্রদান করিত। অবশ্য মুলতান ও রাজপুতনার মরু অঞ্চলে ভূমি-পরিমাপ সম্ভব হয় নাই এবং সেই অঞ্চলে পাট্টা-কবুলিয়ত প্রথা প্রচলিত হয় নাই। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জমিদার ও রাজকর্মচারি-গণের স্বেচ্ছাচার অনেকটা হ্রাস পাইল এবং প্রজার ভূমিস্বত্ব স্থির হইল।

রাজস্ব : ফসলের এক-তৃতীয়াংশ

কবুলিয়ত ও পাট্টা

ভূমিরাজস্বের তিনটি শ্রেণী ছিল, যথা—(১) বাটাই বা গল্লাবক্‌সী, (গল্লা= উৎপন্ন শস্য) অর্থাৎ কর্ষিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের যথার্থ বণ্টন বা বাটাই ব্যবস্থা —যেমন বর্তমান ভাগচাষী ব্যবস্থা। (২) মুকতাই (নসকী)—উৎপন্ন শস্যের আনুমানিক পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন। (৩) জমাই (নগদী)—এই প্রথা অনুসারে তিন বৎসরের জন্য নগদ জমা কর নির্ধারিত হইত, বিঘা প্রতি একটা নির্দিষ্ট কর স্থির করা হইত। রাজস্ব রূপে নগদ অর্থ বা শস্যাংশ প্রদান করা প্রজার ইচ্ছাধীন ছিল ; অবশ্য রাজকোষে নগদ অর্থ দিলে রাজকর্মচারীরা সন্তুষ্ট হইত। রাজস্ব নির্ধারণে উদারতা, আর রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা ছিল রাজকর্মচারীর উপর নির্দেশ।

ভূমি-রাজস্ব সংস্কার

সমস্ত করের উপর জরিপানা (অর্থাৎ পরিমাপের জন্য শুল্ক) এবং তহশীলানা (তহশীল অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য শুল্ক) আদায় করা হইত ; তাহার উপরও প্রদেয় করের শতকরা আড়াই ভাগ রাজকোষে দিতে হইত। কোন কারণে প্রজার শস্য নষ্ট করা হইত না। যুদ্ধকালীন সৈন্য পরিচালনার সময়েও শস্য স্পর্শ করা হইত না। নীতিগতভাবে জায়গির প্রথার বিরোধী হইলেও, শের শাহ ঐ প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে পারেন নাই।

রাজকোষে সংগৃহীত অর্থ প্রধানত যুদ্ধ ব্যাপার, সৈন্যবেতন, রাজ-প্রাসাদের ব্যয়, পথ, সরাই ও সৌধ নির্মাণ এবং দান-খয়রাতে ব্যয়িত হইত।

তৈমুরের আক্রমণের ফলে তুঘলক রাজত্বের অর্থনৈতিক ভিত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মুদ্রা নির্মাণে ধাতুর অনুপাত বিশুদ্ধ ছিল না ; স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের মূল্যমানও সমান ছিল না। পূর্ববর্তী যে-কোন সুলতানের মুদ্রা সমভাবে রাজকোষে গৃহীত হইত। বাহলুল লোদী অবশ্য মুদ্রার মান ও অনুপাত স্থির করিয়া নূতন মুদ্রা প্রচলিত করেন। কিন্তু উহার বিস্তৃতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শের শাহ এক প্রকার নূতন রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন—উহা পরবর্তিকালে তঙ্কা বা টাকা নামে পরিচিত হয়। তাম্র নির্মিত মুদ্রা প্রধানত 'দাম' নামে পরিচিত ছিল ; রৌপ্য নির্মিত বলিয়া শের শাহের মুদ্রা 'রুপাইয়া' নামে পরিচিত। শের শাহ মুদ্রার অর্ধাংশ (আধুলি), চতুর্থাংশ (সিকি), অষ্টমাংশ (দুআনি), ষোড়শাংশ (একআনি) প্রচলন করেন। ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে শের শাহের মুদ্রা ধাতুর বিশুদ্ধতায়, মানের অনুপাতে, সৌন্দর্যে ও অক্ষরের স্পষ্টতায় বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শের শাহের মুদ্রাই ভারতীয় মুদ্রার আদর্শ ছিল। শের শাহের মুদ্রার উপরে আরবী অক্ষরে সুলতানের নাম, উপাধি, টাকশালের নাম, কোথাও বা খলিফার নামও অঙ্কিত থাকিত। দেবনাগরী অক্ষরের মুদ্রা শের শাহের সমাধিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মুদ্রানীতির সংস্কার

শের শাহের ফার্সী ও দেবনাগরী হরফে অঙ্কিত মুদ্রা

পথ নির্মাণ ছিল শের শাহের প্রয়োজন ও বিলাস। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সুবিধার জন্য শের শাহ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত পথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজধানীর সহিত সংযুক্ত করিয়া শের শাহ চারিটি প্রধান পথ নির্মাণ করেন—

(১) প্রথম পথ পালযুগের পথ অনুসরণ করিয়া বাঙলা দেশের সোনার

গাঁও হইতে আগ্রা, লাহোর, দিল্লী অতিক্রম করিয়া সিন্ধুর প্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। উহার দৈর্ঘ্য পনর শত মাইল এবং উহার শেরশাহী নাম সড়ক-ই-আজম, বর্তমান নাম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ; (২) দ্বিতীয় পথ আগ্রা হইতে বুহরাণপুরে গিয়া মিশিয়াছে ; (৩) তৃতীয় পথ আগ্রা হইতে যোধপুর হইয়া চিতোরে শেষ হইয়াছে ; (৪) চতুর্থ পথ লাহোরের সঙ্গে মূলতানকে সংযোজিত করিয়াছে। এই সমস্ত প্রধান পথের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি শাখা-উপশাখা পথ অন্যান্য দুর্গ ও শহরের সঙ্গে সংযোজিত ছিল। এই সকল রাস্তা নির্মাণের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং এই নব নির্মিত পথগুলি ছিল সৈন্য চলাচলের প্রধান যোগসূত্র।

প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ : গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

পথিকদের সুবিধার জন্য পথের দুই পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপিত ছিল, পথের পার্শ্বে সতর শত পান্থশালা ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। ডাক বিভাগের কর্মচারীদের অশ্বের জন্য পান্থশালার সংলগ্ন অশ্বশালা ছিল এবং গ্রামের জমিদারদের জন্য রাজকীয় ডাক এবং অশ্বের জন্য তৃণ ও জলের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সরাই বা পান্থশালার ব্যয়ের জন্য ভূমিরাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল। সড়ক ও সরাই ছিল শের শাহের রাজ্যের শিরা উপশিরা ; শেব শাহের সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আদান-প্রদান এই সবাই ও সড়কের মাধ্যমে পরিচালিত হইত।

পান্থশালা নির্মাণ

বাস্তবিক পক্ষে শের শাহ শান্তিরক্ষার জন্য কোন পৃথক বিভাগ সৃষ্টি কবেন নাই, শান্তিরক্ষা সৈন্য বিভাগের কর্তব্য ছিল। সরকার বা পরগণার শিকদার নিজ 'সীমার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দস্যু, তস্কর এবং দুষ্ট লোকদের শাসন করিতেন গ্রামে পঞ্চায়েৎ-এর উপর দুষ্ট দমনের ভার ছিল, নগর বা দুর্গে কোতোয়াল ঐরূপ কার্য করিতেন। গ্রামে কোন দস্যুতা বা চুরি হইলে গ্রাম্য মণ্ডলপতি (মোড়ল) ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা সাধারণভাবে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

শেব শাহের শান্তিরক্ষা বিভাগ

সমসাময়িক ঐতিহাসিক শের শাহের শান্তিরক্ষা-ব্যবস্থা ও সুশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আব্বাস শেরওয়ানী বলেন, "কোন বৃদ্ধা অক্ষম নারী তাঁহার স্বর্ণালংকার পার্শ্বে রাখিয়া স্বচ্ছন্দ মনে পথিপার্শ্বে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিতেন, কেহ তাঁহার মূল্যবান দ্রব্য স্পর্শ করিতে সাহস করিত না।"

মধ্যযুগে সুবিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিপদ ছিল সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভাব। শের শাহ এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক সরাই-এর সঙ্গে সংযুক্ত অশ্বারোহী সংবাদ বহন করিত।

দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য শের শাহ বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গুপ্তচর বিভাগ সর্বদা এই সমস্ত অশ্বারোহীর সাহায্যে শের শাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিত। এই ব্যবস্থা 'ঘোড়ার ডাক' নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। এই বিভাগের অধিকর্তার উপাধি ছিল দারোগা-ই-ডাক 'চৌকী'। ডাক বাহকের নাম ছিল 'ডাক হরকরা'। জিনিসপত্রের দাম অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল কর্তৃক শস্য নাশ, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, দরিদ্র প্রজার প্রতি ধনীর অথবা রাজকর্মচারীর অত্যাচার প্রভৃতি সমস্ত সংবাদ শের শাহের নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত। "রাজা সহস্র চক্ষু"—চাণক্যের এই প্রবাদ বাক্য শের শাহ সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিয়াছিলেন। এই ডাকচৌকী, সরাই, গুপ্তচর, সৈনিক, শিকদার, সিপাহশালার একযোগে কাজ করিয়া শের শাহের রাজ্যশাসন সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল।

ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, গুপ্তচর নিযোগ

শের শাহ স্বয়ং রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন; তিনি প্রাথমিক বিচার করিতেন; কখন কখন পুনর্বিচারও করিতেন। প্রতি শুক্রবার নমাজেব পর তিনি স্বয়ং মসনদে বসিয়া বিচার করিতেন। বিচার-ব্যবস্থায় বাদশাহেব পর ছিল রাজ্যের প্রধান কাজীর স্থান। প্রধান কাজীর ক্ষমতা সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর ব্যাপ্ত ছিল। প্রত্যেক সরকাব এবং পরগণার জন্য স্থানীয় কাজী নিযুক্ত থাকিত।

কাজীর কাজের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ছিল—কাজী ধর্ম সম্বন্ধীয় ও ফৌজদারী বিবাদ মীমাংসা করিতেন; মুনসিফ দেওয়ানী মামলা বিচাব করিতেন। মীর-ই-আদল নামক এক প্রকার বিচারকও ছিলেন। সৈন্যদেব বিচারের জন্য কাজী-উল-আসকারী (আসকারী=সৈন্য) নামক বিচারক ছিলেন। শের শাহ ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র একদা একজন স্বগৃহে স্নানরতা অসংবৃত-বসনা স্বর্ণকার-পত্নীর গাত্রে তাম্বুল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শের শাহ বিচার করিয়া আদেশ দিলেন—স্বর্ণকার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর গাত্রে তাম্বুল নিক্ষেপ করিয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। রাজ্যেব আমীর-ওমরাহদের প্রতিবাদ এবং অনুরোধ সত্ত্বেও শের শাহ তাঁহাব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নাই।

বিচার-ব্যবস্থা

শের শাহের ধর্মজীবন: শের শাহ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তিনি দৈনিক পাঁচ বার নমাজ পড়িতেন, রমজানের উপবাস পালন করিতেন। তিনি মুসলমান ছিলেন—এই তথ্য তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। রায়সিনের হিন্দুরাজা পুরণমলের সঙ্গে যুদ্ধকে তিনি জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। মালদেবের পরাজয়ের পরে শেব শাহ যোধপুর দুর্গমধ্যে অবস্থিত বহু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং মন্দিরের

ভিত্তির উপর মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কালিঞ্জর দুর্গের মহাকালের বিগ্রহ স্বহস্তে বিচূর্ণ করেন। শের শাহের সমস্ত ধ্বংসাত্মক কর্মই ছিল ইসলাম ধর্ম অনুমোদিত।

অবশ্য সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে শের শাহ তাঁহার পূর্ববর্তী তুর্ক-আফঘানদিগের তুলনায় ধর্ম ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ছিলেন। তিনি হিন্দুর প্রজাস্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পদাতিক বিভাগে বহু সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন, মুদ্রায় দেবনাগরী অক্ষরে স্বীয় নাম অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজনীতির সঙ্গে শের শাহ ধর্মনীতির সংমিশ্রণ করেন নাই। ধর্ম ছিল শের শাহের প্রিয়, কিন্তু রাষ্ট্র ছিল তাঁহার প্রিয়তর।

শের শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ জীবনের সায়াহ্নে ৬৮ বৎসর বয়সে শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব-কাল মধ্যে তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেন এবং রাজ্যের কল্যাণে সুব্যবস্থিত শাসন প্রণালী প্রবর্তিত করেন। তিনি ভারতের অভিজাত-রক্ত-সম্পর্কবিহীন মুসলমান সম্রাটের মধ্যে অন্যতম— ভারতীয় মুসলিম সুলতান-দের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই রাজপদকে বিলাস ব্যসনের উপায়রূপে ব্যবহার করেন নাই। তিনি রাজকর্তব্য সম্পাদনকে জীবনের মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শের শাহের ইতিহাস রচয়িতা আব্বাস শেরোয়ানী বলেন— রাত্রির তৃতীয় প্রহরান্তে শেরশাহ শয্যাত্যাগ করিতেন, তারপর স্নান এবং নমাজ সম্পন্ন করিয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতেন। অতঃপর বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দ তাঁহার নিকট ঘটনার বিবরণী নিবেদন করিতেন। শের শাহ কর্মচারিদিগকে লিখিত উপদেশ প্রদান করিতেন। এই সকল কার্যে তাঁহার চার ঘড়ি (১ ঘড়ি=২৪ মিনিট) সময় অতিবাহিত হইত। তারপর প্রত্যূষে তিনি সৈন্য-পরিদর্শনের জন্য রাজপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেন। সৈন্য বিভাগে প্রতিদিন নূতন সৈন্য নিযুক্ত হইত; সৈন্যদের পিতৃ-পরিচয় ও দেহের স্থায়ী চিহ্ন লিখিত হইত এবং অশ্বগুলি রাজ-চিহ্নাঙ্কিত করা হইত। সৈন্য পরিদর্শন সমাপ্ত হইলে প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইত। প্রাতরাশের পর দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি আমীর, বশংবদ, সামন্ত এবং বৈদেশিক রাজদূতদিগকে রাজদরবারে অভ্যর্থনা করিতেন। তারপর তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিতেন। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিমাভিমুখী হইলে তিনি দ্বিপ্রহরান্তের নমাজ (আছরের নমাজ) পাঠ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতেন। এই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কর্মসূচী। সন্ধ্যায় তিনি কোরাণ পাঠ করিতেন এবং উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত এই কর্মসূচীর ব্যতিক্রম হইত না।

শের শাহের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার সামরিক প্রতিভা, অনলস

অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তন্ময়তা। সামান্য জায়গিরদার-পুত্র হইয়া স্বীয় প্রতিভা ও শক্তিবলে শের শাহ মুঘল বাদশাহকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। শের শাহ যদি আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিতেন অথবা তাঁহার বংশধরগণ যদি শের শাহের আদর্শে এবং কর্মধারায় অনুপ্রাণিত হইতেন, তবে ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ। বিচ্ছিন্ন আফঘান জাতিকে সংহত করিয়া আফঘান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার শেষ জীবনের স্বপ্ন। স্বপ্ন সফল করিবার জন্য তিনি ছিলেন উপায় নির্বাচনে দ্বিধাহীন। স্বীয় স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে তিনি পিতা ও বিমাতার সঙ্গে বিবাদ করিয়া একাধিকবার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জায়গিরচ্যুত করিয়াছিলেন, প্রভু-পুত্র জালাল খান লোহানীকে বিতাডিত কবিয়াছিলেন, হুমায়ুনের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, রাইসিনের রাজা পুরণমলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন এবং মাড়ওয়ারের রাজা মালদেবের বিরুদ্ধে জালপত্র রচনা করিয়াছিলেন। মোটের উপর স্বার্থসিদ্ধির জন্য শের শাহ আলাউদ্দীনের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সামরিক নেতারূপে শের শাহ

শাসন ব্যাপারে স্বৈরাচারী হইলেও প্রজার কল্যাণেই তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজিত বিধর্মী হিন্দুর দেশ। প্রজার কল্যাণ বলিতে ফিরুজ তুঘলকের মত তিনি বিজয়ী মুসলমান জনতার কল্যাণ চিন্তা করেন নাই, ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র প্রজার কল্যাণেই রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ—ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেও তাঁহার জনহিতকর কার্যাবলী একমাত্র মুসলমানের জন্যই পরিকল্পিত হয় নাই। তিনি প্রত্যহ পাঁচশত তোলা স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন; দরিদ্রের জন্য লঙ্গরখানা বা বিনা ব্যয়ে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। ইহার জন্য তাঁহার বাৎসবিক ব্যয় ছিল আঠার লক্ষ টাকা। তাঁহার সময়ে পথিপার্শ্বে ফলবান এবং ছায়াপ্রদ বৃক্ষরাজি রোপিত হইয়াছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের জন্য পৃথক সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। যদিও তিনি জিজিয়া কর রহিত করেন নাই—তথাপি তিনি হিন্দুদিগকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশের অনুমতি দান করিয়াছিলেন এবং রাজকার্য হইতে হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করেন নাই।

শের শাহের আদর্শ ও কর্মধারা

বিচার-বিভাগে সমদর্শিতা শের শাহের অন্যতম কীর্তি। সাধারণত রাজ্যে কোরাণ এবং মুসলিম আইন অনুসারে বিচার-ব্যবস্থা থাকিলেও হিন্দুদেব বিচারকার্য হিন্দু ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইত। গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথা বিদ্যমান ছিল; গ্রামে স্বভাবতই হিন্দুর প্রাধান্য ছিল।

শের শাহের যুগে জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতিতে বর্তমান

যুগের আদর্শ সুস্পষ্ট না থাকিলেও তাঁহার রাজকীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারার মধ্যে এই সমস্ত নীতির আভাস পাওয়া যায়। শের শাহের মৃত্যুর পরে অল্পকাল মধ্যেই আকবরের সময়ে এই নীতির পূর্ণ রূপ বিকশিত হইয়াছিল।

সুপরিকল্পিত ডাক-বিভাগ, রাজস্ব-ব্যবস্থা, ভূপরিমাপ, পাট্টা-কবুলিয়ত প্রবর্তন প্রভৃতি শের শাহের অতুলনীয় কীর্তি। প্রথম যুগে মুসলমান সুলতান-গণ বিজিত হিন্দুস্থানকে মুসলমানের স্বার্থে শাসিত রাজ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন; হয়ত বা কেহ কেহ বিজিত হিন্দুদিগকে অনুগ্রহভাজন 'জিম্মি' বলিয়া করুণা করিতেন, রাজ্যমধ্যে হিন্দুর কোন সুস্পষ্ট অধিকার ছিল না। শের শাহ প্রজাস্বত্ব স্বীকার করিয়া বিজিত বিধর্মী হিন্দুদিগকে এক নূতন মর্যাদা দান করিলেন। ইহার ফল আকবরের যুগে পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। দোষ-গুণের তুলা-দণ্ডে বিচার করিলে মুসলিম ভারতেব ইতিহাসে শের শাহের স্থান দ্বিতীয়।

প্রজামাত্রেরই সমান অধিকার

শের শাহের উত্তরাধিকারিবর্গ: শের শাহের মৃত্যুর পর শূরবংশের চারিজন সন্তান দশ বৎসর রাজত্ব করেন (১৫৪৫-১৫৫৫ খ্রীঃ)। ইসলাম খান শূর আট বৎসর, ফিরুজ খান শূর, মুহম্মদ আদিল শাহ শূর, ইব্রাহিম খান শূর এবং সেকেন্দর শূর দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কাবুল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সরহিন্দের যুদ্ধে সেকেন্দর শূরকে পরাজিত করিয়া পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৪ খ্রীঃ): শের শাহের অপঘাত মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল খান শূর রণথম্বর এবং কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খান রেওয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। শের শাহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, কিন্তু আমীরগণ শের শাহের মৃত্যুর পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খানকে কর্মদক্ষতা, সামরিক অভিজ্ঞতা এবং শৌর্যবীর্যের জন্য কালিঞ্জরে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। জালাল খানের রাজ-উপাধি হইল ইসলাম শাহ।

ইসলাম শাহ ছিলেন শের শাহের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি এবং সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে পিতার পক্ষে তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে চুণার দুর্গ রক্ষাব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় অবরোধের সময় তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গলার প্রবেশদ্বার তেলিয়াগড়ের গিরিবর্ত্ম রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চৌসা এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিল্বগ্রামেব যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। রাইসিন এবং মাড়ওয়ারের যুদ্ধে তিনি পিতার পার্শ্বচর ছিলেন। কালিঞ্জর অববোধের সময় জালাল খান রেওয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং সহজেই শের শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের আমীরগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

ইসলাম খানের প্রাক্-সুলতানী জীবন

আদিল শাহকে বর্জন করিয়া জালাল খানের সিংহাসনারোহণ সমর্থন করেন।

সিংহাসনারোহণের দিন জালাল খান তথা ইসলাম শাহ কালিঞ্জরের চান্দেল্ল রাজা কিরাত সিংহ ও তাঁহার সত্তর জন প্রধান অমাত্যকে আনুষ্ঠানিক ভাবে হত্যা করেন। সৈন্যদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাঁহার ছয় শত জন ব্যক্তিগত সৈন্যের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আমীর পদে উন্নীত করেন। কিন্তু পুরাতন আমীরবর্গ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে আদিল খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। আদিল খান আমীরদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও যোগ্যতর ভ্রাতা ইসলাম শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং বায়েনার জায়গির গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে আমীরগণের সহিত ইসলাম শাহের প্রকাশ্য বিবাদ আরম্ভ হয়। শের শাহের যুগে স্বাধীনতাকামী আফঘান আমীরবর্গ একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া শের শাহের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলাম শাহের সংকীর্ণ নীতির ফলে বিখ্যাত আমীর খাওয়াস খান, ঈশা খান, জালাল খান এবং হায়বৎ খান নিয়াজী বিদ্রোহ করেন। কিন্তু ইহার ফলে নিয়াজী গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পঞ্জাবের দুর্ধর্ষ গাক্কার আমীর আদম নিয়াজী আফঘানদের সাহায্যে হুমায়ুনের পক্ষ সমর্থন করিয়া ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। ইসলাম শাহ পঞ্জাবের সীমান্তে চিনাব নদীর তীরে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া হুমায়ুনের সহিত গাক্কারদের মিলনের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে মালবের শাসনকর্তা সুজায়াত খানের শাসিত মালবের সীমা সংকীর্ণ করা হইল। শের শাহের বিশ্বস্ত সেনাপতি খাওয়াস খানকে সম্বলের অদূরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করা হইল। কাজী ফজিলতকে বাঙ্গলার শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত করিয়া ইসলাম মামুদ খান শূরকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করা হইল।

ইসলাম শাহের রাজত্বে বিদ্রোহ

ইহার পর ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন হিন্দুস্থান বিজয়ের জন্য কাশ্মীরের পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইসলাম শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে হুমায়ুন পলায়ন করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতা শের শাহ কর্তৃক নিযুক্ত প্রাচীন উচ্চ কর্মচারী এবং শাসনকর্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করেন। ইহার তিন মাসের মধ্যেই ইসলাম শাহ দুরারোগ্য ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শুনিলেন যে, বঙ্গের শাসনকর্তা মামুদ খান শূর পূর্ববঙ্গ জয় করিয়াছেন।

ইস্‌লাম শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ ইস্‌লাম শাহ বিহার রাজ্যখণ্ডের সহিত পূর্ববঙ্গ সংযুক্ত করেন এবং কাশ্মীরের সুলতানকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি আফঘান আমীরদিগের বিদ্রোহী ও স্বাধীন মনোভাব দমন করিয়া রাজ্যমধ্যে রাজশক্তির একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করিয়া জ্যর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। অবশ্য এই বিষয়ে তিনি নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমীরদিগের প্রতিপত্তি ও সম্মান বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন, যথা—(১) আমীরদের পক্ষে হস্তী পোষণ নিষিদ্ধ, (২) আমীরদের পক্ষে স্বগৃহে নর্তকী পোষণ নিষিদ্ধ এবং (৩) আমীরদের পক্ষে রক্তবর্ণ শিবির বা পতাকা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তাঁহার সময়ে পরগণা বা সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হইল। প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য রাজনির্দেশ পালন আবশ্যিক বলিয়া ঘোষিত হইল। প্রতি শুক্রবারে রাজ্যের প্রত্যেক সরকারে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হইত। সেখানে রাজ্যের প্রধান কর্মচারিগণ সমবেত হইয়া ইসলাম শাহের পাদুকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক দরবারে তাঁহার ফরমান রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক পঠিত হইত।

ইসলাম শাহ্ ছিলেন সামরিক পুরুষ। তাঁহার সময় এক প্রকার নূতন সৈন্য-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তিনি সৈন্যদিগকে শ্রেণিবদ্ধ করেন এবং উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে এক-একটি সৈন্যদল গঠন করেন। প্রত্যেক সৈন্যদলে ৫০ বা ১০০ অথবা ৫০০ সৈন্য থাকিত, কখনও ৫০০০ বা ১০০০০, এমন কি ২০০০০ পর্যন্ত সৈন্য থাকিত। বোধ হয় পরবর্তিকালে সম্রাট আকবর ইসলাম শাহেব সৈন্যবিভাগেব আদর্শ অনুযায়ী মনসবদারীপ্রথা প্রবর্তন করেন।

ইসলাম শাহ্ পিতার অনুকরণে অনেকগুলি নূতন সরাই বা পান্থনিবাস নির্মাণ করেন। ডাক বিভাগে হিন্দু এবং মুসলিম কর্মচারীদের জন্য পৃথক পক্ক বা অপক্ক খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। সরাই হইতে প্রতিদিন দরিদ্রদের জন্য অর্থ বিতরণ করা হইত। সরাই হইতে গুপ্তচরগণ রাজদরবারে গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিত।

ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম শাহ্ ভদ্র ছিলেন; তিনি কবি ও গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতেন এবং ধর্ম ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুদেরও স্থান ছিল।

মুহম্মদ আদিল শাহ্ (১৫৫৩-৫৬ খ্রীঃ): ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র ফিরুজ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু শের শাহের ভ্রাতা নিজাম খানের পুত্র মুবারিজ খান শূর এই শিশুকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। মুবারিজ খানের নূতন উপাধি হইল মুহম্মদ আদিল শাহ্। আদিল শাহ্ ছিলেন হীনচরিত্র, অকর্মণ্য এবং বিলাসপ্রিয়। প্রজাবর্গ আদিলকে উপহাস করিয়া "আদলি" বা অর্ধ-সম্পূর্ণ আখ্যা দিয়াছিল। রাজ্যের বহু অকর্মণ্য লোককে তিনি রাজ-সম্মানে সম্মানিত ও উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের মধ্যে মাত্র একজন লোক পরবর্তিকালে বিশেষ ক্ষমতা ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হিমু বা হেমচন্দ্র। বিশ্বস্ততার জন্য হিমু ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন। প্রথমে হিমু ইসলাম শাহ কর্তৃক বিশ্বস্ত কার্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আদিল শাহ অনেকবার ভুল করিয়াছিলেন,

কিন্তু হিমুকে বিশ্বাস করিয়া তিনি বহু ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

আদিল শাহের দুর্বলতার সুযোগে বহু আফঘান আমীর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন। তাজ খান কররাণী বিহার অঞ্চলে, ইব্রাহিম খান শূর দিল্লী অঞ্চলে এবং আহম্মদ খান শূর 'সেকেন্দর খান শূর' উপাধি গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গলার শাসনকর্তা মুহম্মদ শাহ শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 'মুহম্মদ শাহ গাজী' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পরস্পর ঈর্ষা, বিবাদ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন।

সেকেন্দর শাহ লাহোর হইতে আশী হাজার সৈন্যসহ ইব্রাহিম শূরকে আক্রমণ করিলেন। ইব্রাহিম পরাজিত হইয়া এটাওয়ায় পলায়ন করিলেন। এই সুযোগে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কাবুল হইতে ভারতবর্ষ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং চারি মাসের মধ্যে লাহোর অধিকার করিলেন। সেকেন্দর লোদী ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবে হুমায়ুনকে প্রতিরোধের জন্য উপস্থিত হইলেন। দীপালপুরের নিকট মচ্ছিওয়ারার যুদ্ধে আফঘান সৈন্য পরাজিত হইল, সেকেন্দর শূর সরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করিলেন।

পূর্ব-ভারতে আফঘান সর্দারগণ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। আদিল শাহের সেনাপতি হিমু ইব্রাহিম শূরকে পরাজিত করিয়া বায়েনার দুর্গ অবরোধ করিলেন। অন্যদিকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা মুহম্মদ শাহ শূর দিল্লী অধিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন। হিমু এবং আদিল শাহের সম্মিলিত বাহিনী মামুদ শাহকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা অধিকার করিল।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হুমায়ুন সরহিন্দের যুদ্ধে দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার আট মাস পরে হুমায়ুন তাঁহার শেরমণ্ডল নামক গ্রন্থাগারের শিলাসোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ভারতের ইতিহাসে শূর বংশের দান : শের শাহ ছিলেন ভারতে বিলীয়মান আফঘান শক্তির সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ। মৃত্যুর পূর্বে যেমন মানুষ জীবনে প্রাণশক্তির সর্বশেষ স্পন্দন অনুভব করে, মরণোন্মুখ মানুষের মুখে যেমন জীবনের রক্তিম আভা স্ফুরিত হয়, তেমনি শের শাহের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনিও যেন অস্তায়মান আফঘান শক্তির শেষ রক্তিম আভা। সময়ের পরিমাপে শের শাহ এবং শূর বংশের রাজত্বকাল স্বল্প হইলেও উহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শের শাহ ভারতে মুসলিম শাসনের এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। প্রজানুরঞ্জন, ধর্ম নির্বিশেষে রাজকর্মচারী নিয়োগ, বিধর্মী প্রজাকে মুসলিম ধর্মরাজ্যের সৈন্য বিভাগে নিযুক্তি, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃতি, পাট্টা-কবুলিয়ত প্রথার প্রবর্তন, ভূমি পরিমাপ, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, সুদীর্ঘ পথ নির্মাণ প্রভৃতি নানা

প্রকার জনহিতকর কার্যাবলী দ্বারা ভারতের ইতিহাসে শের শাহ্ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে শের শাহ্ আদর্শ পুরুষ না হইলেও শাসনকার্যে তিনি বহু স্থায়ী সংস্কার প্রবর্তন করিয়া আদর্শ রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার কয়েকটি সংস্কার মুঘল যুগে স্থায়িভাবে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার নির্মিত পথগুলি অদ্যাপি ভারতের বিভিন্ন অংশের যোগসূত্র।

ইসলাম শাহের রাজত্বকাল বহু নারকীয় নৃশংসতার সাক্ষী; কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম কর্মচারীদের ক্ষমতার সীমা নির্দেশ এবং কর্মধারা সুনির্দিষ্ট করিয়া যান। ইহাই পরবর্তিকালে আকবর দস্তুর-উল-আমাল—Code of civil conduct অথবা service manual (রাজ ব্যবহার-কোষ) নামে প্রচার করেন। ইসলাম শাহের প্রবর্তিত সৈন্যবিভাগ-নীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আকবর মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শের শাহের জায়গিরদার-নীতি বিলোপ এবং নগদ বেতনপ্রথাও আকবর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ভারতের স্থাপত্যে ও শিল্পে শূরবংশের দান নগণ্য নহে। সংগীত শাস্ত্রে আদিল শাহ প্রবর্তিত রাগ-রাগিণী ভারতের জনমনকে অদ্যাপি উল্লসিত করে।

প্রশ্নাবলী

১। বাবরের জীবনী, কার্যাবলী ও চরিত্র বর্ণনা কর।
(Sketch the career cf Babar, and give an estimate of his character and achievements.)

২। ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য আফঘানদের সহিত মুঘলদের ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(Narrate briefly the Mughal-Afghan contest till the final conquest between 1526 to 1556 A. D.)

৩। 'হুমায়ুন' অর্থ ভাগ্যবান। বাস্তবিক পক্ষে হুমায়ুন ভারতে মহান মুঘল বংশের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন সম্রাট।'—উক্তিটি সম্প্রসারিত কর।
(Humayan means fortunate. But Humayun was the unfortunate of the great Mughals of India—Illustrate.)

৪। শের শাহের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ। রাজ্য শাসকরূপে তাহার কীর্তি আলোচনা কর।
(Trace the career of Sher Saha. What were his achievements as a Sultan?)

৫। শাসক ও যোদ্ধারূপে শের শাহের কৃতিত্ব অলোচনা কর।
(Give an estimate of Sher Saha as a soldier and as a king.)

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (খ) কবুলিয়ত ও পাট্টা (গ) ইসলাম খানের রাজত্ব (ঘ) সরহিন্দের যুদ্ধ (ঙ) খানুয়ার যুদ্ধ।

6. Write notes on: (a) First battle of Panipath, (b) Kabulyat and Patta, (c) Islam Khan's reign, (d) Battle of Sarhind, (e) Battle of Khanua.

অষ্টম অধ্যায়

মুঘল যুগ

মহামতি আকবর

অধ্যায় পরিচয়ঃ আকবরের সমসাময়িক যুগ * অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ। মধ্যযুগ তখন বিলীয়মান, সর্বদেশের চিন্তাকাশ তখন নবচিন্তার নবারুণরাগে উদ্ভাসিত। ইওরোপে রেনেসাঁ, ক্যাথলিক-প্রটেস্টাণ্ট বিরোধ, পারস্যে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ, ইসলামে মাহাদী (নূতন ধর্মসংস্থাপক) আন্দোলন, ভারতে সুফী ধর্ম-প্রবাহ—বহু ফকীর, সাধু-সন্ত, ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব—এক অপূর্ব মিলনের সুর। এই যুগে সকল দেশেই বিশেষ শক্তিশালী রাজবংশ, শক্তিমান রাজা-রাজপুরুষের আগমন, সকল রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র-শাসনে নূতন ব্যবস্থার সূচনা লক্ষিত হয়। এই মহা চাঞ্চল্যের যুগে ভারতে মুঘলবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আকবরের আবির্ভাব হইয়াছিল। আকবর ছিলেন ভারতবর্ষে জাত মুঘল রাজবংশের প্রথম সন্তান। সিন্ধুদেশে হিন্দুর গৃহে, হিন্দুর অনুগ্রহে, পারস্য দেশীয়া মাতার গর্ভে, মধ্য-এশিয়ার মুঘল পিতার ঔরসে আকবরের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের মধ্যে ভবিষ্যতের বহু ইঙ্গিত নিহিত ছিল। সহায় সম্বলহীন, রাজ্যহীন হুমায়ুন পুত্রের জন্মের সংবাদে উল্লসিত হইয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে একখণ্ড কস্তুরী বিতরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ এই আনন্দের দিনে এই শিবিরে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করার উপযুক্ত এই কস্তুরীখণ্ড ভিন্ন আমার অন্য কোন সম্বল নাই; তবু আমার আশা—এই কস্তুরীর গন্ধে যেমন এই শিবির পরিব্যাপ্ত, আমার পুত্রের যশেও সমস্ত পৃথিবী সেইরূপ পরিব্যাপ্ত হইবে।" হুমায়ুনের

আকবরের সমসাময়িক যুগ (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ)

দেশ	রাজবংশ	রাজা
ইংলণ্ড	টুডার	এলিজাবেথ
ফ্রান্স	বুরবোঁ	চতুর্থ হেনরী
জার্মানী (প্রাশিয়া)	হোহেনযোলারন	পঞ্চম চার্লস
অষ্ট্রিয়া	হ্যাপসবুর্গ	প্রথম ম্যাক্সমিলিয়ান
স্পেন	বুরবোঁ	দ্বিতীয় ফিলিপ
রোম	পোপ	সিজার বোরজিয়া
তুরস্ক	ওসমান আলী	সুলেমান (The magnificent)
পারস্য	সাফাবী	শাহ ইসমাইল, শাহ আব্বাস
ভারতবর্ষ	চাঘতাই মুঘল	আকবর

এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। অশোক ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্রাট, আকবর ছিলেন ভারতের সর্বোত্তম সম্রাট।

আকবরের জন্ম ও শৈশব ঃ হুমায়ুন আকবরের জন্মের দুই সপ্তাহ পূর্বে আসন্নপ্রসবা পত্নী হামিদা বানুকে সঙ্গে লইয়া হিন্দু-রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাট্টা অভিমুখে গমন করেন। থাট্টার অভিযান ব্যর্থ হইলে হুমায়ুন পারস্য অভিমুখে যাত্রা করেন। আকবর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই অক্টোবর) অমরকোটে (বর্তমান সিন্ধুর অন্তর্গত থর ও পার্কর জিলা) রাণা বীরশালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আকবরের জন্মের এক মাস পঁচিশ দিন পরে হামিদা বানু ও শিশু আকবর অমরকোট হইতে পঁচাত্তর মাইল দূরে ঝুনের শিবিরে হুমায়ুনের সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে হুমায়ুন সংবাদ পাইলেন—ভ্রাতা আসকারী হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এক বৎসর বয়স্ক শিশু আকবরকে ভ্রাতার অনিশ্চিত অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া হুমায়ুন হামিদা বানুকে স্বীয় পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া কান্দাহারের পথে যাত্রা করিলেন। আসকারীর পত্নী শিশু আকবরকে পুত্রস্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পর আসকারীকে পরাজিত করিয়া ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করিলেন। পর বৎসর কামরাণকে পরাজিত করিয়া কাবুল অধিকার করিলেন। সেই বৎসরই শীতকালে তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র আকবর পিতার গৃহে স্থান লাভ করিলেন।

আকবর (প্রাচীন চিত্র)

হুমায়ুন জিজি আনাঘা নাম্নী একজন বুদ্ধিমতী মুঘল নারীকে আকবরের ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। জিজি আনাঘার স্বামী শামসউদ্দীন কনৌজের যুদ্ধের পর হুমায়ুনকে সলিল সমাধি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে হুমায়ুন আকবরের জন্য দশ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন মাহাম আনাঘা। মাহাম আনাঘার পুত্র ছিলেন দুশ্চরিত্র নিষ্ঠুর আধম খান; তিনি আকবরের রাজ্যারম্ভে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আকবরের ধাত্রী মাহাম আনাঘা

চারি বৎসর চারি মাস চারি দিন বয়সে আকবরের "মকৃতব" বা শিক্ষারম্ভ হইল। পীর মুহম্মদ তাঁহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ প্রথার অনুকরণে প্রতিদিন হস্তলিপি অভ্যাস আকবরের অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ

হইত। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। আকবর বিখ্যাত ফার্সী কবি সাদির গুলিস্তাঁ ও বুলিস্তাঁ কণ্ঠস্থ করেন। কিশোর আকবর তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের অনুকরণে পায়রা পোষা, শিকার করা, ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিদ্যাচর্চা ছিল মুঘল পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আকবর ছিলেন সেই পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম। অবশ্য আকবর গতানুগতিক ভাবে শিক্ষিত না হইলেও ফার্সী ভাষা, ছন্দ ও কবিতা এবং কোরাণে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার ছন্দ ও মাত্রাজ্ঞান এত সূক্ষ্ম ছিল যে, কোন কবিতার যে-কোন ছন্দপতন তাঁহার কর্ণকে পীড়া দিত। হস্তলিপির সৌন্দর্য বিচারে আকবরের দর্শন শক্তি ছিল অপূর্ব। তিনি দশ প্রকার আরবী-ফার্সী অক্ষরের পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারিতেন। সুন্দর হস্তলিপি অনুলিখনের জন্য তাঁহার দরবারে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইত, সুন্দরতম লেখককে তিনি "স্বর্ণ কলম" উপাধি ও নগদ পুরস্কার প্রদান করিতেন।

আকবরের শৈশবের শিক্ষা

আকবরের দরবারে হস্তলিপি প্রতিযোগিতা

১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দালের মৃত্যুর পর আকবর নয় বৎসর বয়সে আনুষ্ঠানিক ভাবে গজনীর শাসনভার লাভ করেন। আকবরের প্রতিনিধি আকবরের নামে রাজ্য শাসন করিতেন। মুঘল পরিবারের রীতি অনুসারে মুঘল বাদশাহ যুদ্ধক্ষেত্রেও নামতঃ দশ বৎসরের শিশুকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু সৈন্য পরিচালনা করিতেন বিচক্ষণ সহকারী সেনাপতি। তিন বৎসরকাল আকবর নামতঃ গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরহিন্দের যুদ্ধ জয়ের পরে হুমায়ুন আনুষ্ঠানিক ভাবে আকবরকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।

কৈশোর জীবন

আকবরের সিংহাসনারোহণঃ হৃত সাম্রাজ্যের একাংশ পুনরুদ্ধার করিবার অব্যবহিত পরেই যখন হুমায়ুনের অপঘাত মৃত্যু হয়, তখন আকবরের বয়স মাত্র তের বৎসর। হুমায়ুনের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার পরিবার এবং আকবর দিল্লীর পথে গুরুদাসপুরের অন্তর্গত কালনৌর দুর্গে অবস্থান করিতে-ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ মাত্রই আকবরের অভিভাবক ও সেনাপতি সুচতুর বৈরাম খান চৌদ্দ দিনের মধ্যেই আকবরকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিন দিন পরে বৈরাম খান আনুষ্ঠানিক ভাবে কালনৌর দুর্গে আকবরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। আকবরের বয়স শাসন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিল না; সুতরাং বৈরাম খান তাঁহার অভিভাবক রূপে সাম্রাজ্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

কালনৌর দুর্গে আকবরের অভিষেক

সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই আকবর ভীষণ সংকটে পতিত

হইলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে কেবল লাহোর, দিল্লী ও আগ্রার পার্শ্ববর্তী ভূভাগই প্রকৃত পক্ষে মুঘল অধিকারে ছিল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানই ছিল তখন শূরবংশীয় আফঘান নেতৃগণের অধিকারভুক্ত। মুঘলদের সমর্থক কোন সুসংবদ্ধ শক্তি তখন ভারতে ছিল না। রাণা সংগ্রামসিংহ, দৌলত খান অথবা আলম খান লোদীর মত কোন ভারতীয় রাজা বা সুলতান অথবা আমীরবর্গ আকবরের সমর্থক ছিলেন না। হুমায়ুনের সমকালীন মুঘল আমীর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই ছিলেন আকবব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী। তাঁহাদেব মন ছিল আকবরের আদেশ সহজভাবে গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত। পরাজিত আফঘানগণ হুমায়ুনের সরহিন্দ্ বিজয়কে একটা খণ্ডযুদ্ধ রূপেই বিবেচনা করিয়াছিলেন; মুঘল-পাঠান শক্তির সর্বশেষ সিদ্ধান্ত রূপে বিবেচনা করেন নাই। ভারতের সর্বত্র পাঠান আমীর ও সর্দারগণ পুনরায় ক্ষমতা লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র চুণারের অধিপতি আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁহার পাঠান প্রভুর পক্ষে আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

আকবরের সমস্যা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

আদিল শাহ ও মন্ত্রী হিমু

হিমুর আদি নাম হেমচন্দ্র, তাঁহার জন্মস্থান রেওয়ারী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত); তিনি জাতিতে বৈশ্য (বকৃকাল), ব্যবসায়ে লবণ বিক্রেতা। ইসলাম শাহ হিমুর বুদ্ধিমত্তা দর্শনে প্রীত হইয়া অনেক সময় বিশ্বস্ত গোপনীয় কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন। আদিল শাহ রাজ্য লাভ করিয়া স্থায়িভাবে হিমুকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। হিমুর দেহ ছিল ক্ষীণ, বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল দুর্জয়, প্রভুভক্তি ছিল গভীর। আদিল শাহ জীবনে অনেক ভুল করিয়াছেন, কিন্তু হিমুকে মন্ত্রিত্বে ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া শত ভুলের ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। হিমু তাঁহার প্রভুর জন্য চব্বিশটি যুদ্ধের মধ্যে বাইশটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। হিমু আদিল শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম শূর এবং বাঙ্গলার সুলতান মুহম্মদ শাহকে পরাজিত করেন। তারপর হিমু হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে হুমায়ুনের মৃত্যু হইল। আগ্রার পথে হিমু গোয়ালিয়র অধিকার করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আগ্রা অধিকার করিলেন। এক মাসের মধ্যেই আগ্রা অধিকার করিয়া হিমু দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন, দিল্লীর শাসনকর্তা তরদী বেগ সামান্য যুদ্ধের পর সরহিন্দের দিকে পলায়ন করিলেন। হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন, দিল্লীর রাজকোষ হিমুর অধিকারে আসিল। দিল্লীর পতনের পরে শাসনকর্তা আলী কুলী সাইবনীও পলায়ন করিলেন। গোয়ালিয়র হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে হিমুর অধিকার বিস্তৃত

হিমুর পরিচয়

হিমু কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

হইল। অন্যদিকে আদিল শাহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করিলেন; ফলে সমগ্র আফঘান জাতি আদিল শাহের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আদিল শাহের জটিল পরিস্থিতিতে নিরুপায় হইয়া হিমু 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং দিল্লীর দুর্গে স্বীয় অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সমগ্র মধ্যযুগে একমাত্র হিমুই (হেমচন্দ্র) আনুষ্ঠানিক ভাবে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার রাজত্বকাল ছিল মাত্র দুই পক্ষ কাল। লক্ষাধিক তুর্ক, আফঘান এবং রাজপুত সৈন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পতাকাতলে সমবেত হইল; ইহা হেমচন্দ্রের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। হেমচন্দ্রের অগ্রগতিতে মুঘল সৈন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আকবরকে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে উপদেশ দিল।

হিমুর অভিষেক

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬): এই সংকটময় মুহূর্তে বৈরাম খান হতোৎসাহ মুঘলদিগকে বাবরের নামে নূতন উৎসাহে আহ্বান করিলেন। তিনি প্রথমেই পলাতক তরদী বেগকে পলায়নের জন্য হত্যা করিলেন। বিচ্ছিন্ন মুঘল সৈন্য সম্মিলিত করিয়া বৈরাম খান ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে আকবর ও হিমুর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধারম্ভে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিচালনায় মুঘল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এই বিজয়ের মুহূর্তে অকস্মাৎ একটি তীর বিক্রমাদিত্যের চক্ষু বিদ্ধ করায় তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ মনে করিল মহারাজ মৃত, সুতরাং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আহত মহারাজ বিক্রমাদিত্য বন্দী হইলেন। বিধর্মী হিমুকে হত্যা করিয়া 'গাজী' উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য বৈরাম খান আকবরকে অনুরোধ করিলেন। আরিফ কান্দাহারী লিখিয়াছেন—আকবর বৈরাম খানের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন—আকবর মৃতপ্রায় শত্রুকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন। তিনি হিমুর দেহ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন। তারপর বৈরাম খান স্বয়ং স্বহস্তে হিমুকে হত্যা করেন।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ: হিমুর পরাজয়

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা। বৈরাম খান এই যুদ্ধে জয়ী না হইলে ভারতে মুঘল প্রভুত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত এবং আফঘান প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইত। পাণিপথ বিজয়ের ফলে নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য চিরতরে নষ্ট হইয়া গেল। আফঘান রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নও চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। হিমুর পিতা ও পত্নী দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মেওয়াটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে হিমুর পিতা বন্দী হইলেন, কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তিনি নিহত হইলেন। পাণিপথের যুদ্ধের একদিন পরে মুঘল

পাণিপথ যুদ্ধের ফলাফল

সৈন্য দিল্লীতে প্রবেশ করিল ; তারপর আগ্রা অধিকৃত হইল। এক বৎসর পরে সেকেন্দর শূর আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। আকবর তাঁহাকে বিহারে একটি জায়গির দান করিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিদ্রোহের অপরাধে জায়গিরচ্যুত হইয়া বাঙ্গলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে মুহম্মদ আদিল বাঙ্গলার সুলতানের সঙ্গে মুঙ্গেরের যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইব্রাহিম শূর পলায়ন করিয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইভাবে পাণিপথের যুদ্ধের দুই বৎসরের মধ্যে আফঘান শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই বিজয়ের গৌরব বৈরাম খানেরই প্রাপ্য। বৈরাম খান এক বৎসরের মধ্যেই হুমায়ুনের ভগ্নী গুলরুখ বেগমের কন্যা সলিমা বেগমকে বিবাহ করিয়া মুঘল পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন।

আকবরের শাসনকাল (১৫৬২-১৬০৫ খ্রীঃ) ঃ আকবরের শাসনকালকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) অভিভাবকতন্ত্র ঃ আকবরের কৈশোরের অভিভাবক বৈরাম খানের শাসন (১৫৫৬-১৫৬০ খ্রীঃ)।

(২) নারীতন্ত্র ঃ বৈরাম খানের পদচ্যুতির পর রাজ অন্তঃপুরে আকবরের ধাত্রীমাতা মাহাম আনাঘার শাসন (১৫৬০-১৫৬২ খ্রীঃ)।

(৩) স্বৈরতন্ত্র ঃ ধাত্রীমাতার ক্ষমতা লোপের পর ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাহার পরবর্তী ছয় বৎসর আকবরের শাসনতন্ত্র মোল্লা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আকবর পরনির্ভর না হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। আকবরের স্বৈরতন্ত্র অর্থে যথেচ্ছ শাসন, স্বেচ্ছাচার, নিয়ম-ব্যবস্থার ইচ্ছামত পরিবর্তন প্রভৃতি বুঝিলে আকবরকে ভুল বুঝা হইবে। আকবরের এই শাসন ছিল প্রজানুরঞ্জক শাসন।

বৈরাম খানের অভিভাবকতন্ত্র ঃ পাণিপথের যুদ্ধের সময়ে আকবরের বয়স ছিল মাত্র পনর বৎসর ; সুতরাং অতি সহজভাবেই পিতৃবন্ধু শৈশবের অভিভাবক এবং হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাগিনেয়ী সলিমা বেগমের স্বামী বৈরাম খান স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততা গুণে সহজ ভাবেই আকবরের রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। বৈরামের উপাধি হইল খান-ই-খানান্। বৈরাম খান প্রথমেই আকবরের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মীর আবদুল লতিফ নামক একজন পারস্য দেশীয় শুভবুদ্ধি, শান্তিপ্রিয় শিয়া শেখকে আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। আবদুল লতিফ ছাত্রকে 'সুলেহ্ কুল' বা বিশ্বশান্তি মন্ত্র দান করেন।

আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পর বৈরাম খান চারি বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই চারি বৎসর ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সংকটপূর্ণ অবস্থা। বৈরাম খান পাণিপথ বিজয়ের পরে প্রথমেই অনমনীয় মুঘল মীর্জা গোষ্ঠীকে

দমন করিলেন। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গ, জৌনপুর ও সম্ভল অধিকার করিলেন, কিন্তু রণথম্বর ও চুণার জয় করিতে পারেন নাই। বৈরাম খান দুর্ধর্ষ অনুচরদের মধ্যে কাহাকেও কারারুদ্ধ করিয়া, কাহাকেও প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করিয়া, কাহাকেও হস্তি-পদতলে পিষ্ট করিয়া রাজ্যময় ত্রাসের সঞ্চার করিলেন এবং আকবরের শৈশবের শিক্ষক মোল্লা পীর মুহম্মদকে চরিত্রহীনতার জন্য পদচ্যুত করিলেন, অন্যদিকে শেখ গুদাই নামক একজন শিয়া মুসলিমকে সদর বা ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে রাজ্যের সুন্নী সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইল। ফলে রাজমাতা হামিদাবানু, ধাত্রীমাতা মাহাম আনাঘা, তাঁহার পুত্র আধম খান, কৈশরের প্রথম শিক্ষক পীর মুহম্মদ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সময় আকবর প্রায় বিশ বৎসরে উপনীত হইলেন। বৈরামের অভিভাবকত্বের ঔদ্ধত্যে আকবর প্রায়ই অসুবিধা অনুভব করিতেন; কিন্তু বৈরাম খানের গুণ, প্রয়োজন ও আত্মীয়তার জন্য আকবর তাঁহাকে প্রত্যক্ষে কিছু বলিতে পারিতেন না। একদা হামিদা বানুর অসুস্থতার সংবাদে আকবর মাতৃদর্শনের জন্য দিল্লীতে আগমন করিলেন। সেই বৎসরে অন্তঃপুরের মহিলাবৃন্দ আকবরের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, বৈরাম খান সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। দিল্লী, লাহোর এবং কাবুলের শাসনকর্তৃগণও এই অভিযোগের সমর্থন করিলেন এবং তাঁহারা আকবরের মনে তিক্ততা সৃষ্টি করিলেন। ধূর্ত মাহাম আনাঘা এই জটিল পরিস্থিতির সময় আকবরের নিকট মক্কা যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কারণ তিনি প্রচার করিলেন যে, বৈরাম খানের ভয়ে তিনি আতঙ্কিতা। মাহাম আনাঘার মক্কা যাত্রার প্রস্তাবের পর আকবর নিঃসন্দেহ হইলেন যে, বৈরাম খান সত্যই রাজ্য লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

গোয়ালিয়র, আজমীর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান পুনরধিকার

বৈরাম খানের সর্বময় কর্তৃত্ব

আকবর তখন শেখ আবদুল লতিফের মাধ্যমে বৈরাম খানকে লিখিলেন — "আমি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছি। আপনি কিছুকাল হইতে মক্কায় তীর্থযাত্রার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন; এইবার আপনার মক্কা যাত্রার সময় উপস্থিত। আপনার ব্যয়ের জন্য কয়েকটি পরগণার উপস্বত্ব মক্কায় প্রেরিত হইবে।" বৈরাম খান অত্যন্ত উদার ভাবেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজমোহর (পাঞ্জা) আকবরের হস্তে অর্পণ করিলেন। নিজের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য বৈরাম খান লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কারণ সেখানে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত বহু অর্থ ও সম্পদ ছিল। কিন্তু পুরাতন শত্রু পীর মুহম্মদ স্বেচ্ছায় একদল সৈন্যসহ বৈরাম খানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। বৈরাম খান ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং

বৈরাম খানের পদচ্যুতি

পীর মুহম্মদকে আক্রমণ করিলেন। বৈরাম খান তখন "নখদন্তহীন ব্যাঘ্র"; সুতরাং তিনি পরাজিত ও বন্দী হইলেন, বৈরাম খানকে আকবরের নিকট আনয়ন করা হইলে আকবর তাঁহার বিশ্বস্ত অভিভাবক, দুদিনের বন্ধুকে পুনরায় মক্কা যাত্রার পরামর্শ দিলেন।

বৈরাম খানের প্রতি আকবরের ব্যবহার

অতঃপর বৈরাম রাজপুতানা অতিক্রম করিয়া মক্কার পথে পাটানে (অনিলহর) উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে মুবারক খান নামক একজন আফঘান যুবক প্রতিহিংসাবশত বৈরামকে অতর্কিতে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। কারণ পাঁচ বৎসর পূর্বে মচ্ছিওয়ারায় বৈরাম খান মুবারকের পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আফঘান জাতি প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা সহজে বিস্মৃত হয় না।

আততায়ীর হস্তে বৈরাম খানের মৃত্যু

আকবর বৈরামের মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও স্ত্রী-পুত্রকে দিল্লীতে আনয়ন করিলেন। আকবর বৈরামের বিধবা পত্নী সলিমা বেগমকে বিবাহ করিলেন। শিশুপুত্র আবদুর রহিমকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এই আবদুর রহিমই পরবর্তিকালে আকবরের দরবারে নবরত্নের অন্যতম রত্নরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খান-ই-খানান উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন।

নারীতন্ত্র—মাহাম আনাঘা (১৫৬০-১৫৬২ খ্রীঃ): বৈরাম খানের পতনের মূল কারণ ধাত্রীমাতা মাহাম আনাঘার ষড়যন্ত্র। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ছলনাময়ী নারীর চাতুর্যের সম্মুখে দুর্ধর্ষ বীরের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। বৈরাম খান রাজপ্রাসাদ হইতে অপসারিত হইলেন বটে, কিন্তু আকবরের ছায়া তখনও সিংহাসন হইতে বহুদূরে। মাহাম আনাঘা প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের কার্য্য এবং সর্বময় কর্ত্রী হইলেন। মাহাম আনাঘার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, তাঁহার পুত্র আধম খানের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ। মাহাম আনাঘা বৈরামের শত্রু পীর মুহম্মদকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। মাহাম আনাঘা বৈরাম খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাহার পুত্র আধম খান এবং জামাতা শিহাবউদ্দীন মুনিম খান, পীর মুহম্মদ প্রভৃতি আমীরদের হস্তে বিচ্ছিন্ন প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন।

বৈরামের পতনের কারণ

মাহাম আনাঘার প্রাধান্য

বৈরাম খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মাহাম আনাঘার বিনা অনুমতিতে তাহার পুত্র আধম খান এবং পীর মুহম্মদ মালবের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মালবের অধিপতি ছিলেন পাঠান বীর সুজায়াত খানের পুত্র সুলতান বজ বাহাদুর। বজ বাহাদুরের বেগম রূপমতী ছিলেন অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। যেমন ছিল রূপমতীর রূপের জ্যোতি, তেমম ছিল তাঁহার সংগীতের খ্যাতি। রূপমতীর রূপ ছিল আধম খানের অভিযানের লক্ষ্য, মালব বিজয় ছিল তাঁহার উপলক্ষ্য। সারঙ্গপুরের যুদ্ধে বজ বাহাদুর পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ

করিলেন। আধম খান প্রথমেই রূপমতী লাভের আশায় বজ বাহাদুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রূপমতী প্রিয়তমের পরাজয়ের পর শত্রুহস্তে অপমানের আশঙ্কায় বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন এবং আধম খানকে নিরাশ করিলেন। রূপমতী এবং বজ বাহাদুরের প্রেম-প্রীতি ও সংগীতের কাহিনী রূপকথার মত মনোরম এবং হিন্দিকাব্যের মহামূল্য সম্পদ। বজ বাহাদুরের বহু সম্পদ ও হস্তী আধম খানের হস্তগত হইল, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজ-দরবারে আকবরের নিকট প্রেরিত হয় নাই।

আধম খান ও পীর মুহম্মদের মালব অভিযান

রূপমতী লাভে নিরাশ হইয়া আধম খান এবং পীর মুহম্মদ শেখ, সৈয়দ, মোল্লা, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দুর্গের সমস্ত অধিবাসিদিগকে হত্যা করিলেন। ইতিহাসকার মোল্লা বদাউনী এই অত্যাচারের প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন। অচিরকাল মধ্যে এই নারকীয় হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ আকবরের কর্ণগোচর হইল। আকবর আমীরদের অজ্ঞাতে সামান্য কয়েকজন অনুচর সহ দ্রুত অশ্বারোহণে মালবে উপস্থিত হইলেন। মাহাম আনাঘাও গুরুতর পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া আকবরের অনুসরণ করিয়া মালবে উপস্থিত হইলেন। মাতার পরামর্শে আধম খান আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। মাহাম আনাঘা শুনিলেন যে, বজ বাহাদুরের দুইজন অন্তঃপুরিকা তখনও জীবিতা। তাহারা আকবরের নিকট আধম খানের অত্যাচার ও ব্যাভিচার, রূপমতীর মৃত্যুর বীভৎস করুণ কাহিনী প্রকাশ করিতে পারে—এই আশঙ্কায় মাহাম আনাঘা সেই নিরাপরাধা তরুণী দুইটিকে তাঁহার সম্মুখে হত্যা করাইয়া সেই স্থানেই সমাধিস্থ করাইলেন। এই ছিল মাহাম আনাঘার চরিত্র ও মনোবৃত্তি। তিনি ছিলেন পুত্রস্নেহে ব্যাকুল, ক্ষমতালোভে অন্ধ।

মাহাম আনাঘার চরিত্র ও মনোবল

আকবর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শুনিলেন যে, জৌনপুরের শাসনকর্তা খান জামান বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। আকবর অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং জৌনপুরের দিকে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। খান জামান ভীত হইয়া বাদশাহের নিকট নতি স্বীকার-পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বিদ্রোহীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া মুঘল ইতিহাসে নূতন পৃষ্ঠা উন্মোচন করিলেন।

খান জামানের বিদ্রোহ

এই সময় কাবুল হইতে আমীর শামসউদ্দীন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। এই শামসউদ্দীন চৌসার যুদ্ধের পরে একদা হুমায়ুনকে সলিল সমাধি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই শামসউদ্দীনের পত্নী জিজি আনাঘা ছিলেন আকবরের অন্যতমা ধাত্রীমাতা। শামসউদ্দীনকে হুমায়ুন অত্যন্ত অনুগ্রহ

করিতেন ; আকবরও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। শামসউদ্দীনের উপাধি ছিল আকতা খান (অভিভাবক)। আকবর আকতা খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার হস্তে সৈন্য, অর্থ, ক্ষমতা ও শাসনভার অর্পণ করিলেন।

শামসউদ্দীনের নিযুক্তির সংবাদে মাহাম আনাঘা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি সহজেই অনুমান করিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ক্ষমতা তাঁহার অলক্ষ্যে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। মুনিম খানও শামসউদ্দীনের নিযুক্তিতে ক্ষুব্ধ হইলেন, কারণ তিনিও প্রধান মন্ত্রিপদের আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

আকবর নিজ হস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আধম খানের পরিবর্তে মালবের শাসনভার পীর মুহম্মদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। আধম খান এই পরিবর্তনে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইলেন।

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ ছিল আকবরের জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। এই বৎসর আকবর আজমীরের বিখ্যাত সুফী পীর মইনউদ্দীন চিস্‌তীর দরগায় তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে অম্বররাজ বিহারীমল (বাহরমল) মুঘল বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। রাজপুতানায় তখন অম্বর রাজ্যের বহু শত্রু ছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে মুঘল বাদশহের সঙ্গে মিত্রতার প্রয়োজন ছিল। রাজ্যমধ্যে তখন শিয়া-সুন্নী বিরোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। মুঘল বাদশাহ আকবর ধাত্রীমাতা মাহাম আনাঘা এবং স্বধর্মী মুনিম খান, আধম খান প্রভৃতি আমীরদের বারংবার বিরোধিতায় ত্যক্ত ওতিক্ত হইয়া অ-মুসলিম মিত্রের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। বিহারীমলের সঙ্গে সাক্ষাতের অবসরে উভয়েই পরস্পর মিত্রতা বন্ধনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, রাজপুত রাজকন্যা যোধবাঈ-এর পাণিগ্রহণ করিয়া আকবর মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় করিলেন। পরবর্তিকালে এই বিবাহ সমগ্র সাম্রাজ্যের রূপ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। বিবাহের পর হিন্দু রাজকন্যার মুসলিম নাম হইল মিরিয়ম জমানী (যুগলক্ষ্মী)।

অম্বর-রাজের বন্ধুত্ব : যোধবাঈ-এর বিবাহ

যুদ্ধবন্দী হইবে বিজেতার দাস—এই ছিল মুসলিম রাজত্বের পূর্বতন যুদ্ধনীতি। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই নীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই বৎসরই তিনি মাড়ওয়ারের দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করেন। কিন্তু পরাজিত শত্রু ও বন্দিদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া ভারতের মুসলিম যুদ্ধ-নীতিতে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

মার্থা দুর্গ জয়

অল্পকাল মধ্যেই আধম খান এক ভীষণ দুঃসাহসিক কার্য করিলেন। একদা নবনিযুক্ত মন্ত্রী শামসউদ্দীন (আকতা খান) রাজ-প্রাসাদে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন মুনিম খান। অকস্মাৎ আধম খান তাঁহার অনুচরবর্গসহ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দুই জন অনুচর শামস্‌-উদ্দীনের শির স্কন্ধচ্যুত করিল।

আধম খানের ইঙ্গিতে শামসউদ্দীন নিহত

আকবর তখন অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। প্রাসাদে গোলযোগের শব্দে তিনি জাগরিত হইলেন। ইত্যবসরে আধম খান মুষ্টিবদ্ধ অস্ত্রসহ আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং আকবরের তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন। আকবর মুষ্ট্যাঘাতে আধম খানকে ভূপতিত করিলেন, তারপর প্রাসাদের দ্বিতল হইতে তাহাকে উদ্যানে নিক্ষেপ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আধম খান নিহত হইলেন।

আধম খানের মৃত্যু

অতঃপর আকবর অত্যন্ত সহজভাবে অন্তঃপুরে গমন করিয়া মাহাম আনাঘার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। মাহাম আনাঘা নীরব, শান্ত; কিন্তু তিনি তীব্র আঘাত পাইলেন। এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে মাহাম আনাঘা পুত্রের গতি অনুসরণ করিলেন।

মাহাম আনাঘার মৃত্যু

আকবর মাতাপুত্রের মৃতদেহ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। কুতুবমিনারের অদূরে যৌথ সমাধি নির্মাণ করিয়া তিনি ধাত্রীমাতার ঋণ মুক্ত হইলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তিনি তখনও রাজকার্য পরিচালনায় অনভিজ্ঞ।

স্বৈরতন্ত্র: রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই আকবর কতকগুলি আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই সমস্যাগুলি ছিল তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সগোষ্ঠী বিজড়িত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সমস্যাগুলি আকবরকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। কালনৌর দুর্গে অভিষেকের সময় তাঁহার আত্মীয় পিতৃবন্ধু আবদুল মাআলী তাঁহার অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন নাই। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের দুর্দিনের বন্ধু আকবরের পরম হিতকাঙ্ক্ষী বৈরাম খান বিদ্রোহ করেন। ১৫৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের ধাত্রীমাতা মাহাম আনাঘার পুত্র আধম খান আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময়েই আকবরের বাল্যের শিক্ষক পীর মুহম্মদ খান মালবের শাসনকর্তারূপে রাজ্যমধ্যে নানা অনর্থ সৃষ্টি করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সলিল সমাধি লাভ করিয়া তিনি আকবরকে নিশ্চিন্ত করেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে উজ্‌বেগী আমীর আলী কুলী (খান জামান) এবং তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর খান আকবরের প্রতিনিধিরূপে জৌনপুরে আদিল শাহ শূরের পুত্র শের খানকে পরাজিত করেন, কিন্তু তাঁহারা আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। অথচ এই খান জামান ছিলেন আকবরের শত্রু দমনে বৈরাম খানের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। আকবর স্বয়ং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অবশ্য বশ্যতা স্বীকার করা মাত্র আকবর খান জামানকে ক্ষমা করেন।

আকবরের প্রাথমিক সমস্যা

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আত্মীয় আবদুল্লা খান উজবেগ মালবের শাসনকর্তারূপে আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। আকবর স্বয়ং আবদুল্লা খানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; আবদুল্লা খান্দেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

১৫৬৪-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই বৎসরের অধিক কাল উজবেগী আমীর গোষ্ঠী আকবরের রাজ্যে মহা সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল। দুর্ধর্ষ উজবেগী আমীরবর্গ ভারতবর্ষ বিজয়ে বাবর ও হুমায়ুনকে অকপট সাহায্য করিয়াছিলেন। উজবেগী আমীরগণ নানাস্থানে জায়গির লাভ করিয়া প্রায় স্বাধীন ভাবে দেশ শাসন করিতেন। দুর্ধর্ষ খান জামান ছিলেন জৌনপুরের শাসনকর্তা, আবদুল্লা খান উজবেগ ছিলেন মালবের শাসনকর্তা এবং খান জামানের খুল্লতাত খান আলম ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা। আকবরের স্বয়ং কর্তৃত্ব এই সমস্ত অভিমানী, দাম্ভিক, সমরকুশল আমীরদের মনঃপূত হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা একসঙ্গে আকবরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে খান আলম কনৌজে এবং খান জামান মাণিকপুরে আকবরের সৈন্যকে পরাজিত করেন। আকবর স্বয়ং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া খান জামানকে নিহত করিলেন; বাহাদুর খানকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলেন। খান জামানের মৃত্যুর পর আকবরের পথ অনেকটা নিষ্কণ্টক হইল।

জামান খান, আবদুল্লা খান ও খান আলমের বিদ্রোহ

১৫৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উজবেগী আমীরগণ আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা দুর্বল, স্বল্পবুদ্ধি, কর্মকুণ্ঠ মীর্জা হাকিমকে আকবরের রাজ্য আক্রমণে উৎসাহিত করিলেন। মীর্জা হাকিম সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হইলেন। আকবর এই সংবাদ শ্রবণে লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলেন (নভেম্বর, ১৫৬৬ খ্রীঃ)। মীর্জা হাকিম যুদ্ধ না করিয়াই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মীর্জা হাকিম হুমায়ুনের মত কার্যারম্ভে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন, কার্য-মধ্যে আরামের জন্য অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেন।

মীর্জা হাকিমের প্রথম ভারত আক্রমণ

তৈমুরের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধর একটি চাঘতাই শাখা বাবরের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছিল। যুদ্ধ ছিল তাহাদের জীবিকা। ভারতবর্ষ জয়ের পরে তাহারা আশা করিয়াছিল যে, বিজিত রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজত্বকালে উহা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং মীর্জা ইব্রাহিম হোসেন, মীর্জা মুহম্মদ হোসেন, মীর্জা মামুদ হোসেন প্রভৃতি মীর্জাগণ পঞ্জাবের সম্ভল অঞ্চলে মহা গণ্ডগোল সৃষ্টি করিলেন। মুনিম খান কর্তৃক বিতাড়িত মীর্জা আমীরগণ মালবের প্রান্তদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুনরায় মুনিম খান তাঁহাদিগকে গুজরাটে বিতাড়িত করিলেন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট অভিযান করিয়া মীর্জা মুহম্মদ হোসেনকে বন্দী কবিয়াছিলেন।

মীর্জা বিদ্রোহ

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজস্ব বিভাগে কঠোরতা ও শাসন বিভাগে নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করায় মুসলিম কর্মচারিগণ এবং ধর্মে উদারতা প্রচারের

ফলে উলামা ও মোল্লাগণ আকবরের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা ও বিহারে বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন।

তাঁহারা আকবরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মীর্জা হাকিমকে সিংহাসন দানের ষড়যন্ত্র করিলেন। জৌনপুরের কাজী ইয়াজদী বিধর্মী আকবরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করিয়া প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ সমর্থন করিলেন। বিহারের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাদশাহ স্বীকার করিয়া তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ করিলেন। আকবরের রাজধানীর কোন কোন উচ্চ কর্মচারী মীর্জা হাকিমের সঙ্গে গোপনে যোগ দিলেন। এমন কি আকবরের দিওয়ান শাহ মনসুরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পূর্বদিক হইতে বাঙ্গলা ও বিহারের আমীরগণ এবং পশ্চিম দিক হইতে মীর্জা হাকিম দ্বিতীয় বার দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া আকবর অবিলম্বে দিল্লীর সন্দেহভাজন কর্মচারিদিগকে বন্দী করিলেন, দিওয়ান শাহ মনসুরকে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড প্রদান করিয়া গুপ্ত বিদ্রোহীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করিলেন। ইতোমধ্যে মীর্জা হাকিম যুদ্ধ না করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আকবর মীর্জা হাকিমের পশ্চাদনুসরণ করিয়া কাবুলে উপস্থিত হইলেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে (১০ই অগস্ট) মীর্জা হাকিম আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর মীর্জা হাকিমকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সহোদরা ভগ্নী বক্‌ত-উন্নিসা বেগমের হস্তে কাবুলের শাসনভার অর্পণ করিলেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি সুবাতে রূপান্তরিত হইল। মীর্জা হাকিম বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম হইলে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের অবস্থা জটিলতর হইত।

আকবরের বিরুদ্ধে উলামা ও মোল্লাগণের ষড়যন্ত্র

মীর্জা হাকিমের ষড়যন্ত্র

মীর্জা হাকিমের বশ্যতা স্বীকার

মীর্জা হাকিমের মৃত্যু

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র আজমীরের শাসনকর্তা সলিম আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত আকবর তাঁহার আত্মীয়গোষ্ঠীর নিকট হইতে সুব্যবহার লাভ করেন নাই।

আকবরের রাজ্য জয়ঃ মধ্য-এশিয়ার চাঘতাই তুর্কবংশজাত আকবর ছিলেন যোদ্ধবংশের সন্তান, তাঁহার শরীরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই বীর—চেঙ্গিস এবং তৈমুরের রক্ত প্রবাহিত। পিতামহ বাবরের আদর্শে এবং পিতৃবন্ধু বৈরামের শিক্ষায় আকবর সহজভাবেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। সমসাময়িক যুগে মানুষকে আত্মরক্ষার জন্যও সমর-কুশলতা অর্জন করিতে হইত। আকবর বলিয়াছেন, "রাজা রাজ্য জয় করিবেন, এই নীতি স্বাভাবিক, তাহা না হইলে প্রতিবেশী রাজা তাঁহার বিরোধিতা করিবেন। সৈন্যগণ যুদ্ধ না করিলে অভ্যাসের

আকবরের যুদ্ধনীতি

অভাবে তাহাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা নষ্ট হইয়া যাইবে, সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হইবে।” তখনও নববিজিত (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ), হস্তচ্যুত (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ), পুনর্বিজিত (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তর ভারতের উপর মুঘল শাসন
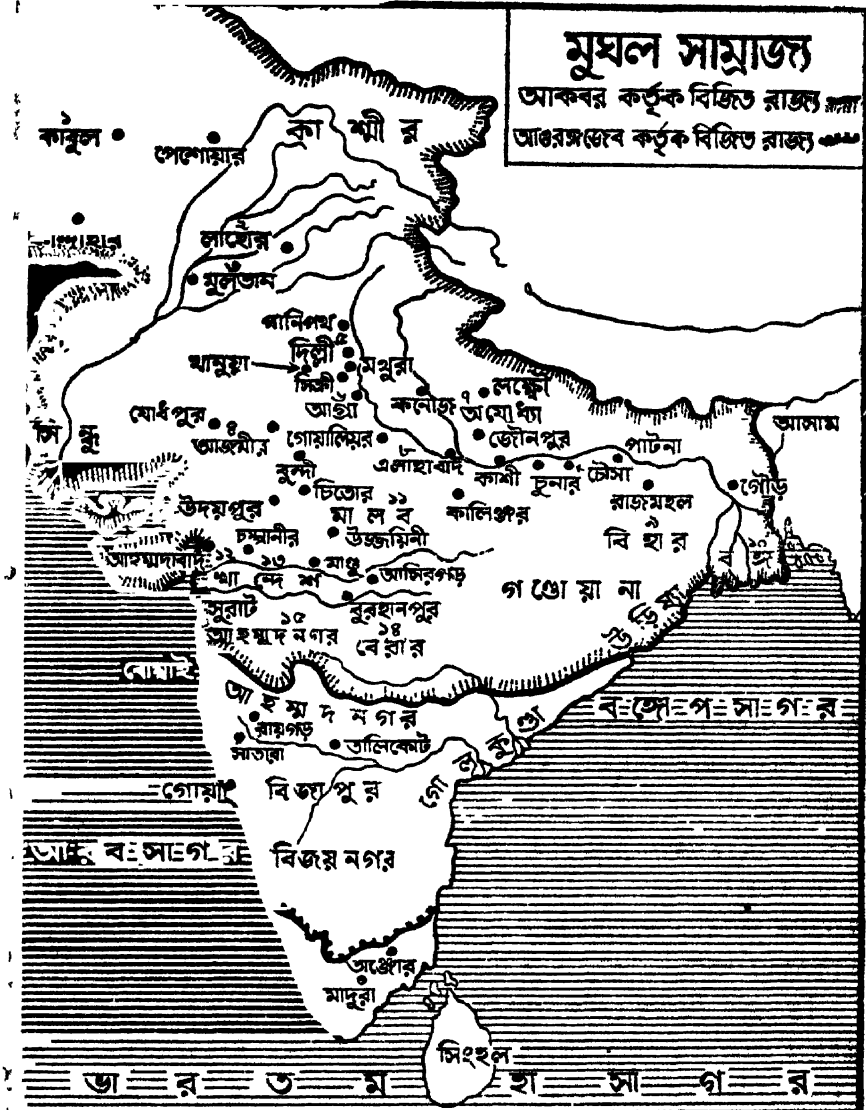
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আকবরকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তদুপরি বৈরামের পদচ্যুতি, আধম খানের দুষ্কৃতি, আত্মীয়বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অনমনীয় রাজপুত গোষ্ঠী এবং সদ্য বিজিত স্বাতন্ত্র্য-

বিলাসী পাঠান জাতির বৈরিভাব আকবরকে সহজ ভাবে সমরমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং আকবর জীবনের প্রথম হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন—কোথায়ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, কোথায়ও বা রাজ্যসীমা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়, আবার কোথায়ও রাজনৈতিক কারণে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন সরহিন্দের যুদ্ধে পঞ্জাবের অতি সামান্য অংশ জয় করিয়াছিলেন। আকবরের পিতৃরাজ্য কাবুল আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হাকিম কর্তৃক প্রায় স্বাধীন ভাবেই শাসিত হইতেছিল। মুহম্মদ আদিল শাহ শূর এবং ইব্রাহিম শূর মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয়ের পরে বৈরাম খান গোয়ালিয়র এবং নিকটবর্তী অঞ্চল জয় করেন। আলী কুলী খান (খান জামান) পঞ্জাবের অন্তর্গত সম্ভল অধিকার করেন। বৈরাম খানের মৃত্যুর পর আধম খান মালব জয় করেন (১৫৬১-৬২ খ্রীঃ)। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে চুণার বিজিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরই মাড়ওয়ারের দুর্ভেদ্য দুর্গ মার্থা বিজিত হইল।

আকবরের রাজ্যারম্ভ
মুঘল রাজ্যসীমা

আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গণ্ডোয়ানা (বর্তমান জব্বলপুর) আক্রমণ করিলেন। গণ্ডোয়ানার রাজা বীরনারায়ণ ছিলেন নাবালক। রাণীমাতা দুর্গাবতী বীরনারায়ণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি সেনাপতি আসফ খানের অধীনে যুদ্ধরত অর্ধলক্ষ মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে অতি সামান্য সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্গাবতীর পুত্র বীরনারায়ণ আহত হইয়া মাতার উপদেশক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। রাণী দুর্গাবতী তীরবিদ্ধ হইলেন এবং শত্রুহস্তে অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। অচিরকাল মধ্যে বীরনারায়ণও নিহত হইলেন। গণ্ডোয়ানার রাজপুত নারীগণ জহরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নারীত্বের সম্মান রক্ষা করিলেন। গণ্ডোয়ানার কিয়দংশ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিল।

গণ্ডোয়ানা বিজয়,
রাণী দুর্গাবতী

চিতোর বিজয়ঃ মালবরাজ বজ বাহাদুর পরাজিত হইয়া ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাণা উদয়সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিধর্মী হইলেও মেবারের রাণা বজ বাহাদুরকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং অম্বররাজ বিহারীমলকে আকবরের হস্তে কন্যা সমর্পণের জন্য তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে মেবারের রাণার উপর আকবর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

মেবারের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল আমেদাবাদ ও দিল্লীর মধ্যবর্তী

অঞ্চল। মেবারের মধ্য দিয়াই ছিল দিল্লী ও আমেদাবাদের যোগাযোগের পথ। সর্বোপরি মেবার ছিল রাজপুতানার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় রাজ্য। সুতরাং আকবর মেবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত করিলেন। পাঁচ মাস চেষ্টার পর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কামান সজ্জিত করিয়া চিতোর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কামানের একটি গোলার আঘাতে রাজপুত সেনাপতি জয়মল ভীষণ ভাবে আহত হইলেন। জয়মলের আহত হওয়ার সংবাদে রাজপুত সৈন্য বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। দুর্গমধ্যস্থ রাজপুত নারীগণ রাত্রিকালে জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। আহত জয়মল পরদিন প্রভাতে অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তিনি নিহত হইলেন। রাজপুত সৈন্যগণ রাণা সর্দার উদয়সিংহকে নিরাপত্তার জন্য আরাবল্লী পর্বতে প্রেরণ করিল। শিশোদীয় যুবক পাত্তা সিংহ বা পুত্ত সিংহ সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। পুত্ত তাঁহার মাতা ও পত্নীসহ রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সংখ্যাধিক মুঘল সৈন্যের সম্মুখে রাজপুত সৈন্যদল প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে আকবর দুর্গদ্বারে মুঘল সৈন্যের স্তূপীকৃত শবদেহ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গমধ্যস্থ ত্রিশ সহস্র রাজপুত অধিবাসিদিগকে নির্মমভাবে হত্যার আদেশ দিলেন এবং তাঁহাদের ছিন্নমুণ্ড দ্বারা বিজয় তোরণ রচনা করিলেন। এই নির্মম কার্য আকবরের শরীরে প্রবাহিত নৃশংস পূর্ব-পুরুষের রক্তধারা প্রমাণ করে। অবশ্য পরবর্তিকালে জয়মল ও পুত্তের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহাদের মর্মর মূর্তি আগ্রার দুর্গদ্বারে স্থাপন করিলেন। ইহা ছিল আকবরের ভারতীয় রূপ।

চিতোর আক্রমণ : জয়মল ও পুত্তের বীরত্ব

রণথম্ভরের রাজা সুরজন রায় ছিলেন মেবারের সামন্ত রাজা। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রণথম্ভরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং প্রায় দুই মাস কামান বেষ্টন করিয়া দুর্গ অবরোধ করেন। অম্বরের রাজকুমার ভগবান দাসের মধ্যস্থতায় ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সুরজন রায় আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন। সুরজন রায় বশংবদ সামন্তরূপে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রণথম্ভরের দুর্ভেদ্য দুর্গজয়ের ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে আকবরের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল।

রণথম্ভর বিজয়

কালিঞ্জরে শের শাহের পতন হইয়াছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার পর্বতোপরি অবস্থিত এই কালিঞ্জর দুর্গ ছিল লোকচক্ষে দুর্ভেদ্য। চিতোর এবং রণথম্ভর দুর্গ পতনের সংবাদে ভীত হইয়া রাজা রামচাঁদ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কালিঞ্জর দুর্গ আকবরের হস্তগত হইল। বুদ্ধিমান আকবর রামচাঁদকে এলাহাবাদের নিকট একটি ক্ষুদ্র জায়গির প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

কালিঞ্জর বিজয়

অম্বর রাজকুমার ভগবানদাসের প্ররোচনায় যোধপুরের রাজকুমার চন্দ্রসেন

এবং বিকানীরের রাজা কল্যাণমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই বৎসরই জয়শলমীরের রাজা হররায় বিনাযুদ্ধে স্বেচ্ছায় আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আকবর হররায়ের এক কন্যা এবং বিকানীরের রাজপরিবারের অন্য এক কন্যা বিবাহ করিয়া মুঘল-রাজপুতের আত্মীয়তা বন্ধন দৃঢ় করিলেন।

মাড়ওয়ারের পতন (১৫৭০ খ্রীঃ)

গুজরাট বিজয়ঃ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর প্রায় সমগ্র রাজস্থানের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেন। অবশিষ্ট রহিল মেবার এবং মেবারের বশংবদ রাজ্য ডুঙ্গরপুর এবং প্রতাপগড়। আকবর শুনিয়াছিলেন যে, একদা তাঁহার পিতা হুমায়ুন গুজরাট জয় করিয়াছিলেন। গুজরাট ছিল শস্যশ্যামলা; গুজরাট ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্র—তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য এবং ইওরোপীয় বণিকদের ভারতীয় বিপণি, গুজরাট ছিল মক্কা তীর্থ-যাত্রীর আরোহণ এবং অবতরণের ক্ষেত্র। এই সময়ে পর্তুগীজ জলদস্যুগণ মক্কা যাত্রিদিগকে যীশু মাতা মেরীর চিহ্নযুক্ত টিকিট খরিদ করিতে বাধ্য করিত। মানুষের চিত্রাঙ্কিত কোন দ্রব্য ব্যবহার ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। এই সমস্ত কারণে আকবর নিরঙ্কুশ ভাবে গুজরাট জয়ের সিদ্ধান্ত করিলেন।

প্রথম অভিযান (১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ)

গুজরাটের রাজনৈতিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ ছিলেন দুর্বল, ভীরু ও কাপুরুষ; আমীরবর্গ ছিল আত্মকলহে বিপর্যস্ত। আকবরের বিদ্রোহী আত্মীয় মীর্জাগোষ্ঠী রাজ্য মধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল। গুজরাটে বিদ্রোহী আমীর ইতমাদ খান দিল্লীর বাদশাহকে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে তৃতীয় মুজাফর খান পরাজিত হইয়া শস্যক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকবর তাঁহাকে বন্দী করিয়া গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মীর্জা আজিজ কোকা গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথে আকবর বাণিজ্যকেন্দ্র সুরাট জয় করিলেন।

আকবরের প্রত্যাবর্তনের পরে গুজরাটের সমস্ত আমীরগণ মীর্জা আজিজ কোকাকে আক্রমণ করিল। আকবর এই সংবাদ শুনিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ এগার দিনের মধ্যে ৪২৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমেদাবাদে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহিগণ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, আকবর এরূপ দ্রুতগতিতে গুজরাটে উপস্থিত হইতে পারিবেন। আকবর স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া শত্রু নিপাত করিলেন। পর্তুগীজ জলদস্যু ও বণিকগণ ভীত হইয়া আকবরের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। আকবর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে আগ্রায় কয়েকজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিলেন। আকবরের সহিত ইওরোপীয়

গুজরাটের দ্বিতীয় অভিযান (১৫৭৩খ্রীঃ)

জাতির এই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। এই সাক্ষাতের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল; খ্রীষ্টানের সংস্পর্শে আকবরের ধর্মমত নানা দিক দিয়া প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

আকবরের বঙ্গ বিজয় (১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ) ঃ শূর বংশের পতনের পর বিহারের শাসনকর্তা পাঠান জাতীয় সুলেমান কররাণী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যা জয় করিয়া মালদহের নিকট তানডাতে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দাউদ খান কররাণী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং দাউদ খানকে পরাজিত করেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন—সুবর্ণরেখার পূর্ব তীরে তুকারাও গ্রামের যুদ্ধে মুনিম খান দাউদ খানকে পরাজিত করেন। কিন্তু দাউদ খান পর বৎসর বাঙ্গলা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত ও নিহত হইলেন। বাঙ্গলা দেশ স্থায়ী ভাবে মুঘলের অধিকারে আসিল।

দাউদ খান নিহত হইলেও বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিক (বার ভুঁইঞা) মুঘলদের বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশ বৎসর সংগ্রাম করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের (বরিশালের) কন্দর্পনারায়ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য এবং পূর্ববঙ্গের ঈশা খাঁ বিখ্যাত। তাঁহারা দীর্ঘকাল দিল্লীর বাদশাহকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। মুঘল প্রতিরোধে পর্তুগীজগণ বার ভুঁইঞাকে নৌসেনা ও সেনাপতির দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহ ও আকবর ঃ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর বিজিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল মেবারের পূর্ব সীমান্তে, সুতরাং পশ্চিমাংশে তখনও মেবারের রাণা উদয়সিংহের আধিপত্য ছিল। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ বর্তমান উদয়পুরের অদূরে গোগণ্ডা দুর্গে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। সিংহাসনে আরোহণের দিন তিনি মুঘলদিগের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরণ যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করিলেন। এদিকে আকবরও মেবারের সর্বাংশ জয়ের পণ করিলেন—বীরের সঙ্গে বীরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয়ের এক মাসের মধেই আকবর সুকৌশলী রাজপুত সেনাপতি মানসিংহকে প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন—সঙ্গে অম্বর রাজের চার সহস্র অশ্বারোহী, এক সহস্র অন্যান্য রাজপুত সৈন্য এবং পাঁচ সহস্র তুর্কী উজবেগ। প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহ আকবরের পক্ষে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। রাণা প্রতাপের সঙ্গে ছিল ন্যূনাধিক দুই সহস্র সৈন্য। প্রতাপসিংহের পক্ষে হাকিম খান শূর এবং জয়মলের পুত্র রামদাস রাঠোর সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। মানসিংহ আরাবল্লী পর্বতসন্ধির সানুদেশে বানাস নদীর তীরে

গোগণ্ডা বা হলদিঘাটের যুদ্ধ

হলদিঘাটের প্রান্তরে মুঘল সৈন্য সমাবেশ করিলেন। রাণা প্রতাপ সৈন্যদের পশ্চাদ্দেশ হইতে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া মুঘল সৈন্য ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। কিন্তু মুঘল সৈন্যের সংখ্যাধিক্য এবং কামান ও অন্যান্য রণসম্ভারের তুলনায় প্রতাপসিংহের রণসম্ভার ছিল নগণ্য। যুদ্ধের মধ্যকালে হঠাৎ সংবাদ প্রচারিত হইল যে, আকবর স্বয়ং মানসিংহের সাহায্যার্থে হলদিঘাটের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া মুঘল সৈন্য রাণা প্রতাপকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। রাণা প্রতাপের জীবন বিপন্ন হইল। এই সংকটময় মুহূর্তে বীর বিদা ঝালা প্রতাপের শির হইতে রাজমুকুট তুলিয়া নিজ শিরে স্থাপন করিলেন। ঝালার শিরে মুকুট দর্শন করিয়া মুঘলসৈন্য রাণা প্রতাপ মনে করিয়া বীর ঝালাকে আক্রমণ করিল। রাণার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর রাণার অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিয়া রণক্ষেত্রের অপর প্রান্তে লইয়া গেল বীর ঝালা প্রভুর প্রাণ রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাজপুতের রক্তে হলদিঘাটের বণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। রাত্রিতে রাণা প্রতাপ গোগণ্ডা পরিত্যাগ করিলেন। হলদিঘাটেব যুদ্ধের ফলে মানসিংহ মেবারের সামান্য অংশই অধিকার করিলেন।

রাণা প্রতাপসিংহ

বাণা প্রতাপ আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে রাজ পরিবার ও বিশ্বস্ত অনুচরবর্গেব সহিত নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। অসীম শক্তিমান দিল্লীর বাদশাহ সহায়-সম্বল বিহীন রাণা প্রতাপকে কখনও প্রলোভন, কখনও ভীতি প্রদর্শন, কখনও বন্ধুত্বের বাসনা জ্ঞাপন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বাজপুত কুলতিলক রাণা সংগ্রামসিংহের বংশধর রাণা প্রতাপ আকবরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রতাপ কখনও মুঘলসৈন্য কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, কখনও উন্মুক্ত আকাশের নীচে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, কখনও বা দিনান্তে শাকান্ন বা সবুজ "ঘাসের রুটি" আহার করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যতদিন চিতোর মুসলিম হস্ত হইতে উদ্ধার না হইবে, ততদিন তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন এবং স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্রে ভোজন করিবেন না। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। রাণা প্রতাপ কখনও মুঘলদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই বা কোন শিশোদীয় রাজকুমারীকে মুঘল হস্তে সমর্পণ করেন নাই।

চির স্বাধীন প্রতাপ

প্রতাপের মৃত্যুর সময় আকবর খান্দেশ ও আহম্মদনগরের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং আকবর রাণা প্রতাপের মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে রাণা প্রতাপ তাঁহার অনেকগুলি পার্বত্য দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অমরসিংহ পিতার দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে মেবার বিজয় আকবর সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

আকবরের জটিলতম পরিস্থিতি (১৫৭৬-১৫৮২ খ্রীঃ) ঃ ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর কাল আকবর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—জ্ঞাতি মীর্জা গোষ্ঠী, সধর্মী আফঘান সামন্ত এবং অনমনীয় রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করিয়া পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে বঙ্গদেশ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা তীর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন—অবশিষ্ট ছিল মাত্র মেবারের রাণা প্রতাপ, কাশ্মীরের ইয়ুসুফ মীর্জা, সিন্ধুর মীর্জা জানি বেগ, উড়িষ্যার পাঠান বীর কুতলুঘ খান এবং অর্ধ-স্বাধীন ভ্রাতা মীর্জা হাকিম। এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে এবং পরে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকবর শাসনব্যবস্থায়, রাজস্বে, ধর্মে নানা প্রকার নূতন বিধি-নিষেধ ও সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল গুজরাটে নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর জায়গিরদারদের বহু জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত করেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুরাতন জায়গিদারগণ, জমিদারগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। হিন্দু টোডরমল মুসলিমের জমি ব্যবস্থা করিবেন ইহা মুসলিমদের পক্ষে ছিল অসহ্য।

আকবরের বিরোধী-মনোভাবের কারণ

(১) টোডরমলের রাজস্বব্যবস্থা

এই বৎসরই আকবর ফতেপুর শিক্রীর অভ্যন্তরে ইবাদৎখানা নামক প্রার্থনা-মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে অমুসলিম হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি সকল ধর্মের লোকের সঙ্গে ধর্মীয় আলাপ আলোচনা হইত। আকবরের আদেশে বিধর্মীদের পুস্তক—হিন্দুর বেদ, গীতা, খ্রীষ্টানদের বাইবেল, বৌদ্ধদের সূক্ত, অগ্নি উপাসকদের গাথা ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইল। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং ধর্মগুরু উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরই গোয়া হইতে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ইবাদৎখানার ধর্ম আলোচনায় যোগদান করিলেন। মুসলিম বাদশাহের পক্ষে অমুসলিমদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা মোল্লা ও উলামাগণ ইসলামের পক্ষে অপমানজনক মনে করিল। আকবরের অন্তঃপুরে হিন্দুনারীর অবস্থিতি, আকবরের হিন্দু-প্রীতি, উচ্চপদে হিন্দু নিযুক্তি, হিন্দু ধর্ম-পুস্তক আলোচনা ও অনুবাদ প্রভৃতি কার্য দর্শনে প্রাচীনপন্থী মুসলিমগণ আকবরের মুসলিমত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

(২) বিধর্মীর সহিত ধর্মালোচনা

তাহার উপর এই সময়েই আকবর সমাজ ও আচার-ব্যবহারে কয়েকটি নূতন

নীতি প্রবর্তন করেন, যথা—একজন পুরুষ সাধারণত একটি মাত্র নারী বিবাহ করিবে (ইসলামে চারি স্ত্রী বিবাহ ধর্মানুমোদিত), কেহ ইসলামের পবিত্র মুস্তাফা, মুহম্মদ, আহম্মদ, ফতিমা (মুহম্মদের কন্যা) ইত্যাদি নাম ব্যবহার করিতে পারিবে না। আকবর মক্কা যাত্রা নিষিদ্ধ করিলেন, কারণ পর্তুগীজ দস্যু জলপথে এবং ইসমাইলিয়াগণ স্থলপথে মক্কাযাত্রিদিগের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিত। দরবারগৃহে নমাজ-পড়া নিষেধ করিলেন, কারণ নমাজের নামে কর্মচারিগণ সরকারী কাজে অবহেলা করিত।

(৩) আকবরের সমাজ-সংস্কার

অন্যদিকে আকবর হিন্দুর উপরের জিজিয়া কর, স্নানকর, তীর্থকর রহিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানের জন্য গীর্জা ও কবর নির্মাণ অনুমোদন করিলেন, জৈনদের অহিংসা নীতি অনুসারে আকবর সপ্তাহে দুইদিন পশুবধ ও রাজকীয় শিকার নিষিদ্ধ করিলেন। হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত করায় স্বার্থান্বেষী বহু আমীর আকবরের প্রতি রুষ্ট হইল। মসজিদের জন্য প্রদত্ত জমি ভূমি-কবুলিয়তের মধ্যে লিখিত নির্দিষ্ট সীমার অধিক হইলে, উদ্বৃত্ত জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। ইসলাম ধর্মের ভাষা আরবীর পরিবর্তে আকবর ফার্সী ভাষার অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। অবশ্য আকবর হিন্দুর সতীদাহ, বহু-বিবাহ, শিশু-বিবাহ ইত্যাদি প্রথা বিলোপেরও চেষ্টা করেন।

(৪) আকবরের উদার দৃষ্টিভঙ্গী

মুসলিম মোল্লাগণ সংস্কারক আকবরকে ইসলাম বিদ্বেষী আকবর রূপে জন-সমক্ষে প্রত্যক্ষ নিন্দা আরম্ভ করিল। জৌনপুরের কাজী ইয়াজদী প্রকাশ্যে ফতোয়া প্রচার করিলেন—আকবর ধর্মহীন, ইসলাম বিরোধী ; সুতরাং তিনি মুসলিমের সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন না ; আকবরের বিরুদ্ধে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ইসলামের অনুমোদিত। এইবার আকবরের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। সুদূর বিহার ও বাঙ্গলা দেশেই এই বিদ্রোহের কেন্দ্র স্থাপিত হইল। বিদ্রোহিগণ স্থির করিলেন যে, আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমকে দিল্লীর সিংহাসন দান করিবেন। এই সময়েই ইবাদৎখানার অভ্যন্তরে ধর্মের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম মোল্লাদের মধ্যে তীব্র ও অশোভন মতভেদ প্রকটিত হইয়া উঠিল। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শেখ মুবারক (আবুল ফজলের পিতা), মোল্লা সরহিন্দ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত উলামা প্রচার করিলেন যে, ধর্মের ব্যাখ্যা ব্যাপারে মতভেদ হইলে বাদশাহের মতই অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। এই প্রচারপত্রের নাম মহজর। ধর্ম ব্যাখ্যাতা-রূপে মোল্লাদের একচ্ছত্র মর্যদা নষ্ট হইল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের বিখ্যাত দুইজন মোল্লা—সদর আবদুন নবী এবং প্রধান কাজী আবদুল্লা সুলতানপুরী গুরুতর অপরাধের জন্য পদচ্যুত হইলেন।

(৫) মোল্লাদের প্রচার

কাবুল হইতে বাঙ্গলা দেশ পর্যন্ত সর্বত্র মুসলিমদের মনে আকবরের বিরুদ্ধে

একটা বিদ্রোহী মনোভাব সৃষ্টি হইল। আকবরের দিওয়ান শক্তিমান শাহ্ মনসুর এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মান্ধতা সংযোজিত হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিল। ইহাই ইতিহাসে **বাংলার বিদ্রোহ** নামে পরিচিত। পাণিপথের যুদ্ধের পর আকবর এমন কঠিন সংকটের সম্মুখীন হন নাই।

বাঙ্গলার বিদ্রোহ

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার শাসনকর্তা মুজাফর খান বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হইলেন। মীর্জা হাকিম স্বয়ং কাবুল হইতে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গলা দেশ হইতে বিদ্রোহিগণ অযোধ্যার পথে দিল্লী যাত্রা করিল। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থির, ধীর, বিচক্ষণ আকবর বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বয়ং পশ্চিমে মীর্জা হাকিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বাংলার দিকে সসৈন্যে হিন্দু সেনাপতি টোডরমলকে প্রেরণ করিলেন। রাজধানীতে গুপ্তশত্রু মনসুরকে সর্বজন সমক্ষে আম্বালার নিকট বৃক্ষশীর্ষে বিলম্বিত করিয়া ফাঁসী দিলেন; বহু ষড়যন্ত্রকারীকে সন্দেহবশত কারারুদ্ধ করিলেন এবং হস্তিপদতলে পিষ্ট করিয়া ত্রাসের সৃষ্টি করিলেন। মীর্জা হাকিম ছিলেন ভীরু, মদ্যপায়ী, অব্যবস্থিত চিত্ত। মীর্জা হাকিম আকবরের ভয়ে ভীত হইয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আকবর মীর্জা হাকিমের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। মীর্জা হাকিম কাবুল হইতে পলায়ন করিলেন। এক মাসের মধ্যে আকবর কাবুলে প্রবেশ করিলেন। আকবর ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত না করিয়া মীর্জা হাকিমের সহোদরা ভগ্নী বকৃত-উন্নিসা বেগমের হস্তে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। আকবর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এক মাসের মধ্যে দীন-ই-ইলাহী নামক নূতন 'ধর্মপথ' এবং 'ইলাহিয়া' নামক ধর্ম সম্প্রদায় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবর্তন করেন।

মীর্জা হাকিমের বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন : কাবুলে নূতন শাসনব্যবস্থা

মীর্জা হাকিম আকবরের আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পরে আকবরের সম্মতি ক্রমে ভগ্নী বকৃত-উন্নিসার পক্ষে রাজ্যশাসন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যু হইলে কাবুল দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আকবর ও দাক্ষিণাত্য : তুর্ক-আফঘান যুগের অন্তভাগে ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশাল বাহমনী রাজ্য পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া গেল। এই পঞ্চধা বিভক্ত বাহমনী রাজ্যের চারিজন সুলতান মিলিত হইয়া ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ধ্বংস করেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর কর্তৃক বেরার বিজিত হইল।

আকবরের সমকালে দাক্ষিণাত্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা। সাম্রাজ্যবাদী আকবর উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং সীমান্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া দাক্ষিণাত্যের দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ্ চারিটি রাজ্যের বশ্যতা দাবি করিয়া একই দিনে চারিজন দূত প্রেরণ করিলেন।

খান্দেশের সুলতান রাজা আলী খান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, অন্য তিনটি রাজ্য বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিল। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্জাদা মুরাদ এবং বিখ্যাত সেনাপতি আবদুর রহিম খান-ই-খানান আহম্মদনগর অবরোধ করিলেন। খান্দেশের সুলতান আলী খান মুঘলদের সাহায্য করেন। তখন আহম্মদনগরের সুলতান ছিলেন মুজাফর শাহ্। এই বিপদে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের বিধবা পত্নী আহম্মদনগরের সুলতান নিজাম শাহের কন্যা চাঁদ সুলতানা ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাফরের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। চাঁদ সুলতানা আহম্মদনগর রক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মুঘলদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির শর্ত হইল—আহম্মদনগর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিবে, বেরার রাজ্য মুঘল হস্তে সমর্পণ করিবে এবং মুঘল রাজধানীতে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিবে। সব শর্তই ছিল মুঘল বাদশাহের অনুকূল।

এই অপমানজনক সন্ধির শর্ত আহম্মদনগরের আমীরবর্গ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। আমীরবর্গ চাঁদ সুলতানাকে ষড়যন্ত্রের সন্দেহে হত্যা করিল। কেহ বলেন, চাঁদ সুলতানা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আবুল ফজলের নেতৃত্বে মুঘল সৈন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর জয় করিল। আহম্মদনগরের সুলতান নিজাম শাহ্ বন্দী হইলেন; কিন্তু আহম্মদনগরের আমীরবর্গ আহম্মদশাহী বংশের একজন দুর্বল সন্তানকে বাদশাহ্ নির্বাচিত করিয়া মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। আহম্মদনগর রাজ্য তখনও সম্পূর্ণ বিজিত হয় নাই।

বিজাপুরের সুলতান আকবরের শক্তিতে ভীত হইয়া আকবরের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

বিজাপুরের সুলতান রাজা আলী খান আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মীরণ বাহাদুর শাহ্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তিনি সাতপুরা পর্বতোপরি আসীরগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুঘল সৈন্য প্রতিরোধ করিলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশের রাজধানী বুহরাণপুর অধিকার করিলেন। কিন্তু আকবর আসীরগড় দুর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে দুর্গ মধ্যে ভীষণ মহামারী আরম্ভ হইল; পঁচিশ সহস্র দুর্গবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

খান্দেশ বিজয়

সেনাপতি মুকারিব খানের মধ্যস্থতায় আকবর সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন; মীরণ বাহাদুর সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু আকবর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুকারিব খানকে হত্যা করিলেন এবং মীরণ

বাহাদুরকে বন্দী করিলেন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ্-এর মতে আসীরগড় দুর্গ বিজয় আকবরের জীবনে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। আবুল ফজল বলেন, মহামারীর দুর্দৈবের জন্য আসীরগড়ের পতন হইয়াছিল। উভয় উক্তিই আংশিক সত্য।

আসীরগড় দুর্গ বিজয়ের পরে আকবর আর কোন রাজ্য জয় করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর, বেরার ও খান্দেশকে সংযুক্ত করিয়া একটি সুবা গঠিত হইল। শাহজাদা দানিয়াল এই সুবার প্রথম সুবাদার নিযুক্ত হইলেন।

আকবরের সীমান্তনীতি: কাশ্মীরের ভৌগোলিক সংস্থান ছিল পঞ্জাব সীমান্তে পর্বতসন্ধির মধ্যস্থলে। বাণিজ্যের জন্য কাশ্মীর ছিল মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোজিত—বিদ্রোহী পার্বত্য জাতিগুলি প্রায়ই কাশ্মীরের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকবরের পক্ষে লোভনীয় ছিল। আকবরের সাম্রাজ্যসীমা সুসংহত করিবার জন্য কাশ্মীরের উপর প্রভুত্বের প্রয়োজন ছিল। আকবর প্রথমে কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফ খানকে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকারের জন্য আহ্বান করিলেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফ খান তাঁহার পুত্রকে লাহোরে আকবরের দরবারে প্রেরণ করেন। আকবর এই সময়ে বিদ্রোহী ইউসুফ খান এবং মান্দার প্রভৃতি আফঘান গোষ্ঠীকে দমনের জন্য বীরবল, জৈন খান, কোকলতাস প্রভৃতি সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু বীরবল এই যুদ্ধে নিহত হইলেন; তাঁহার মৃত দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। বন্ধু-বিয়োগে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া আকবর অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি টোডরমল্ল ও মানসিংহকে কাশ্মীরে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ আফঘান শক্তিকে খাইবার গিরিবর্ত্মের নিকট ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেন।

মানসিংহ

কাশ্মীর বিজয় (১৫৮৫ খ্রীঃ)

আকবর ভবিষ্যতে দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতির গোলযোগ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যকে দিল্লীর অধীন করিবার জন্য আয়োজন করেন। বিখ্যাত সেনাপতি ভগবানদাস সসৈন্যে শ্রীনগর অধিকার করিলেন। সুলতান ইউসুফ খান মুঘল শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন; শর্ত হইল, কাশ্মীরের সকল মসজিদে আকবরের নামে খুৎবা পঠিত হইবে; আকবরের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইবে। আকবর ইহাতেও সন্তুষ্ট না।

হইয়া কাশ্মীর অধিকার করিলেন এবং কাশ্মীরকে কাবুলের অন্তর্গত একটি সরকারে পরিণত করিলেন। ইউসুফ খান পাঁচশতী মনসবদার পদে নিযুক্ত হইলেন।

পরবর্তিকালে কাশ্মীর মুঘল রাজপরিবারের গ্রীষ্মাবাস ও রাজোদ্যানে পরিণত হইয়াছিল। মুঘলরাজগণ কাশ্মীরে নিশাত বাগ, শালিমার বাগ, চশমা শাহী, চার চীনার বাগ রচনা করিয়াছিল। কাশ্মীর ছিল মুঘল রাজপরিবারের ভূ-স্বর্গ।

সিন্ধু বিজয় (১৫৯১ খ্রীঃ)

গুজরাট বিজয়ের সময় আকবর সিন্ধুর উত্তরে ভাক্কার দুর্গ জয় করেন। কিন্তু তখনও সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চল অবিজিত ছিল, কান্দাহারের পথ নিরাপদ করিবার জন্য সিন্ধুর সীমান্তে দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আকবর আবদুর রহিম খান-ই-খানানের পুত্র আবদুর রহমানকে সিন্ধু আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তুর্কমান সুলতান মীর্জা জানি বেগকে দুইটি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ সিন্ধু দেশে থাট্টা ও সিহান দুর্গ জয় করেন। মীর্জা জানি বেগ হাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত হইলেন এবং দীন-ই-ইলাহী মতবাদ গ্রহণ করিলেন।

উড়িষ্যা বিজয় (১৫৯২ খ্রীঃ)

মুঘল সাম্রাজ্যের দূরতম পূর্ব সীমান্ত ছিল বিহার ও বঙ্গদেশ। আফঘান শক্তি পরাভূত হইলেও তাহাদের অধীনে কয়েকটি খণ্ড রাজ্য ছিল। বিহারের আফঘান সর্দার কুত্‌লুঘ খান লোহানী মুঘল সীমান্ত হইতে উড়িষ্যার গড়-মান্দারণ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বাঙ্গলার সুবাদার মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। যুদ্ধের পূর্বে কুত্‌লুঘ খান পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র নিসার খান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান খান জগৎসিংহের বিরোধিতা করিলেন এবং পুরী পর্যন্ত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যা বিজিত হইল। ওসমান খান ও জগৎসিংহের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর উপাখ্যানবস্তু।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অধিকার (১৫৯৫ খ্রীঃ) : সেনাপতি মীর মাসুম খান বেলুচিস্তানের বিখ্যাত শিবি দুর্গ অধিকার করেন। পনী জাতীয় আফঘান সর্দার কর্তৃক মাকরান ও বেলুচিস্তান মুঘল হস্তে অর্পিত হইল।

কান্দাহার বিজয় (১৫৯৫ খ্রীঃ)

কান্দাহার ছিল পারস্য সুলতানের অধীন, শাসনকর্তা ছিলেন মুজাফর হোসেন মীর্জা। পারস্য সুলতানের সহিত মনোমালিন্যের ফলে তিনি আকবরের কিল্লাদার শাহ বেগের সম্মুখে দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিনা যুদ্ধে কান্দাহার দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হইল। মুজাফর হোসেন মীর্জা বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ মুঘল দরবারে অভ্যর্থিত হইলেন এবং পাঁচ হাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত হইলেন

আকবরের অন্তিম জীবন : আকবরের শেষ জীবন অত্যন্ত অস্বস্তিকর হইয়াছিল। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ অত্যধিক মদ্যপানের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সলিম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয় পুত্র শাহজাদা সলিমের ইঙ্গিতে আবুল ফজলের নিষ্ঠুর হত্যা আকবরকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের প্রিয় পুত্রবধূ মানবাঈ অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিলেন। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মাতা হামিদাবানু বেগম ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পুত্র দানিয়াল সুরামত্ত অবস্থায় বুর্হাণপুরে প্রাণত্যাগ করেন। ঐ বৎসরে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে মানসিংহ এবং মীর্জা আজিজ কোকা সলিমকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সলিম-পুত্র খসরুকে সিংহাসন দানের চেষ্টা করিলেন। আকবর এই
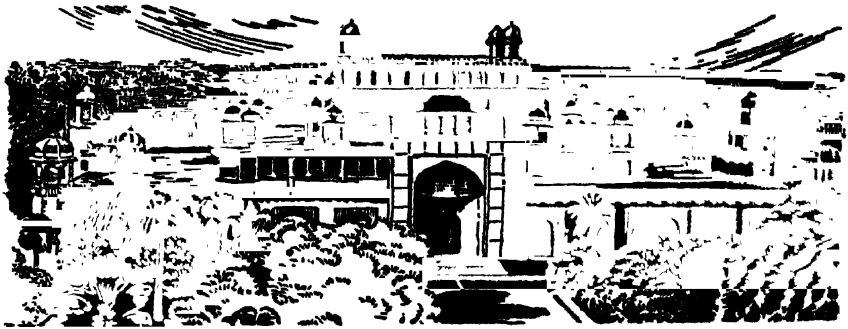
আকবরের সমাধি—সেকেন্দ্রা

জটিল ও শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে অকস্মাৎ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন, সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। রোগশয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আমীর এবং আত্মীয়বর্গের সম্মুখে আকবর সলিমকে অঙ্গুলি সংকেতে আহ্বান করিলেন এবং ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে রাজমুকুট পরিধান ও হুমায়ুনের তরবারি গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ফলে সিংহাসনের দ্বন্দ্ব নিরসন হইল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তেষট্টি বৎসর বয়সে আকবর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আগ্রার অদূরে সেকেন্দ্রায় তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

আকবরের ধর্মমত : চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী সমস্ত পৃথিবীতে ধর্মালোড়ন, ধর্মালোচনা এবং ধর্মসংস্কারের যুগ। এই সময়ে ভারতে চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু, মীরাবাঈ প্রভৃতি বহু সাধু-সন্ত, সাধক ও সুফী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইওরোপেও এই সময়ে প্রটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিকের বিপ্লব, ইসলামে শিয়া-সুন্নী, মহাদী ও সুফী আন্দোলন চলিতেছিল। সম্রাট আকবর

এই যুগের সন্তান। তিনিও ধর্মবিপ্লবের তরঙ্গঘাত হইতে মুক্তি পান নাই। আকবর ছিলেন জন্মে স্থন্নী মুসলমান। প্রথমে বৈরাম খানের প্রভাবে তিনি শিয়াদিগের উপর সামান্য অত্যাচারও করেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীর সলিম চিস্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতে তিনি সুফী রহস্যবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন।

ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন

কিছুকাল পরে শেখ মুবারক ও তাঁহার দুই পুত্র, ফৈজী ও আবুল ফজলের সংস্পর্শে আকবর ধর্ম-ব্যাপারে অপরূপ দৃষ্টি লাভ করেন। ধর্মালোচনার জন্য তিনি ফতেপুর শিক্রীতে ইবাদৎখানা বা উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে প্রথমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম উলামা এবং পরে হিন্দু, জৈন, পারসিক, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, অগ্নি-উপাসক, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও সাধুগণ সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। ইবাদৎখানার প্রচ্ছদপটে বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীক-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, ফলে আকবরের সভায় ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয় সহজ হইয়াছিল।

ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন

যথার্থ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকবরের অনুরাগ ছিল, কিন্তু তিনি মোল্লা আচরিত ধর্মান্ধতার বিরোধী ছিলেন। তিনি ইসলামের অনেক আবর্জনা দূর করিয়া বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। আকবরের মন ছিল যুক্তিবাদী; অন্ধ বিশ্বাস তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে নাই। ঐতিহাসিক বদাউনী এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মতে আকবর ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মক্কা যাত্রীদের জন্য একশত খানি জাহাজ নির্মাণ করাইয়াছিলেন (জাহাজ-ই-ইলাহী)।

দীন-ই-ইলাহী মতবাদ প্রবর্তন

প্রত্যেক মক্কাযাত্রীকে নগদ ছয় শত তঙ্কা খয়রাত দান করিতেন। ইসলাম ধর্মত্যাগী হইলে ইহা সম্ভব হইত না। আকবরের চিন্তাধারার মধ্যে সকল ধর্মের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদ **দীন-ই-ইলাহী** (দিব্যধর্ম) নামে পরিচিত। ইহা নূতন ধর্ম নহে এবং কোরাণের মত-বিরোধীও নহে। দীন-ই-ইলাহীর দশটি নির্দেশের মধ্যে নয়টিই কোরাণ অনুমোদিত। নূতন মতবাদ প্রচারের পূর্বে এবং পরে তিনি মুসলিম সমাজের মধ্যে সংস্কারমূলক কয়েকটা ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন। ধর্মান্ধ মোল্লাগণ এই সংস্কারগুলির জন্য আকবরকে বিধর্মী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। দীন-ই-ইলাহী মতবাদিগণ **ইলাহীয়া** নামে পরিচিত। ইলাহীয়াগণ মস্তকে বাদশাহের প্রতিকৃতি ধারণ করিতেন, পরস্পরকে সম্ভাষণ করিবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া অভিনন্দন করিতেন। ইলাহীয়াগণ সম্রাটের জন্য সম্পদ, জীবন, ধর্ম ও সম্মান উৎসর্গ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। কাহাকেও প্রলোভন প্রদর্শন বা শাস্তির ভয় দ্বারা ইলাহীয়া মতে প্রবর্তিত করা হয় নাই।

সম্ভ্রান্ত মুসলমান ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র আঠার জন ইলাহীয়া ছিলেন এবং হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র বীরবল।

দীন-ই-ইলাহী সার্বজনীন ধর্মরূপে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। এই ধর্মের পশ্চাতে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপন, সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ এবং সংস্কার আকাঙ্ক্ষা ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষণ। আকবরের মৃত্যুর পর দীন-ই-ইলাহী সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার প্রপৌত্র দারা শিকো এবং প্রপৌত্রী জাহানারাই দীন-ই-ইলাহী ধর্মের সর্বশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু আকবরের এই সমন্বয়ী ধারা আওরঙ্গজেবের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় মন হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

দীন-ই-ইলাহী মতের বিলুপ্তি

আকবরের সাম্রাজ্যবাদ: আকবর সাম্রাজ্যবাদের কোন বিশেষ আদর্শ গ্রহণ করিয়া রাজ্যারম্ভ করেন নাই; কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তনে আকবরের সাম্রাজ্য-নীতির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু আকবর ছিলেন যথার্থ সাম্রাজ্যস্রষ্টা—দেহ-মনের প্রতি পরামাণুতে তিনি ছিলেন সম্রাট। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সুলতান "ঈশ্বরের ছায়া" বা জিল-ই-ইলাহী (জিল—ছায়া)। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে রাজা ঈশ্বরের অংশসম্ভূত—হিন্দুর এই মনোভাব আকবরের মনঃপূত ছিল। ভারতীয় চিন্তাধারায় রাজদর্শন ছিল প্রজার পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য; আকবর প্রতিদিন প্রাসাদের পূর্বমুখী অলিন্দে উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গকে দর্শন দান করিতেন, প্রজাকুল রাজদর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত। আকবর জীবনের প্রথম ভাগে নিজেকে মুসলিম সম্রাট-রূপেই কল্পনা করিয়াছেন। মুসলিম রাজনীতি অনুসারে—রাজ্যসীমা বিস্তার এবং ইসলাম ধর্ম রক্ষা অবশ্য-কর্তব্য। ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু আকবর রাষ্ট্রকে ধর্মের বাহনরূপে গ্রহণ করেন নাই। এখানেই আকবরের সঙ্গে মোল্লাদের মতভেদ।

আকবর প্রথম হইতেই শত্রুকে শত্রুরূপেই বিবেচনা করিয়াছেন. রাজ্যারম্ভে তাঁহার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান শত্রুই অধিক ছিল। সগু পরাজিত আফঘান গোষ্ঠী এবং স্বধর্মীয় আত্মীয় মীর্জা-গোষ্ঠী দীর্ঘকাল তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিল। রাজ্য জয় ব্যাপারে আকবর রাজ্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য করেন নাই, বরং আকবর হিন্দু শত্রুদের ব্যাপারে ন্যূনাধিক উদার ভাবাপন্ন ছিলেন।

শত্রুর প্রতি সমদৃষ্টি

সাম্রাজ্যবাদের তিনটি দিক—রাজ্য জয়, রাজ্য রক্ষা, রাজ্য শাসন। রাজ্য জয়ের জন্য আকবর প্রধানত সাম (মৈত্রী), দান (উৎকোচ), ভেদ (শত্রুর মধ্যে বিচ্ছেদ ও শত্রুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা) এবং দণ্ড (যুদ্ধ)—এই চারি প্রকার নীতি অনুসরণ করিতেন। আকবর রাজপুতদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মৈত্রী (সাম) স্থাপন করেন, উৎকোচ প্রদান (দান) করিয়া

আসীরগড় দুর্গ ও কান্দাহার জয় করেন এবং শত্রুর মধ্যে বিভেদ (ভেদ) সৃষ্টি করিয়া আহম্মদনগর জয় করেন। প্রয়োজন বোধে তিনি গণ্ডোয়ানা, চিতোর, রণথম্ভর, গুজরাট, বাঙ্গলা, কাশ্মীর, সিন্ধু ও উড়িষ্যা অঞ্চলে যুদ্ধনীতি (দণ্ড) অবলম্বন করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে তিনি বিধর্মী প্রজার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে এক নূতন নীতি প্রবর্তন করেন।

সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ

আকবরের রাজপুত ও হিন্দুনীতি ঃ আকবরের রাজ্যারম্ভে ভারতবর্ষে কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। সে যুগের ভারতীয় হিন্দু নরপতিদের মধ্যে রাজপুতগণই ছিলেন অনমনীয়। আকবর দেখিলেন, রাজপুতগণ পরাজিত হয়, কিন্তু নতি স্বীকার করে না। সুতরাং রাজপুতদের সম্বন্ধে যুদ্ধ-নীতির পরিবর্তে তিনি মৈত্রী নীতি অবলম্বন করেন। তিনি যেখানে সম্ভব রাজপুত পরিবারের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে কোথাও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, কোথাও মনসবদাররূপে, কোথাও সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। তিনি মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে (মিরিয়ম যমানী) বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র শাহজাদা সেলিমের সঙ্গে বিহারীমলের পুত্র ভগবানদাসের কন্যা মানবাঈ-এর (শাহ বেগম) বিবাহ দেন। ভগবানদাসের পালিত পুত্র মানসিংহ ছিলেন তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি, বহু বিখ্যাত যুদ্ধের নায়ক এবং বহুকালব্যাপী বাঙ্গলার সুবাদার। টোডরমল ছিলেন রাজস্বসচিব ও পাঁচ হাজারী (পরে সাত হাজারী) মনসবদার। এই মৈত্রী-নীতির ফলে রাজপুতানার মাড়োয়ার, বিকানীর, যয়শলমীর, বুন্দী, কোটা প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে। পরবর্তিকালে অনেকে মুঘল পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মুঘল বাদশাহের আত্মীয়গোষ্ঠিভুক্ত হইলেন। আকবর সহজাত উদারতা বশে হিন্দুর পক্ষে গ্লানিকর জিজিয়া ও তীর্থকর রহিত করিয়াছিলেন, ফলে হিন্দুদের মনে মুসলিম বিরোধী উষ্মা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। আকবর হিন্দুদের নূতন মন্দির নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করেন নাই এবং প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করেন নাই। বিধর্মীর সঙ্গে নীতিগত ভাবে সহাবস্থান ও মৈত্রী মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের নূতন রূপ। আকবরের দরবারে নবরত্নের মধ্যে বিহারীমল, বীরবল, টোডরমল এবং ধর্মান্তরিত হিন্দু সংগীতজ্ঞ তানসেনও ছিলেন। তাঁহার রাজ-চিকিৎসক ছিলেন চন্দ্রসেন, রাজচিত্রকর ছিলেন দশনাথ ও বসাওন (বসন্ত) এবং রাজসভায় অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক মধুসূদন সরস্বতী। বাস্তবিক পক্ষে মুঘল যুগে ভারতের সমৃদ্ধির মূলে ছিল আকবরের হিন্দুনীতি ও হিন্দু-প্রীতি। মৈত্রী দ্বারা রাজ্য-বিজয় আকবরের সাম্রাজ্যবাদের একটা বিশেষ

আকবরের মৈত্রী-নীতি

রাজপুত নারী বিবাহ ও রাজপুতদের সৌহার্দ্যলাভ

আকবরের সহজাত উদারতা ও হিন্দুপ্রীতি

লক্ষ্যণীয় দিক। রাজ্যজয়ের পরে বশংবদ, করদ এবং মিত্ররাজগণ তাঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি ব্যবহার করিতেন; আকবর বিজিত অথচ প্রত্যর্পিত রাজ্যের বংশানুক্রমিক শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতেন না, রাজন্যবর্গ বৎসরে নির্দিষ্ট সময়ে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া উপহার প্রদান করিতেন, সম্রাটের জন্মোৎসব বা সিংহাসনারোহণ উৎসবে যোগদান করিতেন; এমন কি প্রয়োজনের সময় যুদ্ধেও যোগ দিতেন।

আকবরের সাম্রাজ্যরক্ষা তথা সামরিক ব্যবস্থা: আকবর সাম্রাজ্য জয় করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি রাজ্যরক্ষার জন্য সৈন্য, দুর্গ, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র, শিবির, চিকিৎসালয় ইত্যাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। আকবরের সময়ে ভারতীয় চতুরঙ্গ সৈন্যের পরিবর্তে পঞ্চাঙ্গ সেনা-বাহিনী ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী-বাহিনী, গোলন্দাজ ও নৌবহর। বশংবদ রাজা বা মনসবদারগণ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। রাজকীয় কোন সামরিক যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। সৈন্যাধ্যক্ষ, মনসবদার এবং রাজন্যবর্গ নিজ নিজ ব্যবস্থা নিজেরাই করিতেন। সাধারণভাবে বণিকগণ সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া যাতায়াত করিত। সাধারণ সৈন্যদের অস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, বর্শা, গদা, তরবারি, গুপ্তি, ছোরা, শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্ধ, ঢাল ইত্যাদি; গোলন্দাজদের ছিল বন্দুক, কামান ইত্যাদি। নৌবাহিনীর কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু, গুজরাট ও লাহোর। স্মিথ বলেন—আকবরের স্থায়ী সৈন্যসংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। যুদ্ধের সময় তিনি অধিক সৈন্য নিযুক্ত করিতেন এবং মনসবদার ও বশংবদ বা মিত্র রাজারা সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। গোলন্দাজ বিভাগে পর্তুগীজ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল। হিন্দু-মুসলমান যোগ্যতানুসারে সৈন্যবিভাগে যোগদান করিতে পারিত এবং উচ্চপদ লাভ করিত। মুঘল সৈন্য ও শিবির ছিল চলন্ত নগর—শিবিরের সঙ্গে ভ্রমণ করিত দরবার, মোসাহেব, দপ্তর, কারখানা এবং বাজার। নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ ছিল শিবিরের অচ্ছেদ্য অংশ। রাজপরিবার—বেগম, বাঁদী, দাস-দাসী এবং অনুচরবর্গ শিবিরের অনুগমন করিত। আকবর স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতেন; তিনি সম্ভ্রান্ত রাজপুত পরিবারের সন্তান ভিন্ন কোন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহার তিন পুত্র বিভিন্ন যুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য বাদশাহ্‌জাদাদের সাহায্যের জন্য গুণানুসারে হিন্দু-মুসলমান অভিজ্ঞ সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন।

আকবরের সাম্রাজ্যে শাসনব্যবস্থা: শাসনব্যবস্থা ও সুশাসন ছিল সাম্রাজ্যবাদের একটি দিক। সাম্রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই আকবর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেন। আকবর নীতি ও স্থিতির দিক দিয়া ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বের নব রূপায়ণ করিয়াছিলেন। আকবর

সাম্রাজ্য সংগঠন

প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাই মুঘল রাজত্বকে আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণের অযোগ্যতা সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী করিয়াছিল।

আকবরের পূর্বে সৈন্যাধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিদিগকে বেতনের পরিবর্তে জায়গির প্রদান করা হইত। এই প্রথায় রাজকোষে বিশেষ অর্থাগম হইত না এবং জায়গিরদারগণের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা অনেক সময় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেন। এইজন্য দূরদর্শী আলাউদ্দীন, শের শাহ এবং ইসলাম শাহের অনুকরণে আকবর জায়গির-প্রথা রহিত করিয়া মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। দশ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ সহস্র পর্যন্ত অশ্বারোহী (সওয়ার) এবং পদাতিক (জাত) সৈন্য লইয়া 'মনসব' পদ গঠিত হইত। অশ্বগুলিকে রাজকীয় মোহরাঙ্কিত করা হইত। সৈন্যদের নাম 'পরিচয় দপ্তরে' লিখিত থাকিত। প্রতি দলের নায়কের উপাধি ছিল "মনসবদার"। মনসবদারগণ তেত্রিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। পদের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দেওয়া হইত। যুদ্ধকালে রাজকীয় বাহিনীর সহিত সসৈন্যে যোগদান করা তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল।

মনসবদার বিভাগ

আকবরের শাসননীতি তাঁহার গভীর রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। বাবরের বাহুবলে মুঘল সাম্রাজ্যের যে ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল, আকবরের পরাক্রমে উহা সমগ্র উত্তর-ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দূরদর্শী আকবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাহুবলে রাজ্য জয় করা যায় সত্য, কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন শাসক ও শাসিতের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্বন্ধ। ইহার জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মধ্যযুগে ভারতে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ একতাবদ্ধ রাষ্ট্রসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদারনৈতিক ভিত্তিতে সুশাসন প্রবর্তন এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে অন্তরের যোগস্থাপন—ইহাই ছিল আকবরের শাসনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য।

আকবরের শাসনপদ্ধতি

দিল্লীর অন্যান্য সুলতানগণের ন্যায় আকবরও ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু তিনি প্রজা ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্যই স্বেচ্ছাচার প্রয়োগ করিতেন। তিনি একাধারে সম্রাট, সেনাপতি, বিচারক ও ধর্মসমস্যার মীমাংসক ছিলেন। কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণা-সভা বিভিন্ন বিভাগের অধিনায়করূপে আকবরকে শাসনকার্যে সাহায্য করিত। রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিল "দিওয়ান" (Minister of Revenue), সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষ "মীরবক্স" (Pay Master General), সরকারী কারখানাসমূহের অধ্যক্ষ "মীরসামান' (Steward General), ধর্ম, বিচার এবং দাতব্য বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল "সদর" (Head of Charity Department)। অনেক সময় "উকিল" (Lord Privy Seal)

কেন্দ্রীয় শাসন

উপাধিধারী আর একজন মন্ত্রীও থাকিতেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদার অধিকারী হইলেও কার্যত তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না।

প্রাদেশিক শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য প্রথমে বারটি, পরে পনরটি "সুবা" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবায় "সিপাহশালার" বা "নাজিম" উপাধিধারী একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্তিকালে তাঁহারাই 'সুবাদার' নামে পরিচিত হন। সম্রাটের অনুগ্রহের উপর সুবাদারকে নির্ভর করিতে হইত সত্য, কিন্তু সুবার অভ্যন্তরে তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি সাধারণ শাসন ও সামরিক বিভাগের কর্তা ছিলেন; প্রত্যেক সুবায় 'দিওয়ান' উপাধিধারী একজন উচ্চ কর্মচারী রাজস্ব বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রত্যেকটি সুবা ছিল আবার কয়েকটি 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক সরকারের শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'ফৌজদার'। 'কোতোয়াল' নগরের শান্তি ও শৃঙ্খল রক্ষা করিতেন। 'মীর আদল' এবং 'কাজী'র উপর দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত ছিল। অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মচারিগণের মধ্যে 'সদর' (ধর্ম ও দান বিভাগের অধ্যক্ষ), 'আমীল' (রাজস্ব আদায়কারী), 'বিতিকৃচি' (রাজস্বের হিসাবরক্ষক), 'পোতদার' বা হিসাবরক্ষক, 'ওয়াকিয়ানবীশ' বা সংবাদলেখক, 'কুফিয়ানবীশ' অথবা গোয়েন্দা বা গুপ্তচরের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল কর্মচারী সুবাদারকে শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার একচ্ছত্র ক্ষমতাও সংযত রাখিতেন।

প্রাদেশিক শাসন

রাজস্ব বিভাগ ঃ রাজস্ব সচিব টোডরমলের সাহায্যে আকবর রাজস্ব-বিভাগে বহু সংস্কার সাধন করেন। শের শাহের দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজকর নির্ধারণের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ বা পরিমাপ করান হইল। উর্বরতা ও কৃষির সম্ভাবনা অনুসারে চাষের জমি পোলাজ, বানজর, চাচর এবং পরতি—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অথবা উহার নগদ মূল্য রাজকররূপে নির্ধারিত ছিল। এই ভূমি-বিভাগ বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। রাজকর হিন্দুযুগের তুলনায় বেশী ছিল সত্য; কিন্তু অন্যদিকে আকবর অনেকগুলি অন্যায় কর ও শুল্ক রহিত করিয়া প্রজাদের করভার লাঘব করিয়াছিলেন।

বিচার বিভাগ ঃ শের শাহের ন্যায় আকবরও ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে প্রাসাদের দর্শনিয়া মঞ্জিল নামক পূর্বমুখী গবাক্ষ হইতে প্রজাদের রাজদর্শন দিতেন এবং প্রজাদের অভিযোগ শুনিতেন। বাদশাহের অনুমোদন ব্যতীত কাহারও প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ করা হইত না। প্রদেশের শাসনকর্তাও বাদশাহের অনুকরণে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার করিতেন। কাজী এবং মীর আদল উপাধিধারী

কর্মচারিগণ ছিলেন বিচারক এবং 'মুফতি'গণ ছিলেন আইনের ব্যাখ্যাকার। নগরের কোতোয়াল (কুটপাল) শান্তিরক্ষা করিত এবং সাধারণ অভিযোগের বিচার করিত। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুযুগের পঞ্চায়েৎ প্রথা বর্তমান ছিল। সৈন্যদের বিচারের জন্য 'কাজী-উল-আসকারী' (আসকারী—সৈন্য) নামধারী বিচারক নিযুক্ত ছিল। রাজ্যে মুসলিম দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল ; কিন্তু হিন্দুদের বিবাহ, সম্পত্তি-বণ্টন ও জাতিভেদ-ব্যাপারে হিন্দু-নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করা হইত।

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : আকবর ছিলেন পিতৃরক্তে চাঘতাই তুর্ক, মাতৃরক্তে পারসিক, জন্মে ভারতীয়। তাঁহার গাত্র ছিল গোধূমবর্ণ, দেহ ছিল নাতিদীর্ঘ। তিনি ছিলেন ঘন-কৃষ্ণ কেশবিশিষ্ট, খর্বনাসিক, প্রশস্ত ললাট ; নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাট তিল। তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, পেশীবদ্ধ গঠন, মোঙ্গলদের অনুরূপ গোলাকৃতি মুখমণ্ডল, মুণ্ডিত শ্মশ্রু, আজানুলম্বিত বাহু দূর হইতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর অথচ মধুর। তাঁহার সর্বদেহে রাজবংশের আভিজাত্য-চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। ক্রুদ্ধ হইলে আকবরের মুখমণ্ডল পশুরাজের মতন তীক্ষ্ণভাব ধারণ করিত, গুম্ফরাজি বিকম্পিত হইত। আকবরের দেহে ছিল দৈত্যের শক্তি। তিনি একবার তরবারির এক আঘাতে একটি সিংহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে আগ্রা হইতে মালবে দুই শত সত্তর মাইল পথ অশ্বারোহণে গমন করিয়া আধম খানকে প্রতিহত করিয়াছিলেন ; ফতেপুর শিক্রী হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আহম্মদাবাদ পর্যন্ত চারি শত পঞ্চাশ মাইল পথ এগার দিনে অতিক্রম করিয়া মুহম্মদ হোসেনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহে ক্লান্তিবোধ ছিল না। রৌদ্র, বৃষ্টি, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—সকল ঋতুতে তিনি সমান উৎসাহে কাজ করিতেন। প্রকৃতি ছিল তাঁহার পরম বান্ধব ; প্রকৃতি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। আকবর মিতাহারী ছিলেন। জীবনের প্রথমে তিনি প্রতিদিন মাংসাহার করিতেন, পরে তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি রাজ্যমধ্যে সপ্তাহে দুইদিন পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন। রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি সূর্য উপাসনা করিতেন। মৃত্যুর পূর্বে একবার ভিন্ন তিনি কখনও রোগশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ; নীরোগ, সুস্থ, কর্মক্ষম জীবন ছিল তাঁহার পরম সম্পদ।

আকবরের দেহশ্রী

আকবরের সামরিক ও দৈহিক শক্তি

আকবরের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর নানা দুঃখ ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার পরবর্তী জীবনে বিশেষ সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। অন্যদিকে পারস্যের কমনীয় প্রকৃতির কোমল পরিবেশ এবং ফার্সী কবির উপদেশমূলক কবিতাবলী তাঁহার শিশুমনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পারস্যের জাতীয় উৎসব, মীনাবাজার, নওরোজ, ঈদ ও মহরমের ঐতিহ্য আকবর কখনও বিস্মৃত হয় নাই। ফার্সী

ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আনুষ্ঠানিক ভাবে আকবরের দরবারে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার দরবারে একশত পঞ্চাশ জন ফার্সী কবি, চিত্রকর, সেনানায়ক সমাদৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আকবরের সময়ে পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক সমন্বয়ী সাংস্কৃতিক মিলন হইয়াছিল। আকবরের চরিত্রের উপর এই সমন্বয়ী প্রভাব তাঁহার মাতার শিক্ষাগুণে এবং শৈশবে পারস্যবাসের ফলে সম্ভব হইয়াছিল।

আকবরের চরিত্রে পারসিক প্রভাব

রাজ্যলাভ করিয়া প্রথমে আকবর অভিভাবক বৈরাম খানের 'নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। পিতামহ বাবরের মত তিনিও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। মাহাম আনাঘার দুর্নীতির বিষয় অবহিত হইয়াও তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শ্বশুরকুলের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি কখনও হ্রাস পায় নাই। ধাত্রীমাতার পুত্র মীর্জা আজিজ কোকার গুরুতর অপরাধ সত্বেও আকবর বলিয়াছিলেন, "আমি আজিজ কোকাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারি না, কারণ আমার ওঁ,তাঁহার মধ্যে একই স্নেহের তরঙ্গ চিরপ্রবাহিত।" বন্ধু বীরবলের মৃত্যুতে মুহ্যমান হইয়া আকবর শিশুর মত অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। সভাকবি ফৈজীর রোগশয্যার পার্শ্বে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। সলিমের চক্রান্তে প্রিয়তম বন্ধু আবুল ফজলের মৃত্যুর পরে তিনি তিনদিন অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "শেকুবাবা (সলিমের ডাক নাম)! পৃথিবীকে আজ যে রত্ন হইতে বঞ্চিত করিলে সে রত্নের ক্ষতি আর পূর্ণ হইবে না।" প্রিয় পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিদ্রোহ স্নেহময় আকবরকে যথেষ্ট বেদনা দিয়াছিল, কিন্তু সলিমকে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ক্ষমাই করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে সলিমকেই সিংহাসন দান করিয়াছিলেন।

আকবরের আত্মীয় ও বন্ধুপ্রীতি

ক্ষমা ও মৈত্রী ছিল আকবরের রাজনীতির অঙ্গ। প্রাচীন মুসলিম যুদ্ধনীতি অনুসারে পরাজিত শত্রুকে অঙ্গচ্ছেদ, হত্যা বা দাসরূপে বিক্রয় না করিয়া তিনি ক্ষমা করিতেন, ফলে গতকল্যকার শত্রুতা অদ্যকার মিত্রতায় পরিণত হইত। ভারতে মুসলিম রাজত্বের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মী হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিত। বিজিত ও বিজেতার মধ্যে তিক্ততা অপসারণের জন্য নীতিগত ভাবে কোন সুলতান চেষ্টা করেন নাই। আকবর কোথাও বা বিজিতদের সঙ্গে ব্যবহারে উদার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কোথায়ও বা বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, কোথায়ও বা তাঁহাদিগকে উচ্চপদ দান করিয়া বিগত দিনের অনমনীয় শত্রুকে চিরদিনের মত বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। আকবর হিন্দুর উপর

হইতে অপমানজনক ধর্মীয় জিজিয়া কর, তীর্থকর প্রভৃতি রহিত করিয়া ও মন্দির নির্মাণের অনুমতি প্রদান দ্বারা সমগ্র প্রজাবর্গের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করিলেন। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান প্রজাবর্গ ধর্মীয় বিভেদ সত্ত্বেও যুক্তকণ্ঠে দিল্লীর সুলতানকে 'দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর' বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিত। হিন্দুর মনোধারার এইরূপ পরিবর্তন আকবরের নীতি পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

তীর্থকর ও জিজিয়া কর রহিত ও প্রজাবর্গের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন

বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী আকবর হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের ক্লেদ আবর্জনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ধর্মনির্বিশেষে তিনি বহু প্রকার দুর্নীতি দূর করিয়া শান্তি ও সমৃদ্ধির ভিত্তিতে উন্নততর নূতন সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। প্রজার সামগ্রিক কল্যাণের নিমিত্ত তিনি দীর্ঘ দিবস নিরলস চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী মুসলিম মোল্লাগণ আকবরের এই শুভ চেষ্টার কদর্থ করিলেন, তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া নিন্দা করিলেন; এমন কি মোল্লাগণ ধর্মে উদারতার জন্য তাঁহাকে ধর্মত্যাগী রূপে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গলা ও বিহারে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু আকবর স্থৈর্য, ধৈর্য এবং শৌর্য দ্বারা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিরাপদ রাজ্য সৃষ্টি করিলেন। এই সাফল্য আকবরের কৃতিত্বের অন্যতম পরিচয় এবং ইহা একমাত্র আকবরের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল।

সংস্কারক আকবর

প্রথম জীবনে আকবর মদ্যপান করিয়াছেন, মুঘল পারিবারিক প্রথানুসারে বহু বিবাহ করিয়াছেন; তাঁহার কয়েক শত স্ত্রী ছিল। তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন সলিমের মাতা যোধবাঈ। যোধবাঈকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, যোধবাঈ-এর ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। যোধবাঈ-এর মহলে তাঁহার ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তুলসীমঞ্চ, হোমকুণ্ড এবং গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার রন্ধনশালার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত ছিল।

যোধবাঈ-এর হিন্দুধর্ম প্রীতি

আকবর ছিলেন একদিকে অত্যন্ত বাস্তববাদী, অন্যদিকে আদর্শবাদী। রাজ্যের প্রতিটি সূক্ষ্ম সংবাদ তাহার নিকট বিদিত ছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্র এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিতেন। রাজ্যের নগর পরিকল্পনায়, প্রাসাদ নির্মাণে, খাল খননে, উদ্যান রচনায় আকবর স্বয়ং বাস্তুকারের সঙ্গে আলোচনা করিতেন এবং সর্বশেষ নির্দেশ দিতেন। আকবরের শিল্পজ্ঞান অত্যন্ত নিপুণ ছিল। তিনি হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতায় স্বয়ং বিচার করিতেন; চিত্রাঙ্কন ছিল তাঁহার ব্যসন। কবিতা আবৃত্তি এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনা তাঁহাকে আনন্দ দিত। তাঁহার প্রার্থনাগৃহ বা ইবাদৎখানা বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বধর্ম সভায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করিতেন। তাঁহার দরবারে কোন গুণী

প্রার্থী কখনও বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন নাই। স্মিথের ভাষায় দীন-ই-ইলাহী পরিকল্পনা "একটি খেয়ালমাত্র, মূর্খতার চরম দৃষ্টান্ত, ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা"। স্মিথ তাঁহার বিজেতাসুলভ মনোবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর সম্বন্ধে তথা, পূর্বদেশীয় মানুষ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আকবর সম্বন্ধে স্মিথের মন্তব্য একদেশদর্শী।

আকবরের ব্যক্তিগত গুণাবলী

আকবরের উদ্ভাবনী শক্তি ছিল সেই যুগের বিস্ময়। আকবরের রাজকীয় কারখানায় পাদুকার নাল হইতে আরম্ভ করিয়া তীক্ষ্ণ তরবারি ও বিরাট কামান, বেগমদের শাড়ী ও ওড়নার প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দরবারের জন্য বোখারার গালিচা এবং সেতারের সূক্ষ্ম তার হইতে হস্তীর অঙ্কুশ পর্যন্ত নির্মিত হইত। প্রতিটি জিনিস আকবরের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পিত হইত এবং সুসম্পন্ন হইত। সংগীত ছিল তাঁহার অবসর মুহূর্তে চিত্ত বিনোদনের উৎস। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। আকবর স্বয়ং বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া মৃদঙ্গ এবং তবলার সম্মেলনে পাখোয়াজ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আকবর যে কঠিন অঙ্গুলি দ্বারা বন্যহস্তী সংযত করিয়াছেন, সেই অঙ্গুলি দ্বারা বীণার তারে অপূর্ব ঝংকার তুলিয়াছেন। আকবরের বন্ধু ছিলেন মালবের বিখ্যাত সংগীতপ্রাণ বজ বাহাদুর, সুরশিল্পী তানসেন, ভক্ত কবি সুরদাস, ললিতকণ্ঠ বৈজু বাওরা, সাধক তুলসীদাস প্রভৃতি ছত্রিশ জন সংগীত পারদর্শী। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যমুনার তীরে সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইত। কথিত আছে, তানসেনের সুরে শুষ্ক বৃক্ষে পুষ্পোদ্গম হইত, যমুনার স্রোত স্তব্ধ হইত।

আকবরের শিল্পানুরাগ

আকবরের সংগীতপ্রীতি

তাঁহার দরবারে আবুল ফজল, ফৈজী, বিহারীমল, টোডরমল, বীরবল, আবদুর রহিম খান-ই খানান, তানসেন, হাকিম হুমায়ুন, মোল্লা দোপিঁয়াজা প্রভৃতি নবরত্নের সম্মেলন হইয়াছিল। দরবারে এই নবরত্নের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হইলে অন্য রত্ন দ্বারা শূন্য আসন পূর্ণ করা হইত। এই নবরত্নের মধ্যে আবুল ফজল 'আইন-ই আকবরী' এবং 'আকবর-নামা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থ মুঘল-যুগের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। ফৈজী ছিলেন চিকিৎসক এবং কবি। তিনি ভগবদ্গীতা ও নলদময়ন্তী কাব্য ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন টোডরমল ছিলেন রজস্ব বিভাগের মন্ত্রী', যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি এবং রাজকবি। বীরবল ছিলেন রসিক, কবি, কথক এবং প্রিয় সখা। বিহারীমল ছিলেন আকবরের শ্বশুর ও পরামর্শদাতা। পারস্য দেশীয় হাকিম হুমায়ুন ছিলেন কবি, চিকিৎসক সেনাপতি এবং রাজসভার রীতি ও রুচির নিয়ামক। সুফী আবদুর রহিম ছিলেন বহু ভাষাবিদ, ভক্তকবি, সেনাপতি; সুশাসক এবং সর্বগুণান্বিত রাজপুরুষ। মোল্লা দোপিঁয়াজা ছিলেন একজন বিদূষক,

আকবরের নবরত্ন

বীরবলের সমকক্ষ রসিক ; তিনি কবিতায় কথা বলিতেন। বীরবল এবং মোল্লা দোপিঁয়াজার উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত সভাকে হাস্যমুখর করিয়া তুলিত।

জেস্যুট ধর্ম যাজকের দৃষ্টিতে আকবর : "আকবর ছিলেন মহামহিমান্বিত সম্রাট। তিনি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি ও ভীতি সমভাবে এবং সহজভাবেই আকর্ষণ করিতেন। সম্রাটরূপে তিনি সমগ্র প্রজাপুঞ্জের শুভেচ্ছা অর্জন করিয়াছিলেন ; মহতের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং দীনতম প্রজা ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি পরিচিত প্রতিবেশী, অপরিচিত প্রবাসী—সকলের সঙ্গেই সমব্যবহার করিতেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলিম—যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, সকলেই সম্রাটের ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন, প্রত্যেকেই মনে করিতেন—তিনিই সম্রাটের প্রিয়পাত্র। আকবর ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ; তিনি সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে, দ্বিপ্রহরের পরে এবং মধ্য রাত্রিতে—দিবসের এই চারিবারের নমাজ কখনও লঙ্ঘন করেন নাই। বিরামহীন কর্মের মধ্যে তিনি সুদীর্ঘ সময় নিয়মিত ভাবে প্রার্থনাগৃহে যাপন করিতেন। মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন করুণাময় ও ক্ষমাশীল ; জীবহত্যা ছিল তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ, দয়া প্রদর্শনে তিনি ছিলেন সতত উন্মুখ। কোন প্রজার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকরী করিবার পূর্বে তিনবার সেই দণ্ডাদেশ বিজ্ঞাপিত হইত। নচেৎ কাহারও মৃত্যুদণ্ড সম্ভব হইত না। কেহ যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিলেই তিনি তাহার মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করিতেন।" এই ছিল মহামানব সম্রাট আকবরের প্রকৃত রূপ। সমসাময়িক পৃথিবীর কোন দেশে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ কোন সম্রাট ছিলেন না। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্রাট।

অনুশীলনী

১। আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

(Describe the political condition of Northern India on the eve of Akbar's advent)

২। আকবরের প্রারম্ভ জীবনের সমস্যাগুলি বর্ণনা কর। আকবর কি ভাবে ঐগুলির সমাধান করিয়াছিলেন ?

(What were the problems that Akbar had to face in his early years ? How did he solve them ?)

৩। আকবরের সাম্রাজ্যবাদ আলোচনা কর। (সাম্রাজ্যবাদের অর্থ—সাম্রাজ্য গঠন, সাম্রাজ্য সংরক্ষণ, সাম্রাজ্য শাসন)

(Describe Akbar as an empire-builder.—Imperialism means empire built, empire defended, empire administered)

৪। আকবরের হিন্দুনীতি তথা রাজপুতনীতি বর্ণনা কর। এই নীতির ফলাফল কি হইয়াছিল ?

(Describe the policy of Akbar towards his Hindu subjects with reference to the Rajputs. What were the effects of this policy ?)

৫। আকবরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি বর্ণনা কর।

(Give an account of the North-West Frontier policy of Akbar.)

৬। দীন-ই-ইলাহী ধর্মমতের প্রচ্ছদপটে আকবরের ধর্মমত আলোচনা কর।

(Give an account of the religious policy of Akbar with special reference to Din-I-Ilahi.)

৭। আকবরের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর।

(Describe the administrative system of Akbar.)

৮। আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

(Give an estimate of Akbar's character and achievements.)

৯। আকবরের সফলতায় হিন্দুর দানের মূল্য নিরূপণ কর।

(Give an estimate of the Hindu contribution to Akbar's success.)

১০। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ : (ক) বৈরাম খান (খ) মাহাম আনাঘার নারীতন্ত্র (গ) পানিপথের-দ্বিতীয় যুদ্ধ (ঘ) রাণা প্রতাপ (ঙ) নবরত্ন।

(Write short notes on : (a) Bairam Khan (b) Petticoat Government of Maham Anagha (c) Second battle of Panipath (d) Rana Protap (e) Nabaratna.

———

নবম অধ্যায়

বিচিত্রচরিত্র জাহাঙ্গীর : বিলাসপ্রিয় শাহজাহান

বিচিত্রচরিত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ)

জাহাঙ্গীরের জন্ম : বাদশাহ আকবরের বহু সাধনার ধন ছিলেন তাঁহার পুত্র সলিম। প্রারম্ভ জীবনে আকবরের দুই পুত্র হাসান ও হোসেন অকালে পরলোক গমন করে। এই অকালমৃত পুত্রদ্বয় ইতিহাসের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। ফতেপুর শিক্রীর ফকির সলিম চিস্‌তী আশীর্বাদ করিলেন—বাদশাহ আকবর পুনরায় পুত্রলাভ করিবেন। কিন্তু সেই পুত্র রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ঠ না হইয়া সলিম চিস্‌তীর পর্ণকুটীরে ভূমিষ্ঠ হইবে, নচেৎ জাতকের জীবন-সংশয় হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এক বৎসরের মধ্যে সলিম চিস্‌তীর ফতেপুর শিক্রীর নিরাড়ম্বর কুটীরে আকবরের মহিষী অম্বররাজ-কন্যা যোধবাঈ পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সলিম চিস্‌তীর প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হইল সলিম। আকবর সলিম চিস্‌তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ফতেপুর শিক্রীর পর্ণকুটীর বেষ্টন করিয়া অপূর্ব নগর পরিকল্পনা করিলেন। রাজপ্রাসাদ, বেগম মহল, হিরণ মিনার, বীরবল ভবন, সলিম চিস্‌তীর শুক্তিমুক্তার মসজিদ এবং ইবাদৎখানা (প্রার্থনা গৃহ) নির্মিত হইল। ফতেপুর শিক্রী ছিল আকবরের স্থাপত্য স্বপ্নের পরিপূর্ণ বিকাশ। বহু স্মৃতি বিজড়িত এই ফতেপুর শিক্রী সুদীর্ঘ আঠার বৎসর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। ফতেপুর শিক্রীতে শাহজাদা সলিমের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর—প্রাচীন চিত্র

চারি বৎসর, চারি মাস, চারি দিন বয়সে বাদশাহজাদা সলিমের পাঠ আরম্ভ হইল। বিভিন্ন শিক্ষক বাদশাহজাদাকে ফার্সী, তুর্কী, আরবী এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিলেন। কিছুকাল পরে সলিম গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গীন শিক্ষার ভার ছিল আবদুর রহিম খান-ই-খানানের উপর।

সলিমের শিক্ষা

ষোড়শ বৎসর বয়সে সলিম জয়পুরের রাজা ভগবানদাসের কন্যা মানসিংহের ভগিনী মানবাঈকে বিবাহ করিলেন। মানবাঈ-এর নূতন

নামকরণ হইল শাহ বেগম। এই বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি হিন্দু নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই বিবাহের সন্তান হইলেন খসরু। খসরু মীর্জা আজিজ কোকার কন্যাকে বিবাহ করেন। সলিমের অসংখ্য পত্নীর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন মোতিরাজা উদয়সিংহের কন্যা জগৎ গোঁসাইনী। তিনিই শাহজাহানের মাতা। জাহাঙ্গীরের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে মানবাঈ অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করেন। মুঘল রাজ পরিবারের রীতি অনুসারে জাহাঙ্গীরের অন্তঃপুরিকার সংখ্যা ছিল শতাধিক।

সলিমের বিবাহ

সলিমের বিদ্রোহ (১৫৯৯-১৬০৪ খ্রীঃ): যৌবনে সলিম অত্যন্ত সুরাসক্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক বহু দোষ তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট হইল। ইতোমধ্যে মীর্জা ঘিয়াসের কন্যা সুন্দরী মেহেরুন্নিসার প্রতি আসক্তির ইঙ্গিতও আকবরকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইওরোপীয় লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আকবরের উদার ধর্মমত সম্বন্ধে সলিমের বৈরী মনোভাব, পিতাপুত্রের মধ্যে মনান্তর ও যুদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছিল'— এই উক্তি ভিত্তিহীন। পিতৃবন্ধু আবুল ফজল সলিমের অসংযত আচরণের প্রতি প্রায়ই কটাক্ষ করিতেন। সুতরাং শাহজাদা সলিম আবুল ফজলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহজাদা সলিমকে মেবারের রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অর্থসহ যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। চিতোরের বিরুদ্ধে বিফলতায় আকবর সলিমকে তিরস্কার করিলেন এবং তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সলিম রুষ্ট হইলেন এবং পিতার প্রভুত্ব অস্বীকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সলিম এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং তথায় একটি স্বাধীন দরবার প্রতিষ্ঠা করিলেন। আকবর তখন খান্দেশের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। খান্দেশ বিজয় সম্পন্ন করিয়া আকবর শাহজাদা দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন।

মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

সলিমের বিদ্রোহ

সম্রাট আকবর সলিমকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সলিম উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সলিম তখন এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং একটি দরবাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে সলিম পর্তুগীজদের সাহায্য লাভের আশায় গোয়াতে একজন দূত প্রেরণ করিলেন। ইহাতে আকবর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পরামর্শের জন্য আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে আহ্বান করিলেন। পথে আগ্রায়

সলিমের এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন ও স্বাধীনতা ঘোষণা

আগমনের সময়ে বুন্দেলখণ্ডের ওরচা রাজা বীরসিংহ বুন্দেলা সলিমের প্ররোচনায় আবুল ফজলকে হত্যা করেন (১৯শে অগস্ট, ১৬০২ খ্রীঃ)।

আবুল ফজলকে হত্যা

আকবর বন্ধুর মৃত্যুতে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বন্ধুশোকে তিনি তিনদিন জলস্পর্শ করেন নাই এবং দরবারেও উপস্থিত হন নাই। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আকবর বীরসিংহ বুন্দেলার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। বীরসিংহ পলায়ন করিয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিলেন। আকবর সলিমকে শাস্তিপ্রদানের জন্য আয়োজন করিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই বৎসরই আকবরের প্রিয়পুত্র মুরাদ পরলোক গমন করিলেন এবং তৃতীয় পুত্র দানিয়াল রোগশয্যায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সলিমা বেগমের মধ্যস্থতায় পিতাপুত্রের মিলন

এই শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে আকবরের দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা সলিমা বেগম পিতাপুত্রের মিলনের চেষ্টায় এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন (ফেব্রুআরি ১৬০৩ খ্রীঃ)। সলিম আগ্রায় আগমন করিয়া জননী যোধবাঈ-এর হস্ত ধারণ করিয়া আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার পাদস্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ মৃত, তৃতীয় পুত্র দানিয়াল মৃত্যুশয্যায়, সুতরাং শোকার্ত ক্লান্ত সম্রাট বিদ্রোহী পুত্র সলিমকে ক্ষমা করিলেন।

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আকবর সলিমকে পুনরায় মেবারের অসমাপ্ত অভিযান সমাপ্ত করার জন্য মেবারে প্রেরণ করিলেন। সলিম জানিতেন, এই কঠিন কার্য সুসম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সলিম মেবারের বিরুদ্ধে সেনাপতিত্বের গৌরব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই সময়ে সলিম সসৈন্যে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এলাহাবাদে সলিম অত্যন্ত সুরাসক্ত হইয়া পড়িলেন। সলিমের দুর্ব্যবহারে তিক্ত হইয়া এই বৎসর মানসিংহের ভগিনী মানবাঈ অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করেন। আকবরের ওয়াকিনবীশ সলিমের দুর্ব্যবহারেব সংবাদ আকবরের নিকট প্রেরণ কবিয়াছিলেন; এই অপরাধে সলিম তাঁহাকে জীবন্ত অবস্থায় চর্ম উৎ-পাটন করিয়া হত্যা করিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আকবর স্বয়ং পুত্রকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই মুহূর্তে আকবরের জননী হামিদাবানু বেগম মৃত্যুশয্যায়। আকবর সলিমের বিরুদ্ধে অভিযান অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া মাতৃ দর্শনের জন্য আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। সলিমের বিদ্রোহের সময় সলিমপুত্র খসরুকে সিংহাসন দানের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। খসরু ছিলেন মানসিংহের ভাগিনেয় এবং মীর্জা আজিজ কোকার জামাতা। সুদর্শন, সুচরিত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় এই যুবক ছিলেন অম্বর রাজের দৌহিত্র, মুঘল বাদশাহ আকবরের পৌত্র। খসরু ছিলেন

সলিমপুত্র খসরুকে সিংহাসন দানের প্রস্তাব উত্থাপন

সর্বপ্রকারে দিল্লী সিংহাসনের উপযুক্ত। আকবর যদিও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই, তথাপি সলিম ভীত হইয়া আগ্রায় উপস্থিত হন এবং পিতার নিকট প্রকাশ্য দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পিতামহীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। সলিমের এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া আকবর প্রকাশ্যে সলিমকে সহজভাবেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি সলিমকে তীব্র তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহাকে গোসলখানায় দশ দিন, দশ রাত্রি আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিখ্যাত হিন্দু চিকিৎসক শালীবাহনের হস্তে সলিমকে মস্তিষ্ক চিকিৎসার জন্য অর্পণ করিলেন। কারণ আকবর মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় অত্যধিক সুরাপান ও অহিফেন সেবনে সলিমের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। এই সময় দানিয়ালের মৃত্যু হইল (১৬০৪ খ্রীঃ)। ক্রমাগত আত্মীয়স্বজন, মাতা এবং পুত্রের মৃত্যুতে আকবর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

সলিমের আগ্রায় উপস্থিতি ও ক্ষমা প্রার্থনা

অতঃপর আমাশয় রোগে আকবরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। আকবরের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় পুনরায় খসরুকে সিংহাসন দানের জন্য নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। দূরদর্শী আকবর পিতা বর্তমানে পুত্রের সিংহাসন আরোহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। আকবর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে (১৫ই অক্টোবর) সলিমের শিরে রাজমুকুট এবং হস্তে হুমায়ুনের তরবারি অর্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মিশনারীগণ বলেন, সলিম স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় পিতাকে ঔষধের পরিবর্তে বিষপ্রদান করিয়া পিতার মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। এই উক্তির অবশ্য অন্য কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ নাই।

আকবরের মৃত্যুকালে সলিম উত্তরাধিকারী মনোনীত

সলিমের রাজ্যাভিষেক: আকবরের মৃত্যুর পরে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তারিখে আগ্রা দুর্গে সলিমের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। তাঁহার নূতন বাদশাহী উপাধি হইল—নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী। 'নূর' অর্থাৎ আলো; আলো ছিল জাহাঙ্গীরের প্রিয়। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নাম নূরউদ্দীন (ধর্মের আলো), তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর নাম হইল নূরজাহান (পৃথিবীর আলো)। তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মুদ্রার নাম ছিল নূর-ই-জালালী।

সলিমের বাদশাহী উপাধি গ্রহণ

অভিষেকের প্রথম দিনেই জাহাঙ্গীর বহু বন্দীকে কারামুক্ত করিলেন; নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিলেন এবং কয়েকটি নূতন আইন প্রবর্তন করিলেন, ফলে—শাস্তিস্বরূপ নাসাকর্ণ ছেদন, সুরা ও সুরাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন, জাহাঙ্গীরের জন্মদিন বৃহস্পতিবারে ও আকবরের জন্মদিন

রবিবারে পশুহত্যা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইল। পথিপার্শ্বে মসজিদ, সরাই ও কূপ নির্মাণ, প্রধান নগরে জনসাধারণের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন রাজ্যের কর্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইল।

আগ্রা দুর্গের শাহবুরুজ হইতে ছয় মণ ওজনের একটি ত্রিশ গজ দীর্ঘ স্বর্ণ শৃঙ্খল রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে যমুনার তীরে একটি স্তম্ভগাত্রে সংযোজিত করা হইল। জাহাঙ্গীরের উদ্দেশ্য ছিল—বিচারপ্রার্থী বিনা বাধায় শৃঙ্খল নিবদ্ধ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ

সিংহাসনারোহণের দিন জাহাঙ্গীর আবুল ফজলের পুত্র আবদুর রহমানকে দুই হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করিয়া পূর্বকৃত পাপের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অবশ্য আবুল ফজলের হত্যাকারী বীরসিং বুন্দেলাকেও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নূরজাহানের পিতা পারস্যদেশীয় মীর্জা ঘিয়াসকে দিওয়ান পদে উন্নীত করিলেন। জামান খানের উপাধি হইল মহবৎ খান। তাঁহাকে দেড় হাজারী মনসবদারী পদ প্রদান করা হইল।

খসরুর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাদা খসরু সিংহাসন স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই বেদনা তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পাঁচ মাস পরে আগ্রার প্রান্তে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি দর্শনের অভিপ্রায়ে খসরু তিনশত কুড়ি জন মাত্র অশ্বারোহী দেহ-রক্ষী লইয়া আগ্রা ত্যাগ করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে হুসেন বেগ বাদখসানী তিন শত অশ্বারোহিসহ খসরুর সঙ্গে যোগদান করিলেন। পথে খসরুর অনুচরের সংখ্যা হইল দ্বাদশ সহস্র। অচিরকাল মধ্যে খসরু সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হইলেন এবং লাহোরের দিওয়ান আবদুর রহমান তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। লাহোরের অদূরে তারণ-তারণ গ্রামে পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন খসরুকে আশীর্বাদ করিলেন।

বড় আশা করিয়া খসরু লাহোরে উপস্থিত হইলেন, ভাবিয়াছিলেন—কিল্লাদার তাঁহার পক্ষে যোগ দিবেন; কিন্তু দেখিলেন দুর্গদ্বার রুদ্ধ। খসরু দুর্গ অবরোধ করিলেন; কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

খসরু বন্দী

এদিকে জাহাঙ্গীর খসরুর পলায়ন সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পিতা-পুত্রের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া খসরু কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রমণের সময় খসরু বন্দী হইলেন। শৃঙ্খলিত খসরু লাহোরের দরবারে আনীত হইলেন—খসরুর দক্ষিণ পার্শ্বে হুসেন বেগ, বাম পার্শ্বে আবদুর রহমান—দুইজনই শৃঙ্খলাবদ্ধ। জাহাঙ্গীরের আদেশে খসরু কারারুদ্ধ হইলেন। হুসেন বেগকে সদ্য উন্মোচিত গোচর্মে এবং আবদুর রহমানকে গর্দভ চর্মে আবৃত করা হইল। তারপর গর্দভ পৃষ্ঠে পুচ্ছ মুখে

উপবেশন করাইয়া দুই বন্দীকে লাহোরের প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করান হইল। অপমানক্ষুব্ধ হুসেন বেগ বার ঘণ্টার মধ্যে পরলোক যাত্রা করিলেন। আবদুর রহমান দুই দিন পরে ক্ষমা লাভ করিলেন।

বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদান করিয়া জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনের বিচার আরম্ভ করিলেন। বিদ্রোহীকে সাহায্য করা গুরুতর অপরাধ; বিদ্রোহী খসরুকে গুরু অর্জুন আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—এই অপরাধে জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনকে দুই লক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদানের আদেশ দিলেন; নচেৎ তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। গুরু অর্জুন উত্তর দিলেন—যে-কোন লোক আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে সাধু ব্যক্তি তাহাকেই আশীর্বাদ করিয়া থাকেন, সাধুর পক্ষে আশীর্বাদ না করাই অসম্ভব। সুতরাং তিনি অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করিলেন। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড হইল।

শিখগুরু অর্জুনের বিচার ও প্রাণদণ্ড

বিদ্রোহ সংক্রামক ব্যাধি। বিকানীরের রাজা রাজসিংহ, বিহারের অন্তর্গত খড়গপুরের সামন্ত রাজা সংগ্রামসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন; কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন। খসরুর বিদ্রোহের সুযোগে পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাস উজবেগদিগের প্ররোচনায় খোরাসান হইতে কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যসৈন্য পরাজিত হইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

সেই বৎসর ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল জাহাঙ্গীরকে হত্যা করিয়া খসরুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে খসরুর কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় নাই। উক্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রকাশিত হইলে জাহাঙ্গীর ষড়যন্ত্রের নেতৃবর্গকে হত্যা করিলেন এবং খসরুর চক্ষুদ্বয় নষ্ট করিয়া দিলেন। পরবর্তিকালে জাহাঙ্গীর সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া পারস্য হইতে আরিফ নামক একজন চক্ষু-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া খসরুর একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আংশিক উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খসরু কারাগারেই ছিলেন।

নূরজাহান: ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা নাম্নী এক অসামান্যা রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। মেহেরুন্নিসা ছিলেন জন্মে মরুকন্যা, রক্তে পারসিক, প্রথম জীবনে আফঘান সর্দার পরিণীতা, সুদূর বঙ্গদেশে প্রায় নির্বাসিতা, স্বামী নিহত হওয়ার পরে আগ্রার রাজপ্রাসাদে বন্দিনী, পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীর-মহিষী দিল্লীশ্বরী নূরজাহান। তিনি ছিলেন—বহু ষড়যন্ত্রের নায়িকা, শাহজাহান এবং মহবৎ খানের বিদ্রোহের নেপথ্য রচয়িত্রী, জাহাঙ্গীরের বন্ধন মুক্তিকারিণী, অন্তিম জীবনে ক্ষমতা-চ্যুতা এবং লাহোরে স্বামীর সমাধি-পার্শ্বে চিরনিদ্রিতা। নূরজাহানের জীবন বাস্তবিক পক্ষে

একখানি নাটক। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের চতুষ্পার্শ্বে বহু সত্য, অর্ধসত্য এবং অসত্য কিংবদন্তী রচিত হইয়াছে।

নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে, মেহেরুন্নিসার জন্ম ভারতের পথে কান্দাহারের অদূরে মরুভূমিতে, তাঁহার শৈশব আগ্রা নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। ওলন্দাজ ভ্রমণকারী দ্যা লায়েৎ বলেন, তিনি কৈশোরে শাহজাদা সলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আলী কুলী (ইসতালজু খান) শের আফঘান নামক একজন সৈনিকের সহিত বিবাহিতা হইয়া তিনি প্রায় নির্বাসিতা অবস্থায় বর্ধমানে অবস্থান করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতে বা আজ্ঞাতে বাঙ্গলার সুবাদার কুতুবউদ্দীন কর্তৃক শের আফঘান নিহত হইয়াছিলেন। ডাঃ বেণীপ্রসাদ এই উক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। রাজদরবারের নিয়ম অনুসারে মেহেরুন্নিসা লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশরূপে আগ্রার রাজপ্রাসাদে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের বিমাতা সলিমা বেগমের চেষ্টায় জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইল। নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীরের পত্নীর নূতন নাম হইল নূরমহল তথা নূরজাহান। বিবাহের সময় মেহেরুন্নিসার বয়স ছিল চৌত্রিশ, জাহাঙ্গীরের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বৎসর। দুইজনই তখন অতিক্রান্তযৌবন।

নূরজাহান—প্রাচীন চিত্র

মেহেরুন্নিসার বিবাহ: 'নূরজাহান' নামকরণ

এক বৎসর পরে তিনি হইলেন পাদশা-বেগম—অর্থাৎ অন্তঃপুরের "প্রধানা মহিলা।" যৌবন অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার অনুপম স্বাস্থ্য, অনবদ্য সৌন্দর্য তখন বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই। তিনি সংগীত, চিত্র, কাব্য এবং শিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ, অলংকার এবং প্রসাধন সামগ্রী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি ওড়না, কাঁচুলী এবং আতর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কাফি খান বলেন, নূরজাহান প্রবর্তিত পরিচ্ছদ মণ্ডনধারা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত দিল্লীর রাজপরিবারের ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অভিজাত পরিবারের আদর্শ ছিল।

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর নূরজাহান মুঘল-সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী, পরিশ্রমী, স্বামী সোহাগিনী, উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী নূরজাহান স্বীয় ক্ষমতাগুণে রাজ্যের সমস্ত শক্তি আহরণ

করিলেন। রাজ-মুদ্রার একপৃষ্ঠে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইল। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই সত্য, কিন্তু রাজ্যপরিচালনা করিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ।

নুরজাহানের ক্ষমতা লাভ

নুরজাহানের শাসন-ক্ষমতা সুনিপুণ না হইলে গর্বিত মুঘল আমীরগণ এই নারীর আধিপত্য কিছুতেই স্বীকার করিতেন না। রাজদরবারে অপরাধীর বিচারের সময় তিনি ঝারোখার অন্তরালে অবস্থান করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা জাহাঙ্গীরের বিচারের ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতেন।

অত্যধিক ক্ষমতা লাভে দৃপ্ত হইয়া নুরজাহান ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি শের আফঘানের ঔরসজাত কন্যা লাড্লী (লায়লা) বেগমকে শাহজাদা শাহরইয়ারের সঙ্গে বিবাহ প্রদান করিয়া স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন এবং শাহজাহানকে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার হইতে

নুরজাহানের বিভ্রান্তি

বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করেন। ভ্রাতা আসফ খান ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। আসফ খানের শিথিলতায় নুরজাহান-চক্র শিথিল হইয়া পড়িল। অন্যদিকে মহবৎ খান নুরজাহানের আদেশে আমীর-উল-উমরা পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন। এই সময়ে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে নুরজাহানের মাতা আসমৎ বেগম এবং পিতা ইতমাদউদ্দৌলা পরলোক গমন করেন। ফলে নুরজাহান-চক্র আরও ক্ষুদ্রতর হইয়া গেল।

জাহাঙ্গীরের রাজ্য বিস্তারঃ আকবরের রাজত্বকালে প্রারব্ধ যুদ্ধ জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের পরাক্রমে দাউদ খান কররাণীর পতন হইলেও বাঙ্গলার সকল হিন্দু-মুসলিম জমিদারগণ

বাঙ্গলা দেশে আফঘান বিদ্রোহ দমন

দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। আফঘান আমীরগণ ওসমান খানের নেতৃত্বে গড় মান্দারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; এই সময় বাঙ্গলার বার জন ভুঁইঞা (ভৌমিক বা জমিদার) অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সুদক্ষ পর্তুগীজ নৌসেনার সাহায্যে মুঘল সেনাপতিদিগকে বহু নৌযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বার ভুঁইঞাগণের মুঘল আধিপত্য স্বীকার

জাহাঙ্গীর ইসলাম খান নামক একজন সুকৌশলী সেনা-নায়ককে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতাপে বাংলার বার ভুঁইঞাগণ মুঘল আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অন্যদিকে আফঘান দলপতি ওসমান খান পরাজিত এবং নিহত

বঙ্গ-বিজয় ও বাঙ্গলার রাজধানী স্থানান্তরিত

হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কোচবিহার রাজ্যের পূর্বাংশ (বর্তমান গোয়াল-পাড়া ও কামরূপ জেলা) বিজিত হইয়া মুঘল সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল। ইসলাম খানের শাসনকালে বাঙ্গলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইল। এই নূতন নগরের নামকরণ হইল **জাহাঙ্গীরনগর।**

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেবার বিজয়। মেবারের অধিপতি কোন কালেও মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। প্রতাপ-সিংহের পুত্র অমরসিংহ পিতার ন্যায় সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন না। তথাপি তিনি দীর্ঘকাল মুঘল সেনাপতি মহবৎ খান এবং শাহজাদা পরভেজ ও খুররামের পরিচালিত মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন।

মেবার বিজয়

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৬১৫ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্ত হইল—মেবারের রাজধানী চিতোর অমরসিংহের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হইবে। মেবারের রাণাকে অন্যান্য বশংবদ সামন্তদের ন্যায় মুঘল দরবারে উপস্থিত হইতে অথবা বাদশাহের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে হইবে না। বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ উদার হৃদয় জাহাঙ্গীর রাণা অমরসিংহ ও তাঁহার পুত্র করণসিংহের মর্মর মূর্তি আগ্রার রাজোদ্যানে স্থাপন করিলেন।

আকবরের সময়ে আহম্মদনগরের উত্তরাংশ বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশ স্বাধীন ছিল। এই আহম্মদনগরের স্বাধীন অংশে মালিক অম্বর নামক বিচক্ষণ হাবসী মন্ত্রী শাসন পরিচালনা করিতেন। তিনি খিড়কিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের আয় বৃদ্ধি করেন। মালিক অম্বর রাজকীয় সেনাবাহিনীকে গরিলা রণনীতি (গুপ্তযুদ্ধ) শিক্ষাদান করেন। ফলে মুঘল সৈন্য বারংবার বিধ্বস্ত হইল। বহু চেষ্টা করিয়াও শাহজাদা পরভেজ

আহম্মদনগর বিজয়

আহম্মদনগর জয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাদা খুররাম আহম্মদনগরের রাজধানী এবং কয়েকটি নগর জয় করেন। জাহাঙ্গীর ইহাতে এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি খুররামকে শাহজাহান বা পৃথিবীপতি উপাধি প্রদান করিয়া ত্রিশহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন এবং বাদশাহের পার্শ্বে দ্বিতীয় সিংহাসনে বসিবার সম্মান প্রদান করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আহম্মদনগর তখনও বিজিত হয় নাই। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ নগর মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—কাঙাড়া দুর্গ জয়। শাহজাদা খুররাম কর্তৃক দীর্ঘ চৌদ্দ মাস অবরোধের পর ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দুর্ভেদ্য কাঙাড়া দুর্গ জাহাঙ্গীরের হস্তগত হইল।

১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যরাজ শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করেন।

পারস্য সম্রাট কর্তৃক কান্দাহার আক্রমণ

জাহাঙ্গীর তখন অসুস্থ ছিলেন এবং স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে শাহজাহান কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তঘাতক মুহম্মদ রেজা জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে হত্যা করিল। জাহাঙ্গীর পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাসের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য শাহজাহানকে আদেশ দিলেন। শাহজাহান

তখন দিল্লীর সিংহাসন লাভের স্বপ্নে বিভোর। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি কান্দাহারের ন্যায় দূর দেশে গমন করিতে অস্বীকার করিয়া; জাহাঙ্গীরের আদেশ অমান্য করিলেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। অবশ্য কান্দাহার জাহাঙ্গীরের হস্তগত হইল। কান্দাহারকে কেন্দ্র করিয়া ভারত ও পারস্যের মধ্যে একশত বৎসরব্যাপী বিরোধ চলিয়াছিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে পারিবারিক বিরোধ ও বিদ্রোহ: জাহাঙ্গীর প্রায় বিদ্রোহের মধ্য দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিদ্রোহের অপরাধে শাহজাদা খসরুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দেন; অবশ্য পরবর্তিকালে খসরুর বিনষ্ট চক্ষু উদ্ধারের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে খসরুর অকাল-মৃত্যুর জন্য শাহজাহানই দায়ী। দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপায়ী, চতুর্থ পুত্র শাহরইয়র ছিলেন না-সুদানী (অকর্মণ্য)। সুতরাং সকলেই ধারণা করিয়াছিল যে—সাহসী, বীরযোদ্ধা শাহজাহানই দিল্লীর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। জাহাঙ্গীরের জীবনের শেষার্ধে নূরজাহানও শাহজাহানকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। কারণ, শাহজাহান ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের কন্যা মমতাজের স্বামী। কিন্তু জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরইয়রের সহিত নূরজাহান ও শের আফঘানের কন্যা লাড্‌লীর (লায়লা) বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ফলে নূরজাহান স্বীয় জামাতা শাহরইয়রকে দিল্লীর সিংহাসনের জন্য মনোনীত করিলেন। শাহজাহানের অনুপস্থিতিতে নূরজাহান স্বীয় জামাতা শাহরইয়রকে সিংহাসন দান করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় শাহজাহান কান্দাহার বিজয়ে অগ্রসর না হইয়া বিদ্রোহ করেন। আবদুর রহিম খান-ই-খানান শাহজাহানের পক্ষ সমর্থন করেন। এই পরিস্থিতিতে জাহাঙ্গীর কান্দাহার অভিযান স্থগিত রাখিয়া শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিখ্যাত সেনাপতি মহবৎ খানকে প্রেরণ করেন; শাহজাহান দিল্লীর নিকট বিলোচপুরে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত হইয়া শাহজাহান বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রায় তিন বৎসরকাল স্বাধীন ভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেন। পরে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। শেষ পর্যন্ত ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার দুই পুত্র দারা শিকো (দশ বৎসর) ও ঔরঙ্গজেবকে (আট বৎসর) প্রতিভূস্বরূপ রাজদরবারে গচ্ছিত রাখিয়া পত্নী মমতাজ ও পুত্র মুরাদকে সঙ্গে লইয়া নাসিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পর বৎসরই শাহজাহান মুঘল সেনাপতি মহবৎ খানের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

নূরজাহানের ষড়যন্ত্র

শাহজাহানের বিদ্রোহ ও পরাজয়

শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার

শাহজাহানের বিদ্রোহ এবং রাজপরিবারে ষড়যন্ত্রের অন্তরালে নূরজাহানের

পরোক্ষ ইঙ্গিত কাহারও অগোচর ছিল না। নূরজাহানের ষড়যন্ত্রে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক মহবৎ খানও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)। মহবৎ খান ছিলেন জাতিতে আফঘান। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বহু যুদ্ধে রাজভক্তি ও সমরনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহজাহানের বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে মহবৎ খানের কৃতিত্ব নূরজাহানকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। নূরজাহান জানিতেন যে, মহবৎ খান পরভেজের পক্ষপাতী, আসফ খান শাহজাহানের পক্ষপাতী এবং তিনি নিজে ছিলেন শাহরইয়রের পক্ষপাতিনী। বিদ্রোহ দ্বারা শাহজাহান স্বীয় মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। নূরজাহান পরভেজের শক্তি খর্ব করিবার জন্য তাঁহার সমর্থক মহবৎ খানকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। ইতোমধ্যে মহবৎ খানকে অপমানিত করিবার জন্য নূরজাহান তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গলা ও বিহার হইতে সংগৃহীত হস্তী রাজদরবারে প্রেরণ এবং শাহজাহানের বিদ্রোহ দমনে ব্যয়িত অর্থের হিসাব-নিকাশ প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিলেন; নির্দেশ পালন না করিলে মহবৎ খানকে অবিলম্বে রাজদরবারে উপস্থিত হইতে হইবে আদেশ দিলেন। এই সমস্তই নূরজাহানের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এবং এই চক্রান্ত ও শত্রুতাই মহবৎ খানের বিদ্রোহের কারণ। বুদ্ধিমান মহবৎ খান সমস্ত ব্যাপারে নূবজাহানের হস্তচ্ছায়া অনুভব করিয়া সসৈন্যে পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—তিনি জাহাঙ্গীরের নিকট সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিবেন; সমস্যা সমাধানে অপারগ হইলে সম্রাটকে বন্দী করিবেন। জাহাঙ্গীর তখন কাবুলের পথে ঝিলাম নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মহবৎ খান পাঁচ হাজার বিশ্বস্ত রাজপুত সৈন্যসহ বাদশাহের শিবির অবরোধ করিলেন এবং স্বয়ং জাহাঙ্গীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহবৎ খান নূরজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া আসফ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর মহবৎ খানের হস্তে বন্দী হইলেন।

মহবৎ খানের বিদ্রোহ

মহবৎ খান কর্তৃক জাহাঙ্গীরের শিবির অবরোধ

নূরজাহান এই সমস্ত সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কি না সন্দেহ। নূরজাহান ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়া অপর তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং মহবৎ খানের শিবির আক্রমণের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। নূরজাহান হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিলেন। আসফ খান ভীত হইয়া আটক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নূরজাহান শাহরইয়রের শিশু কন্যাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শত্রু-সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া পথরোধ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নূরজাহান মহবৎ খানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। অচিরে অদ্ভুত

ছলনাময়ী নূরজাহান বন্দিনী হইয়া জাহাঙ্গীরের সহিত শিবিরে মিলিত হইলেন।

ইতোমধ্যে মহবৎ খানের রাজপুত সৈন্য ও মুঘল সৈন্যের মধ্যে মতান্তর ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একশত দিনের পর নূরজাহান মহবৎ খানের ক্ষীয়মাণ জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। একদা জাহাঙ্গীর পঞ্জাবের রোহতাস দুর্গের সম্মুখে সৈন্য পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্বয়ং সৈন্য পরিচলনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নূরজাহান জানিতেন যে, জাহাঙ্গীর সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা দিল্লীসম্রাটের আদেশ পালন করিবে। বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইল। মহবৎ খান নিজের অসহায় অবস্থা অনুধাবন করিয়া লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জাহাঙ্গীর রোহতাস দুর্গে দরবার আহ্বান করিলেন; মহবৎ খান জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মহবৎ খান জাহাঙ্গীরের আদেশে দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া মহবৎ খান শাহজাহানের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিল। এই প্রবল বিদ্রোহ মীমাংসিত হইবার পূর্বেই কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাঙ্গীর পরলোক গমন করেন (নভেম্বর, ১৬২৭ খ্রীঃ)। জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ লাহোরের অনতিদূরে শাহদারা নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হইল।

জাহাঙ্গীরের অবরোধ-মুক্তি ও মৃত্যু

নূরজাহানের চরিত্র: ব্যক্তিগতভাবে নূরজাহান ছিলেন সামাজিক, দরিদ্রের বান্ধবী, অত্যাচারিতের ত্রাণকর্ত্রী; তিনি মাতৃপিতৃহীনা বালিকার বিবাহে অকুণ্ঠিত সাহায্য করিতেন এবং প্রতিদিন আনুষ্ঠানিকভাবেই দরিদ্র-দিগকে ধন দান করিতেন। নূরজাহানের নারীদেহে ছিল পুরুষের মস্তিষ্ক; উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনি সহজেই মুঘল-রাজ্যের রাজনীতি ও শাসনের জটিলতা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস, ধৈর্য জাহাঙ্গীরের জীবনে অপূর্ব সম্পদ ছিল। পরিস্থিতি যতই জটিল হইত, ততই তাঁহার সাহস এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিত।

শেষ জীবনে জাহাঙ্গীর অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; ফলে নূরজাহানের হস্তে স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের বহু ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছিল। নূরজাহান ঝারোখা-ই-দর্শন বা রাজদর্শনে জাহাঙ্গীরের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন এবং জাহাঙ্গীরের মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিত। অনেক সময় তিনি প্রকাশ্যে রাজকার্য সম্পাদন করিতেন এবং বিচার ব্যাপারে জাহাঙ্গীরকে ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতেন।

নূরজাহান এই সময়ে একটি রাজনৈতিক চক্র গঠন করেন। নূরজাহানের মাতা আসমত বেগম ছিলেন তাঁহার পরামর্শদাত্রী। তাঁহার পিতা মীর্জা

খিয়াস (ইতমাদউদ্দৌলা) ছিলেন সুদক্ষ শাসক, ভ্রাতা আসফ খান (আবুল-হাসান) ছিলেন বিচক্ষণ কূটনীতিক। শাহজাদা খুররাম ছিলেন আসফ খানের কন্যা আরজুমন্দ বানু বেগমের স্বামী। এই সময়ে খুররাম ছিলেন নূরজাহানের অনুগৃহীত।

নূরজাহানের চেষ্টায় জাহাঙ্গীরের মদ্যপানের মাত্রা হ্রাস পাইল। রাজকার্য হইতে আংশিকভাবে অবসর লাভ করিয়া জাহাঙ্গীর কলা, শিল্প, চিত্র ও সংগীতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন।

প্রথমে নূরজাহান শাহজাহানের পক্ষপাতিনী ছিলেন। কিন্তু আসফ খান জামাতার পক্ষপাতিত্ব করায় নূরজাহান বাধ্য হইয়া শাহজাহানের বিরোধিতা করেন। লাড্‌লী বেগমের সঙ্গে শাহজাহানের বিবাহ হইলেই সমস্ত গোল-যোগের অবসান হইত। শাহজাহানের বিদ্রোহের কারণ অনেকটা কাল্পনিক। শেষ পর্যন্ত নূরজাহান কর্তৃক মহবৎ খানের বিরুদ্ধে অর্থ-অপচয়ের অভিযোগ নীতিগত ভাবে গ্রহণীয় হইলেও উহা সময়োচিত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের অসুস্থতা সমস্ত ঘটনাবলীকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। শাহরইয়রের অযোগ্যতাও এই বিশৃঙ্খলার জন্য আংশিক দায়ী। শাহরইয়র নূরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য পাত্র ছিলেন না।

নূরজাহানের ক্ষমতালোভ ছিল অপরিসীম। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার আবর্ত, জাহাঙ্গীরের নষ্টস্বাস্থ্য এবং আকস্মিক মৃত্যুর আশঙ্কা দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা জটিল এবং অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আকস্মিক মৃত্যু না হইলে হয়ত নূরজাহানের জীবনকাহিনী অন্যরূপ হইত; হয়ত শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিতে পারিতেন না।

স্বামীর মৃত্যুর পর জীবনের শেষভাগে নূরজাহান আর ক্ষমতালাভের চেষ্টা করেন নাই। তিনি অনাড়ম্বর বৈধব্য জীবন যাপন করিয়াছেন এবং স্বামীর সমাধির পার্শ্বে শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নূরজাহান মানবী ছিলেন—আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষমতা, লোভ, ষড়যন্ত্র, সাহস—সব কিছুই ছিল তাঁহার অত্যধিক পরিমাণে। তিনি জীবনের সুধা পান করিয়াছেন আকণ্ঠ, শেষ জীবনে ত্যাগও করিয়াছেন নিঃশেষে।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : জাহাঙ্গীর ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের পুত্র। তাঁহার রক্তে ছিল দুইটি ধারা—মধ্য-এশিয়ার চাঘতাই বংশের রক্ত এবং ভারতবর্ষের রাজপুত-বংশের রক্ত। পিতা আকবর ছিলেন ধর্মপ্রাণ, মাতা যোধবাঈ ছিলেন ধর্মশীলা। জাহাঙ্গীর ছিলেন বিখ্যাত ফকীর সলিম চিস্‌তীর আশীর্বাদপূত সন্তান। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে তিনি ইবাদৎখানার সমন্বয়ী ধারায় অবগাহন করিয়াছিলেন। সুফী আবুল ফজল ও ফৈজী, ভগবৎ প্রেমিক আবদুর রহিম খান-ই-খানান, সংগীত-প্রাণ তানসেন, চিত্রকর দশনাথ এবং আবদুল সামাদ, দার্শনিক মধুসূদন

সরস্বতী প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী সংঘ তাঁহার জীবন ও শিক্ষাকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের জীবনে দুইটি ধারা তাঁহার কর্মে বিশেষভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি একদিকে ছিলেন গুণীর পৃষ্ঠপোষক, উদার, বন্ধুবৎসল, জীবে দয়াবান, প্রজার মঙ্গলে সতত উন্মুখ; অন্যদিকে সময়-বিশেষে তিনি সংকীর্ণ-চিত্ততা, হিংস্র স্বভাব এবং ধর্মে অনুদারতার পরিচয় দিতেন; অথচ জাহাঙ্গীর ছিলেন হিন্দুযোগী বাবালালের সঙ্গকামী ভক্ত।

পুত্ররূপে সলিম পিতা আকবরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার আত্ম-চরিতে আকবরকে আরশা আশিয়ানী (ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত) বলিয়া অভিহিত করিয়া শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন; পিতার পুণ্যনাম উচ্চারণকে তিনি অশ্রদ্ধা করা বিবেচনা করিতেন; অন্যদিকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করিয়াছেন। পিতৃবন্ধু আবুল ফজলকে হত্যা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, অথচ আবুল ফজলের পুত্রকে সিংহাসনারোহণের দিনই দুই হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করিয়াছেন। বদাউনীর রচিত ইতিহাসে পিতার সম্বন্ধে কটূক্তি দর্শনে জাহাঙ্গীর ঐ পুস্তকের সমস্ত পাণ্ডুলিপি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া বদাউনীর পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পুত্ররূপে জাহাঙ্গীর

'জীবে দয়া' ছিল জাহাঙ্গীরের চরিত্রের অন্যতম গুণ। রাজহস্তীকে শীতার্ত দেখিয়া তিনি হস্তীর মাহুতকে হিমশীতল জলে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়বান বিচারক ছিলেন সত্য; কিন্তু একদা শিকারের পথে পাল্কীবাহকের নির্বুদ্ধিতায় হরিণ পলায়ন করিয়াছিল—এই অপরাধে সাময়িক উত্তেজনায় পাল্কীবাহকের পদচ্ছেদের আদেশ দিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে জাহাঙ্গীর ছিলেন বিরুদ্ধ-চরিত্র।

বিরুদ্ধচরিত্র জাহাঙ্গীর

স্বামিরূপে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রীতিমান; অথচ মানবাঈকে অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মানবাঈ আত্মহত্যা করিলে জাহাঙ্গীর তিন দিন অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নূরজাহান ছিলেন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী; নূরজাহানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নূরজাহানকে অদেয় তাঁহার কিছুই ছিল না।

স্বামিরূপে জাহাঙ্গীর

পিতারূপে জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত স্নেহময়। বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে প্রথমবার কারারুদ্ধ ও দ্বিতীয়বার চক্ষু উৎপাটন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিশক্তি উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছেন। শাহজাহানের প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল সীমাহীন। শাহজাহানের বিদ্রোহের মূলে জাহাঙ্গীরের দায়িত্ব নিরূপণ সহজ নহে। শাহরইয়রের প্রতি নূরজাহানের পক্ষপাতিত্ব—শাহজাহান

পিতারূপে জাহাঙ্গীর

ও আসফ খানের চক্ষে শত্রুতা রূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। খসরুর মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরের কোন দায়িত্ব ছিল না। পরভেজ অতিরিক্ত সুরাপানের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

শাসকরূপে জাহাঙ্গীর পিতার নীতি ও শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আকবরের সময়কালীন বারটি আইন সংশোধিত করিয়াছিলেন। বিচারকরূপে জাহাঙ্গীর নীতিমান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে জাহাঙ্গীর সংগীতপ্রিয়, চিত্রে পারদর্শী, কাব্যপ্রিয় ও কাব্যরসিক ছিলেন। তাঁহার রচিত আত্মজীবনী বাবরের আত্মজীবনীরই প্রায় অনুরূপ। গুণীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই, জাহাঙ্গীর কর্তৃক হিন্দু কবিগণ 'কবিরায়,' 'মহাপাত্র' প্রভৃতি উপাধিভূষিত হইয়াছেন, বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রথম ভৌগোলিক মানচিত্র প্রস্তুত করান। পলাসকাষ্ঠ হইতে স্বর্ণরেণু নির্মাণের চেষ্টা তাঁহার অনুসন্ধানী মনের পরিচয় দেয়।

গুণীর আদর

সুরাসক্তি জাহাঙ্গীরের জীবনের প্রধান অভিশাপ ; কিন্তু পিতা আকবরই প্রথম তাঁহাকে সুরাপানের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধব সহযোগে বিভিন্ন দেশীয় এবং বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত সুরার আসবে যোগদান করিতেন। উচ্ছল নৃত্য ও ললিত সংগীত তাঁহাকে আনন্দ দিত। অবশ্য জীবনের শেষভাগে নূরজাহান তাঁহার সুরাসক্তি সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানহেতু তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন।

সুরাভিলাষী জাহাঙ্গীর

ধর্মের দিক দিয়া জাহাঙ্গীর ছিলেন সুন্নী মুসলমান, তাঁহার পিতা ছিলেন দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তক উদারপন্থী মুসলমান। তাঁহার অন্যতমা পত্নী ছিলেন হিন্দু ধর্মপ্রাণা জগৎ গোঁসাইনী। পত্নী জগৎ গোঁসাইনীব ধর্মে জাহাঙ্গীর কোনদিন আঘাত করেন নাই। নূরজাহান ছিলেন শিয়া। জাহাঙ্গীর প্রথম জীবনে দীন-ই-ইলাহীর উদার মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আকবরের সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন—একজন পুরুষের একজনমাত্র স্ত্রী থাকিবে ; কিন্তু তিনি স্বয়ং শতাধিক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তিনি হিন্দুর বৈশাখী, হোলি, শিবরাত্রি, দশহরা প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করিতেন ; অথচ কাঙাড়ায় হিন্দুর বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিলেন—কোন হিন্দু মুসলমান নারী বিবাহ করিতে পারিবে না ; যে হিন্দু মুসলমান নারী বিবাহ করিয়াছেন তিনি হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবেন, নচেৎ স্ত্রী পরিত্যাগ করিবেন। দলপৎ রায় তাঁহার মুসলিম স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন—তাঁহার মুসলিম স্ত্রীও হিন্দু স্বামী

পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রতিটি অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দলপত রায়কে হত্যা করা হইল। অথচ জাহাঙ্গীর হিন্দু যোগী বাবালালের সঙ্গে প্রায় সহস্র দিবস অতি উচ্চাঙ্গের ধর্মালোচনা করিয়াছেন।

অদ্ভুত চরিত্র এই জাহাঙ্গীরের। জাহাঙ্গীরের আলোচনা মানুষকে চমৎকৃত করে; জাহাঙ্গীর বন্ধু, সখা, মিত্র, সুহৃদরূপে লোভনীয়; কিন্তু তাঁহাকে অনুকরণ করা যায় না এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাও অর্পণ করা যায় না।

বিলাসপ্রিয় শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ)

শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর ছিলেন অর্ধ হিন্দু; মাতা ছিলেন মোতি-রাজ উদয়সিংহের কন্যা জগৎ গোঁসাইনী (মানমতী)। সুতরাং শাহজাহানের দেহে ত্রি-চতুর্থাংশ হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। শাহজাহানের জন্মস্থান লাহোর। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৌষ পুর্ণিমা তিথিতে শাহজাহান জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহার নাম হইল খুররাম বা পূর্ণচন্দ্র। তাঁহার নাতিদীর্ঘ দেহ, সুঠাম গঠন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, যুগ্ম ভ্রূ এবং উজ্জ্বল কপিল চক্ষু এবং কৃষ্ণ চক্ষুমণি সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে তিল, হস্ততালু আপেল বর্ণ এবং অঙ্গুলিতে যবচিহ্ন প্রভৃতি শুভলক্ষণ ছিল। শাহজাহানের মুখমণ্ডল ছিল ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু পরিবৃত, তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল শ্রুতিমধুর। তিনি সম্রাট আকবরের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আকবর স্বয়ং তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য, কিঞ্চিৎ তুর্কী ভাষা, এবং ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সার্থক সেনানায়ক রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

শাহজাহানের বাল্যজীবন

ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট শাহজাহান

পনর বৎসর বয়সে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী আসফ খানের কন্যা আরজুমন্দ বানু শাহজাদা খুররামের বাগদত্তা হন, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনিই মমতাজ বেগম নামে সুপরিচিতা।

শাহজাহানের বিবাহ

ষোল বৎসর বয়সে সাফাবী বংশীয় মুজাফর হোসেনের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। এই বৎসরই ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আবদুর রহমান খান-ই-খানানের পুত্র শাহনওয়াজ খানের কন্যার সঙ্গে খুররামের বিবাহ হইল। শাহজাহানের (খুররামের) অন্তত একজন রাজপুতানী স্ত্রীও ছিল।

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর নূরজাহান, মীর্জা ঘিয়াস, আসফ খান এবং শাহজাদা খুররাম 'নূরজাহান চক্র' পরিচালনা করেন।

পনর বৎসর বয়সে খুররাম হিসার-ই-ফিরুজের জায়গির লাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। খুররাম পিতার রাজত্বকালে যথেষ্ট রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সানন্দে জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। নূরজাহানের সহিত মনোমালিন্যের ফলে এবং সিংহাসনের লোভে শাহজাহান নূরজাহান চক্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং বিদ্রোহী অবাঞ্ছিত মুঘল রাজপুত্ররূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে খুররাম পুনরায় পিতার স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

শাহজাহানের সিংহাসন লাভ ঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকালে শাহজাহান ছিলেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেই নূরজাহান তাঁহার

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

জামাতা শাহরইয়রকে সিংহাসনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খান জামাতাকে অবিলম্বে দিল্লী আগমনের জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তিনি ইতোমধ্যে খসরুর পুত্র দারবক্সকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। শাহরইয়র লাহোরে নিজেকে দিল্লীর বাদশাহরূপে ঘোষণা করিলেন। আসফ খান শাহরইয়রকে লাহোরের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। শাহজাহান তাঁহার মুঘলবংশীয় সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার জন্য ব্যবস্থা করিতে শ্বশুরকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। ফলে দুর্ভাগ্য দারবক্স রাজরক্তের ঋণ পরিশোধ করিলেন (২১শে জানুআরি, ১৬২৮ খ্রীঃ)। এইরূপে রক্তস্নানের পর ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে শাহজাহান সাড়ম্বরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজাহান পাঁচ মাস পরে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। মহা সমারোহে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আসফ খান আট হাজারী মনসবদার

এবং মহবৎ খান সাত হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হইলেন। নূরজাহান শাহ্‌জাহানের নিকট সসম্মান ব্যবহার লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নির্জনে লাহোরে স্বামীর সমাধির অদূরে অতিবাহিত করেন।

শাহ্‌জাহানের সিংহাসন লাভ

শাহ্‌জাহানের রাজত্বে বিপ্লব : রাজ্যারম্ভে শাহ্‌জাহান দুইটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। প্রথমে খান জাহান লোদী ১৬২৮-১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর শাহ্‌জাহানকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজা বুঝর সিং বুন্দেলার (১৬২৮-১৬২৯ খ্রীঃ) বিদ্রোহের ফলে শাহ্‌জাহানকে ভীষণ দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছি[illegible] সুদূর বঙ্গদেশে পর্তুগীজগণ ১৬৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিছুকাল শাহ্‌জাহানের শক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল।

খান জাহান লোদী ছিলেন দাক্ষিণত্যের শাসনকর্তা এবং পরভেজের উপদেষ্টা। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তিনি নূরজাহানের পক্ষ সমর্থন করিয়া শাহরইয়রকে সাহায্য করেন, কিন্তু শাহ্‌জাহানের সিংহাসনে আরোহণের পর খান জাহান লোদী শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন। শাহ্‌জাহান তাঁহার স্থলে মহবৎ খানকে দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; ফলে খান জাহান লোদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি আহম্মদনগরে উপস্থিত হইয়া নিজামশাহী সুলতানের পক্ষ সমর্থন করেন। শাহ্‌জাহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে খান জাহানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে খান জাহান লোদী পরাজিত হইয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে নিহত হইলেন।

খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ

বুন্দেলা রাজ বীরসিং জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় আবুল ফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র। বীরসিং-এর পুত্র রাজা ঝুঝর সিং শাহ্‌জাহানের রাজসভায় সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঝুঝর সিং-এর পুত্র বিক্রমজিৎ পিতার রাজ্য শাসন করিতেন। শাহ্‌জাহান ঝুঝর সিং-এর নিকট হইতে রাজস্ব সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাবি করিলেন। বুঝর সিং অপমানিত বোধ করিয়া বিদ্রোহ করিলেন। শাহ্‌জাহান তিন দিক হইতে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঝুঝর সিং নিরুপায় হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইহার পর পাঁচ বৎসর ঝুঝর সিং শাহ্‌জাহানের বশংবদরূপে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদিগকে সাহায্য করেন। শাহ্‌জাহানের নিষেধ সত্ত্বেও ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঝুঝর সিং দিল্লী সাম্রাজ্যের বহিরাংশে অবস্থিত বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করেন; শাহ্‌জাহান অসন্তুষ্ট হইয়া ঝুঝরসিং-এর বিরুদ্ধে সসৈন্যে আওরঙ্গজেবকে প্রেরণ করেন। ঝুঝর সিং এবং বিক্রমজিৎ নিহত হইলেন; পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাসহ ঝুঝর সিং

বুন্দেলা রাজা ঝুঝর সিং-এর বিদ্রোহ

এবং তাঁহার পুত্রের ছিন্নমুণ্ড আগ্রায় প্রেরিত হইল। ঝুঝার সিং-এর দুই পুত্রকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইল; তৃতীয় পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং নিষ্ঠুরভাবে নিহত' হইলেন। বুন্দেলা রাজার বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইল। বুন্দেলখণ্ডের প্রায় সমস্ত মন্দির ও বিগ্রহ অপবিত্র করিয়া নিশ্চিহ্ন করা হইল। বুন্দেলখণ্ডের অধীন মাহ্‌বারের সামন্ত রাজা চম্পৎ রায় শাহ্‌জাহানের ধর্মদ্বেষিতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চম্পৎ রায়ের পুত্র ছত্রশাল দীর্ঘকাল মুঘল সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ড বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু বুন্দেলা রাজপুত গোষ্ঠী বিজিত হয় নাই।

পর্তুগীজ দমন : ১৫৭৯ খ্রীষ্টা[illegible] আকবরের ফরমান অনুসারে পর্তুগীজ বণিকগণ হুগলী নদীর অপর তীরে সাতগাঁয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা হুগলী নদীর তীরে একটি কুঠিকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিল। ব্যবসায়ের নামে তাহারা জন-অধ্যুষিত শহরসমূহে দেশী-বিদেশী বণিকদিগের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করিত; অতর্কিতে হিন্দু-মুসলমান শিশুগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিত এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। তাহারা জলদস্যুরূপে বণিক এবং উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করিত। জাহাঙ্গীর বহু চেষ্টা করিয়াও এই ঘৃণ্য বণিকদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই।

পর্তুগীজ বণিকদের আচরণ

কালক্রমে পর্তুগীজ বণিকদের ঔদ্ধত্য এত বেশী বর্ধিত হইয়াছিল যে, তাহারা মমতাজ বেগমের দুইজন পলাতকা ক্রীতদাসীকে আশ্রয় দান করিয়াছিল। শাহ্‌জাহানের সিংহাসন আরোহণের পর দরবারের প্রথানুযায়ী পর্তুগীজগণ শাহ্‌জাহানের নিকট কোন ভদ্রতাসূচক বাণী অথবা উপহার প্রেরণ করে নাই। সিংহাসনের দ্বন্দ্বে তাহারা পরভেজের সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। এই সময় পর্তুগীজ জলদস্যুগণ ঢাকার নিকটবর্তী একটি গ্রাম লুণ্ঠন করিল এবং একজন মুসলমান নারীকে বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহানের আদেশে বাঙ্গলার সুবাদার কাসিম আলী খান পাঁচ মাস অবরোধের পর হুগলী অধিকার করেন। পর্তুগীজ ধনসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল এবং চারি সহস্র পর্তুগীজবন্দী আগ্রায় প্রেরিত ও নির্যাতিত হইল। অনেক পর্তুগীজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। বহু পর্তুগীজ রমণী ক্রীতদাসী এবং পর্তুগীজ পুরুষ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল।

পর্তুগীজদের শাস্তি-বিধান

শাহ্‌জাহানের সাম্রাজ্য-বিস্তার : শাহ্‌জাহান পিতা ও পিতামহের ন্যায় মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে

পূর্ব-সীমান্তস্থিত আহোমগণের সহিত মুঘল শক্তির দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। আহোম জাতির পরাজয়ের ফলে আসামের এক বিস্তীর্ণ অংশ মুঘল অধিকারভুক্ত হইল।

উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার

দিল্লী সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত কান্দাহার ছিল ভারতের বহির্ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র, বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং সামরিক সেনাবাস। কান্দাহারকে কেন্দ্র করিয়া ভারত ও পারস্যের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বিরোধ ছিল। আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে গোলযোগের সুযোগে পারস্যরাজ উহা পুনরুদ্ধার করিলেন; কিন্তু সাঁইত্রিশ বৎসর পরে আকবর কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্য-রাজ শাহ্ আব্বাস মুঘলবাহিনীকে পরাভূত করিয়া কান্দাহার হস্তগত করেন। জাহাঙ্গীর কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কোন বাহিনী প্রেরণ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আলী মর্দান নামক পারস্যরাজের জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর সাহায্যে শাহ্‌জাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ইহার এগার বৎসর পরেই পারস্য সম্রাট কান্দাহার পুনরধিকার করেন (১৬৪৯ খ্রীঃ)। শাহ্‌জাহান ক্রমান্বয়ে তিনটি অভিযান প্রেরণ করিয়াও কান্দাহার পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। এই ব্যর্থ অভিযানের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় হয় এবং মুঘল রাজ্যের সামরিক শক্তির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়।

কৌশলে কান্দাহার অধিকার

কান্দাহার উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা

শাহ্‌জাহান মধ্য এশিয়ার পূর্বপুরুষগণের অধিকৃত প্রদেশসমূহ জয় করিবার জন্যও চেষ্টা করেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র মুরাদের পরাক্রমে হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী লামঘান ও বদখ্‌সান মুখল অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু উজবেগ জাতি কর্তৃক বিপর্যস্ত হইয়া মুঘলবাহিনী অচিরে এই দুইটি স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

কান্দাহার অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন; আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় আহম্মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের সুযোগে শাহ্‌জাহান ঐ স্থানের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত পরিচিত ছিলেন। তখন গৃহবিবাদের ফলে আহম্মদনগর ছিল শক্তিহীন; বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল মুঘলশক্তি প্রতিরোধে অসমর্থ। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান নিজামশাহী শক্তির কেন্দ্র দৌলতাবাদ অধিকার করেন এবং নাবালক সুলতানকে বন্দী করেন। ইহার ফলে আহম্মদনগর রাজ্য চিরতরে সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার

আহম্মদনগর অধিকার

আহম্মদনগর বিজয়ের পর স্বাধীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার প্রতি

শাহজাহানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শাহজাহান স্বয়ং ছিলেন সুন্নী মুসলমান; সুতরাং শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয়কে দমন করিবার জন্ম স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বিনাযুদ্ধে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর প্রদানের শর্তে শাহজাহানের আনুগত্য স্বীকার করেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। বিজাপুরের সুলতান যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন। তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ কুড়ি লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। আহম্মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ বিজাপুরের সুলতানের নিকট হস্তান্তর করা হইল এবং অবশিষ্টাংশে মুঘল প্রাধান্য স্থাপিত হইল (১৩৩৬ খ্রীঃ)। এই বৎসরই শাহজাহান তাঁহার তৃতীয় পুত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা (সুবাদার) নিযুক্ত করেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের মধ্যবর্তী বালগানা প্রদেশ অধিকার করেন। বিজিত প্রদেশগুলিতে মুঘল শাসন দৃঢ় করিয়া আওরঙ্গজেব ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের উদ্দেশ্য: ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। শাসনকার্য ও সামরিক বাহিনীর রক্ষার ব্যয়-নির্বাহের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব অপ্রতুল ছিল। এই কারণে আওরঙ্গজেব রাজস্বের উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করেন। এই কঠিন কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন পারস্যদেশীয় (মতান্তরে ধর্মান্তরিত ভারতীয়) মুর্শিদ কুলী খান * নামক একজন বিচক্ষণ কর্মচারী। জরীপ, রাজস্বনির্ধারণ এবং যোগ্য কর্মচারী নিয়োগে তিনি টোডরমলের প্রথা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কৃষকগণকে রাজকোষ হইতে ঋণদানে সাহায্য করার ফলে দুই বৎসরের মধ্যে কৃষির অবস্থা উন্নত হইল।

রাজস্বের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা

উচ্চাভিলাষী আওরঙ্গজেব এইবার দাক্ষিণাত্যের শেষ দুইটি স্বাধীন রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর অধিকার করিতে উদ্যোগী হইলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বর্ধিত হারে কর দিতে অসম্মত হওয়ায় আওরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় প্রধান মন্ত্রী মীরজুমলার সহিত গোলকুণ্ডার সুলতানের মনোমালিন্য হওয়ায় মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করেন।

মীরজুমলার প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ সাইদ। তিনি পারস্য দেশ হইতে আসিয়া পাদুকা-ব্যবসায়িরূপে এদেশে জীবন আরম্ভ করেন। পাদুকা-ব্যবসায় ক্রমে হীরক-ব্যবসায়ে পরিণত হইল। পরিশেষে তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও

* দাক্ষিণাত্যের মুর্শিদ কুলী খান ও বাঙ্গলার মুর্শিদ কু। খান এক ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রতিভাবলে গোলকুণ্ডার মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি কর্ণাটক প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। অবশেষে মীরজুমলার পুত্রের সহিত গোলকুণ্ডার সুলতানের মনোমালিন্য হয়। মীরজুমলা তখন আওরঙ্গজেবের শরণাগত হইলেন। আওরঙ্গজেব মীরজুমলার পক্ষ অবলম্বন করিয়া অতর্কিতে গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দরাবাদ অধিকার করেন। কিন্তু শাহজাহান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল সম্রাটকে দান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অনতিকাল পরেই মীরজুমলা সম্রাট শাহজাহানের মন্ত্রী বা উজীরপদে নিযুক্ত হন।

আওরঙ্গজেব কর্তৃক হায়দরাবাদ অধিকার

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হইলে সেখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে আওরঙ্গজেব মীরজুমলার সহায়তায় বিজাপুর আক্রমণ করেন। বিদর, কল্যাণী প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গও মুঘলবাহিনীর হস্তগত হয়। কিন্তু এবারেও যুবরাজ দারার প্ররোচনায় সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন (১৬৫৭ খ্রীঃ)। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিজাপুর রাজ্যের কিয়দংশ মুঘল অধিকারভুক্ত হইল। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর হস্তগত হইলে আওরঙ্গজেব শক্তিশালী হইবেন—সম্ভবত এই আশঙ্কায় জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ও কন্যা জাহানারার প্ররোচনায় শাহজাহান যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ

সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ (১৬৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ): মুঘল রাজপরিবারে ভ্রাতৃবিরোধ, পারিবারিক কলহ এবং সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব নূতন ঘটনা নহে। বাবরের পিতৃরাজ্য ফরঘণা অধিকারের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁহাকে বিবাদ করিতে হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফরঘণা ত্যাগ করিয়া কাবুলে রাজ্যস্থাপন করেন। হুমায়ুন বাবরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ না করিলেও শেষ জীবনে বিনানুমতিতে বদখ্‌শান ত্যাগ করিয়া পিতাকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা কামরাণ, হিন্দাল ও আসকারীর নিকট হইতে সুব্যবহার লাভ করেন নাই কামরাণ এবং আসকারী হুমায়ুনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমের বিদ্রোহের ফলে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন এবং আকবর শেষ পর্যন্ত মীর্জা হাকিমের সহিত যুদ্ধ করেন। শাহজাদা সলিম আকবরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাদা খসরু পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দূরদর্শী আকবর মুঘল রাজপরিবারে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বসীমা সংকুচিত করিবার জন্য মুঘল

ভ্রাতৃবিরোধের প্রচ্ছদপট

বাদশাহজাদীদের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। শাহজাহান স্বয়ং তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে শাহজাহান তাঁহার ভ্রাতা শাহরইয়রকে যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করেন। নূরজাহানও মুঘল রাজপরিবারে নারীতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং তিনি বহু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন; অবশ্য ইহার পূর্বেও আকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগে মাহাম আনাঘা মুঘল রাজপরিবারে নানাপ্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণের পরে শাহজাহান মুঘলবংশের এগার জন সন্তানকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছিলেন। শাহজাহান জীবনের অন্তভাগে সিংহাসনের জন্য সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে চারি পুত্রকে রাজ্যের চারিটি অংশের প্রায় স্বাধীন শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পঞ্জাব ও দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পিতার সহিত দিল্লীতে বাস করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। দ্বিতীয় পুত্র শুজা বাঙ্গলার, তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শাহজাহানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা পাদশাহ বেগম জাহানারা দারার সমর্থক ছিলেন। রাজ্যের প্রজাবর্গ জানিত যে, শাহজাদা দারাই দিল্লীর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। দারা ছিলেন ধর্মে উদার, হিন্দুর প্রতি উষ্মাহীন, মুক্তমন এবং রাজপুত জাতি ও কৃষ্টির প্রতি সম্ভ্রমশীল। শুজা ছিলেন ধর্মে শিয়া মতাবলম্বী; তিনি সাহসী এবং রণনিপুন হইলেও বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপুরুষ, বিচক্ষণ রণনিপুন, কূটবুদ্ধি এবং কর্মকুশল, ধর্মে নিষ্করুণ সুন্নী এবং পরধর্মের প্রতি নিদারুণ বৈরী ভাবাপন্ন। ভগিনী রোশনারা ছিলেন ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী। মুরাদ ছিলেন ধর্মে সুন্নী, কিন্তু ধর্মের প্রতি তাঁহার আবেদন ছিল অত্যন্ত শ্লথ। তিনি সাহসী ও রণদক্ষ হইলেও স্থূলবুদ্ধি, মদ্যপায়ী বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ছিলেন। ভ্রাতা-ভগিনীরা সকলেই ছিলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজের গর্ভজাত।

দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে শাসনভার বণ্টন

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তভাগে শাহজাহান পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইলেন। রাজ দরবারে উপস্থিতি এবং ঝারোখা-ই-দর্শন বন্ধ হইয়া গেল। জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে সম্রাট শাহজাহান মৃত। সুবিশাল রাজ্যে সংবাদ আদান-প্রদান সময়সাপেক্ষ এবং দুরূহ ছিল; সুতরাং সেই যুগে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই সাধারণ লোক কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারিত করিত। শাহজাহানের মৃত্যুর জনশ্রুতি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ এবং দারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমেই মুরাদ উজীর আলী নকীকে হত্যা করিয়া নিজেকে

দিল্লীর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। শুজা রাজমহলে দিল্লীর বাদশাহরূপে নিজের অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং পূর্ব দিক হইতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে বারাণসীতে দারা শিকোর পুত্র সুলেমান তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। শুজা বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেব একাকী অগ্রসর না হইয়া স্থূলবুদ্ধি মুরাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। কোরাণ স্পর্শ করিয়া আওরঙ্গজেব শপথ করিলেন যে, যুদ্ধে জয়ী হইলে তাঁহারা মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবেন। আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের মিলিত বাহিনী আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলে সম্রাট শাহ-জাহানের আদেশে উজ্জয়িনীর সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্মাটের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যোধপুরের রাজা যশোবন্ত এবং মুঘল সেনাপতি কাসিম খান তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন ; যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের জয় হইল। ধর্মাটের যুদ্ধে দারার পরাজয়ের কারণ হিন্দু-মুসলমান সেনাপতির মধ্যে মতান্তর। রাজপুত সেনাপতি দারার পক্ষে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও মুঘল সেনাপতি কাসিম খান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন। যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বীর পত্নী মহামায়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বরাজ্যে আগমন করিবেন। গর্বিতা রাজপুত নারী স্বামীর সম্মুখে রাজপুরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মাটের যুদ্ধ জয়ের ফলে আওরঙ্গজেবের শক্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধি সর্বভারতে বিস্তৃত হইল।

সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব

ধর্মাটের যুদ্ধ

আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী বিনা বাধায় আগ্রার চারি ক্রোশ পূর্বদিকে সামুগড়ের বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হইল। দারা অর্ধ লক্ষ সৈন্যসহ সামুগড়ের প্রান্তরে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। সমস্ত দিবসব্যাপী যুদ্ধ হইল। দারার রণহস্তী চক্ষুতে তীরবিদ্ধ হইয়া ভীষণভাবে আহত হইল। দারা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া একটি পতাকাবিহীন অশ্বে আরোহণ করিলেন। শাহজাদা দারার হস্তী অরোহীশূন্য দেখিয়া সৈন্যগণ বিভ্রান্ত হইল এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিল। দারা হতাশ হইয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ; যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট রহিল তাঁহার শিবির, রণসম্ভার এবং বিপুল অর্থ। আওরঙ্গজেব সহজেই উহা হস্তগত করিলেন। সামুগড়ের যুদ্ধ জয়ের পরে আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অবরোধ করিলেন। শাহজাহান পুত্রদের মধ্যে বিবাদ মীমংসার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা আওরঙ্গজেবের অনমনীয়তার জন্য নিষ্ফল হইল।

সামুগড়ের যুদ্ধ

আওরঙ্গজেব শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গ সমর্পণে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে

যমুনার জলধারা রুদ্ধ করিয়া দিলেন। খাদ্য-পানীয় বিলাসে অভ্যস্ত শাহজাহান আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ পুতিগন্ধময় কূপের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় দিবসে শাহজাহানের আদেশে আগ্রার দুর্গদ্বার আওরঙ্গজেবের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। পুত্র আওরঙ্গজেবের হস্তে দিল্লীশ্বর শাহজাহান বন্দী হইলেন।

শাহজাহান বন্দী

আওরঙ্গজেব ও মুরাদ: আগ্রা হইতে আওরঙ্গজেব দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে মথুরার সন্নিকটে রূপনগরের শিবিরে বিজয়ী বীর মুরাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। শিবির সুসজ্জিত করা হইল. মুরাদের অভ্যর্থনার জন্য তীব্র সুরা, লাস্যময়ী নর্তকী, সুগন্ধ খাদ্য-পানীয়, আলোর মালা, পুষ্পস্তবক শিবিরে আনীত হইল। অতিরিক্ত মদ্যপানে মুরাদ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নিদ্রাশেষে মুরাদ দেখিলেন—তাঁহার তরবারি অপসারিত, হস্তপদ শৃঙ্খলিত, অবশ্য সেই শৃঙ্খল ছিল স্বর্ণশৃঙ্খল। মুরাদ প্রথমে সলিমগড়ের দুর্গে, পরে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরিত হইলেন। উজীর আলী নকীকে হত্যার অপরাধে বিচারের প্রহসনে মুরাদের প্রাণদণ্ড হইল। আওরঙ্গজেবের সিংহাসনের সম্মুখ হইতে একটি কণ্টক চিরতরে দূরীভূত হইল। অবশিষ্ট রহিলেন দারা এবং শুজা।

মুরাদের প্রাণদণ্ড

আওরঙ্গজেব ও শুজা: ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারা শিকোর পরাজয়ে শুজা উল্লসিত হইয়াছিলেন। তিনি নূতন উৎসাহে পুনরায় আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু এলাহাবাদের অদূরে খাজুয়ার নিকটে পরাজিত হইলেন (৫ই জানুআরি, ১৬৫৯ খ্রীঃ)। মীরজুমলা শুজার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শুজা পাটনা, ভাগলপুর ও রাজমহল অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামের পথে আরাকানে উপস্থিত হইলেন। পথে আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহম্মদ, সেনাপতি মীরজুমলার সহিত বিবাদ করিয়া সাময়িকভাবে শুজার শিবিরে যোগদান করিয়াছিলেন। শুজা বোধ হয় আরাকানে সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন। শাহজাদা মুহম্মদ শুজার সহিত যোগদানের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

আওরঙ্গজেব ও দারা শিকো: সামুগড়ে দারা শিকোর পরাজয়ের পরে তাঁহার বহু সৈন্য ও সেনাপতি আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। সুলেমান শিকো ও তাঁহার পত্নী শতেক বিশ্বস্ত অনুচরসহ গাহড়ওয়ালের হিন্দু-রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের ভীতি প্রদর্শনের ফলে গাহড়ওয়াল রাজকুমার সুলেমান শিকোকে মুঘল বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত, আলুলায়িত কেশ, জীর্ণবসন পরিহিত, সম্রাট শাহজাহানের পৌত্র দরবারে আনীত হইলেন। এই যুবক ছিল মুঘলবংশের সুন্দরতম সন্তান। সুলেমান শিকো বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে অনুরোধ করিলেন—

"আমাকে হত্যা করুন, কিন্তু পোস্তের জল (আফিং ভিজান জল) পানের জন্য দেবেন না, আমি উন্মাদ হয়ে যাব।" আওরঙ্গজেব কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, পোস্তের জল দিবেন না। কিন্তু গোয়ালিয়র দুর্গে প্রথম দিনেই সুলেমান শিকোকে পোস্তের জল পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৬৬২ খ্রীঃ) এই পানীয়ই প্রদান করা হইয়াছিল। দারা শিকোর কনিষ্ঠ পুত্র শিপার শিকো এবং মুরাদের পুত্র ইজিদ বক্সকে অত্যন্ত শিশু বিবেচনা করিয়া রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দান করা হইয়াছিল। পরিবর্তী কালে শিপার শিকোকে আওরঙ্গজেবের তৃতীয় কন্যা এবং ইজিদ বক্সকে আওরঙ্গজেবের পঞ্চম কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। অদৃষ্টের পরিহাস!

সুলেমান শিকোর মৃত্যু

দারা শিকোর শেষ জীবন ছিল অত্যন্ত শোকাবহ। আগ্রা দুর্গ অধিকৃত এবং শাহজাহান কারারুদ্ধ হইবার পর দারা শিকো দিল্লী হইতে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, বর্ষান্তে পুনরায় আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিবেন। আওরঙ্গজেব বর্ষার পূর্বে শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। দারা সপরিবারে মুলতানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা শাহ নওয়াজ তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করিলেন। এই সাহায্য লাভ করিয়া দারা দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত যোগদান করিয়া আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। সেই সময় যশোবন্ত সিংহ দারা শিকোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দারা যশোবন্ত সিংহ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া আজমীরের দুই ক্রোশ দূরে দেওরাই-এর গিরিবর্ত্মে একটি খণ্ডযুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন (১২ই এপ্রিল, ১৬৫৯ খ্রীঃ)। জয়সিংহ এবং বাহাদুর খান দারার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। দারা ভারতের

দারা শিকোর পরিণাম

দারা শিকো—দরবারের শিল্পী হুনহর কর্তৃক অঙ্কিত

অভ্যন্তরে আশ্রয় লাভ অসম্ভব মনে করিয়া পারস্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দাদারের (বোলান গিরিবর্ত্মের সন্নিকটে) আফঘান সর্দার জিওন খানের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পূর্বে জিওন খান শাহজাহান কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং দারা শিকো সেই প্রাণদণ্ড হইতে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। দাদরের শিবিরে তাঁহার প্রিয়পত্নী বহু সুখদুঃখের অংশভাগিনী পরভেজের কন্যা নাদীরা বেগম ইহলোক পরিত্যাগ করেন। অন্যদিকে মালিক জিওন খানই দুই কন্যা ও এক পুত্রসহ দারাকে মুঘল সেনাপতি বাহাদুর খানের হস্তে সমর্পণ করেন (অগস্ট, ১৬৫৯ খ্রীঃ)। সাত দিনের মধ্যেই হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় দারা শিকোকে একটি অনাবৃত হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হইল। অপমানে, দুঃখে এবং আশঙ্কায় দারা একবারও চক্ষু উত্তোলন করেন নাই। ফরাসী চিকিৎসক বার্ণিয়ার বলিয়াছেন—"পথে বহু লোক ছিল, সকলেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত, সকলেরই কণ্ঠস্বর বিষাদময়। কিন্তু কোন লোক আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে সাহস করে নাই।" এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ জনতা বিশ্বাসঘাতক জিওন খানের শিবির আক্রমণ করিল।

মালিক জিওন খান কর্তৃক দারা সপরিবারে মুঘল হস্তে সমর্পিত

আওরঙ্গজেব ভীত হইয়া পরদিন ধর্মদ্বেষিতার অভিযোগে দারা শিকোকে কাজীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। অপরাধ—তাঁহার হস্তের অঙ্গুরীয়তে "প্রভু" নাম ক্ষোদিত ছিল এবং তিনি কাফেরের ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল এবং তাঁহার ছিন্নমুণ্ড কারাগারে শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হইল। দারার মৃতদেহ দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে হুমায়ুনের সমাধির পার্শ্বে প্রোথিত করা হইল; উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে যেন কেহ দারার ছদ্মবেশে দিল্লীর সিংহাসন দাবী না করে।

দারা শিকোর বিচার ও প্রাণদণ্ড

শাহজাহানের কারাজীবন: সম্রাট শাহজাহানের শেষ জীবন চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুর দিন (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত আট বৎসর তিনি আগ্রার শাহবুরুজ প্রাসাদে বাস্তবিক পক্ষে বন্দী-জীবন যাপন করিয়াছেন। প্রথমে সর্বশক্তিমান সম্রাট শাহজাহান নিজের বন্দী জীবনকে স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, দারার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আশা করিতেন যে, হয়ত দারা পুনরায় জয়লাভ করিতে পারিবেন। শাহজাহান দারার নিকট গোপনে উপদেশ ও আশীর্বাদপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিতেন। শুজার আগ্রা অভিযান সংবাদে উল্লসিত হইয়া শাহজাহান পুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। গুপ্তচর আওরঙ্গজেবকে

শাহজাহানের বন্দী জীবন

হস্তে এই পত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। ফলে আওরঙ্গজেব আদেশ দিলেন—বাদশাহের বিনানুমতিতে শাহজাহানের সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। শাহজাহানের নিকট হইতে মস্যাধার, লেখনী, কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য অপসারিত হইল।

শাহজাহানের অপমান এইখানেই শেষ হয় নাই। অতি তুচ্ছ কার্যেও সামান্য কর্মচারী আওরঙ্গজেবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শাহজাহানকে অপমানিত করিত। শাহজাহান জীর্ণ পাদুকা (চপ্পল) পরিবর্তনের জন্য তাঁহার পরিচারককে আদেশ দিয়াছিলেন, সাতদিনের মধ্যেও পরিচারকের পক্ষে শাহজাহানের চপ্পল আনয়নের অবসর হইল না। দ্বিতীয় বার তিনি পরিচারককে আদেশ করিলেন। পরিচারক আগ্রার বাজার হইতে পঞ্চ তঙ্কা মূল্যের চর্ম পাদুকা শাহজাহানের জন্য ক্রয় করিয়া আনিল; শাহজাহান জীবনে কখনও মুক্তা খচিত মখমলের চপ্পল ভিন্ন অন্য কোন চপ্পল ব্যবহার করেন নাই। শাহজাহান অত্যন্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন, নিঃসঙ্গ কারাজীবনে বীণা ছিল তাঁহার একমাত্র সঙ্গী।, একদা বীণার তার ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল—বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিচারকেব পক্ষে দশ দিনের মধ্যে নূতন তার সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই।

স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা ব্যবহার শাহজাহানের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল—প্রথম কারণ, ইসলামে স্বর্ণ-বৌপ্য, মণি-মুক্তা ব্যবহার মুসলিমের পক্ষে নিষিদ্ধ; দ্বিতীয় কারণ, বন্দীর স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্র বা অলংকার ব্যবহারের অধিকার নাই। শাহজাহানের শয়নকক্ষ হইতে সর্বপ্রকার মণিমুক্তা খচিত রাজপরিচ্ছদ এবং ভোজনকক্ষ হইতে খাদ্য ও পানপাত্র অপসারিত হইল। শাহজাহানের মণিমুক্তা অপসারণের ব্যাপারে পিতা-পুত্রের পত্র বিনিময় অত্যন্ত করুণ, নিষ্ঠুর। আওরঙ্গজেবের লোভ এবং শাহজাহানের অভিসম্পাত তীব্র- মর্মান্তিক।

দারার মৃত্যুর পরে শেষ পর্যন্ত শাহজাহান নিশ্চিত হইলেন যে, আওরঙ্গজেব সিংহাসনে অটল, শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তখন তিনি আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভাতে কোরাণ পাঠ, মধ্যাহ্নে নিদ্রা এবং সন্ধ্যায় আগ্রার প্রাসাদের অলিন্দ হইতে দূরে যমুনার তীরে মমতাজের সমাধিব দিকে করুণ দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কর্মসূচী। তিনি নীরবে পুত্রকে অভিসম্পাত করিতেন, নিজের অদৃষ্টকে পরিহাস করিতেন। এই দুর্ভাগ্যের মুহূর্তে তাঁহার মাতৃসমা কন্যা জাহানারা তাঁহার সেবা-যত্নে ও সান্নিধ্যে ব্যাথার ভার যথাসম্ভব লঘু করিয়াছিলেন। জীবনের শেষদিনে শাহজাহান জাহানারার মাধ্যমে আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করিয়া একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেব কর্তৃক কারারুদ্ধ অবস্থায় অশেষ লাঞ্ছনা, আপমান ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দীর্ঘ আট বৎসর পরে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

শাহজাহানের মৃত্যু (১৬৬৬ খ্রীঃ)

কিন্তু মৃত্যুর পরে শাহজাহানকে রাজোচিত সমারোহে সমাধিস্থ করা হয় নাই। প্রাসাদের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া বাদশাহের মৃতদেহ কয়েকজন অজ্ঞাতনামা খোজা ও দাস রাত্রির অন্ধকারে তাজমহলের দিকে বহন করিয়া চলিল। জাহানারা মৃত পিতার পারলৌকিক মঙ্গলার্থে কিছু অর্থ পথে দরিদ্র ও ফকির-দিগকে বিতরণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব সে অর্থ প্রদান করিতে দেন নাই—কারণ বন্দীর কোন অর্থ নাই, ভিক্ষাদানের অধিকারও নাই, বন্দীর অর্থ-সম্পদ বাদশাহের প্রাপ্য।

আওরঙ্গজেব অনুগ্রহ করিয়া শাহজাহানের মৃতদেহ মমতাজের পার্শ্বে সমাধিস্থ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বোধ হয় বিবেককে সুস্থ করিয়াছিলেন।

বিলাসপ্রিয় শাহজাহান: শাহজাহান যে কেবল বিলাস, নৃত্য, সংগীতের মধ্যেই জীবন যাপন করিতেন, তাহা মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা হইবে। প্রভাতে শয্যাত্যাগ, স্নান, নমাজ, কোরাণ পাঠ এবং ঝারোখা-ই দর্শন সমাপ্ত করিয়া শাহজাহান দিওয়ান-ই-আম নামক প্রকাণ্ড রাজদরবারে উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য খচিত ময়ূর সিংহাসনে উপবেশন করিতেন॥

শাহজাহানের দৈনন্দিন কর্মসূচী

সম্মুখে দুই পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধ দণ্ডায়মান মনসবদার, মস্তোপরি পতাকা হস্তে 'কুরচী' নামক কর্মচারী, পশ্চাতে শাণিত অস্ত্র হস্তে ভীষণদর্শন হাবসী দেহরক্ষী, সিংহাসনের নিম্নে বহু বর্ণ ভূষণ শোভিত সুদর্শন বালকভৃত্য। প্রভাতে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের চারঘড়ি অন্তে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকায় সময় রাজকার্য আরম্ভ করিতেন; সময়ের ব্যতিক্রম কল্পনাতীত ছিল। দিওয়ান-ই-আমে প্রধানত বৈদেশিক রাজদূতদিগের অভ্যর্থনা, ফকীর, দরবেশদিগের দান-ব্যবস্থা, আমীরদের পদোন্নতি ঘোষণা, উপাধি ও রাজভূষণ বিতরণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইত। এই কার্যে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে সম্রাট সপারিষদ নব সংগৃহীত হস্তী ও অশ্ব পরিদর্শন করিতেন। দিওয়ান-ই-আমের কর্মধারা ছিল আনুষ্ঠানিক।

দিওয়ান-ই-আমের কর্ম সমাপ্তির পর বাদশাহ দিওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত হইতেন। শাহজাহান দিল্লী ও আগ্রা উভয় স্থানেই দিওয়ান-ই-খাস নির্মাণ করিয়াছিলেন। দিওয়ান-ই-খাসের কার্য ছিল বাস্তব এবং বৈষয়িক। উজীর, উকিল, দিওয়ান, বক্সী, সদর সিপাহশালার নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য নিবেদন করিয়া আদেশ গ্রহণ করিতেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট ওয়াকিয়া-নবীশ বা সংবাদ লেখক সম্রাট-উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষর লিপিবদ্ধ করিতেন। দিওয়ান-ই-খাস ছিল সত্যই মর্ত্যে স্বর্গ।

"আগর বর রুহ্-ই জমিন ফিরদোস আস্ত্।
হামিন আস্ত্, হামিন আস্ত্, হামিন আস্ত্॥"

দিওয়ান-ই খাসের কার্য ছুই ঘণ্টায় সম্পন্ন হইত। তারপর বাদশাহ শাহজাহান বাদশাহজাদা ও পাঁচ জন অতি উচ্চ কর্মচারিসহ শাহবুরুজ নামক গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইতেন। শাহবুরুজের গোপন সভায় রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,—যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি-পত্র, সুবাদার নিযুক্তি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইত। এই সমস্ত কার্যে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া শাহজাহান দ্বিপ্রহরের পূর্বেই অন্তঃপুরে গমন করিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকালের মধ্যে দ্বিপ্রহরের ভোজন এবং বিশ্রাম সম্পন্ন করিতেন; বিশ্রামের পর মমতাজ বেগম অনাথা, বিধবা অথবা কুমারীদের অর্থ সাহায্যের আবেদন করিতেন। তিনি অনেক কুমারী বিবাহের ব্যবস্থা করিতেন। শাহজাহান কখনও কোন প্রার্থীকে নিরাশ করিতেন না। প্রতিদিন রাজকোষ হইতে দানখয়রাত বহু অর্থ ব্যয়িত হইত।

দিনের শেষে শাহজাহান পুনরায় দিওয়ান-ই-খাসে এবং শাহবুরুজের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে আশু প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য উপস্থিত হইতেন; কখনও বা রাজ-উদ্যানে পশু-পক্ষীর যুদ্ধ, বাজিকরের খেলা, অথবা সংগীত উপভোগ করিতেন।

দিনের আলো শেষ হইলে রাজপ্রাসাদের চারি পার্শ্বে মশাল প্রজ্জলিত হইত, প্রাসাদের প্রতি কক্ষ বিচিত্রবর্ণের ঝাড়লণ্ঠনের দীপের আলোয় উজ্জল হইয়া উঠিত, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে আলোর মালা সংযোজিত থাকিত। বাদশাহ শিস্‌মহলের নৃত্যকক্ষে লাস্যময়ী নর্তকীর নৃত্য উপভোগ করিতেন। সেই কক্ষটির প্রাচীর ছিল শিসা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ দ্বারা আবৃত। একটি নারী নৃত্য করিলে তাহার নৃত্যছন্দ, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দর্পণে প্রতিফলিত হইত। শিস্‌মহলে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল, তরল আনন্দের সহিত নৃত্য-সংগীত পরিবেশিত হইত। নৃত্য-সংগীতের শেষে শাহজাহান নৈশভোজন কক্ষে উপস্থিত হইতেন। কাশ্মীর হইতে প্রতিদিন সম্রাটের জন্য পুষ্পস্তবক ও পানীয় জল আনীত হইত। অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রজালের অন্তরালে নৃত্যকক্ষের নূপুর নিক্কণ, সুকণ্ঠ সংগীত, উচ্ছল হাস্যধ্বনি, সুগন্ধ খাদ্য-পানীয়কে আমোদিত করিত। কক্ষের অভ্যন্তরে বিচিত্র বর্ণের আলোর ঝাড়, পরস্পর অতিক্রান্ত আলোর মালা অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিত। ভোজনান্তে শাহজাহান রাত্রি দশ ঘটিকার সময় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতেন। পার্শ্ববর্তী কক্ষে কোরাণ, কখনও বা ইতিহাস পাঠ হইত। শাহজাহানের প্রিয় গ্রন্থ ছিল 'তুজুক-ই-বাবর'।

শাহজাহান সত্যই বন্দী জীবনের পূর্বদিন পর্যন্ত জীবনের পান পাত্র আকণ্ঠ পান করিয়াছেন।

শাহজাহানের ধর্ম জীবন: শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর ছিলেন উদার স্বামী; মাতা জগৎ গোঁসাইনী ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তিনি কপালে চন্দন-তিলক অনুলেপন করিতেন বলিয়া উপহাসপ্রিয় জাহাঙ্গীর তাঁহার

'গোঁসাইনী' নামকরণ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের পত্নী মমতাজ ছিলেন শিয়া। শাহজাহান প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ করিতেন; রমজান মাসে রোজা বা উপবাস পালন করিতেন; ইসলাম অনুমোদিত পুণ্য দিবসে কোরাণ পাঠ করিতেন এবং ফকিরদিগকে অর্থ দান করিতেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার পিতামহ ও পিতার ধর্মমতের বিরুদ্ধে মোল্লাদের উষ্মা ছিল।

সূর্যোদয়ের দুই ঘড়ি পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া শাহজাহান স্নান করিতেন এবং রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মসজিদে নমাজ পড়িতেন। নমাজের শেষে তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত মালা জপ করিতেন। মালা জপের পরে ঝারোখা-ই-দর্শনের জন্য পূর্ব অলিন্দে উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগকে দর্শন দান করিতেন। শিয়া মুসলমানদিগের জন্য তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। আওরঙ্গজেব পিতার কর্মধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শাহজাহান ধর্মে উদার ছিলেন না।

শাহজাহান রাজ্য লাভ করিয়া ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সিজদা বা রাজদরবারে প্রণাম নিষিদ্ধ করিলেন, পরিবর্তে বাদশাহের সম্মুখে জমিন বুস (ভূ-চুম্বন) প্রথা প্রবর্তন করিলেন। শেষ পর্যন্ত ভূ-চুম্বন প্রথার পরিবর্তে 'চাহার তসলিম' প্রথা প্রবর্তন করেন। চাহার তসলিম প্রথা অনুসারে প্রজা রাজার সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে, হস্ত দ্বারা কপাল চক্ষু এবং বাহু স্পর্শ করিবে। উলামা ও ফকিরদের জন্য এই প্রথা অবশ্য পালনীয় ছিল না। শাহজাহান হিন্দুদিগরে উপর তীর্থস্নান কব পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বুন্দেলরাজ ঝুঝব সিং-এব পবাজয়েব পর তাঁহার বন্দী পুত্রদিগকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যা এবং অন্যান্য পুরনারীকে আমীরদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বুন্দেলরাজ্য মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল। শাহজাহানের আদেশে রাজ্যের অধিকাংশ মন্দির নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। শাহজাহান মুসলিম কর্মচারিদিগকে ধর্মদ্বেষিতায় প্রশ্রয় দিতেন। শাহজাহানের আদেশে ওরচা রাজার বিখ্যাত মন্দির ধূলিসাৎ করা হইল।

পরমধর্মসহিষ্ণুতার নীতি পরিত্যক্ত

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর সমীপ অঞ্চলে পুরাতন মন্দির সংস্কার এবং নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ হইল। এই বৎসর ছিয়াত্তরটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। তিনি পর্তুগীজ বন্দিদিগকে আগ্রায় আনয়ন করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন; দীক্ষিত হইতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করা হইত। বহু পর্তুগীজ নারীকে আমীরদের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব এবং কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। শাহজাহান আদেশ দিলেন—যে সমস্ত হিন্দু মুসলিম নারী বিবাহ করিয়াছে তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে মুসলিম পত্নী পরিত্যাগ করিতে

বাধ্য হইবে। তিনি শাহ লাহোরী এবং মহবুব আলী সিন্ধী নামক দুইজন আমীরকে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। হিন্দুদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ নির্ধারিত হইল। মুসলিম কবরের নিকটে সতীদাহ নিষিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান উজীর ধর্মান্তরিত হিন্দু সাদত আলী খানকে তিনি স্থায়ী পদ প্রদান করেন নাই।

অথচ শাহজাহান দারা এবং জাহানারার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আলোচনার বিরোধিতা করেন নাই। তিনি সংস্কৃত ও হিন্দী কবিদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন। পণ্ডিত জগন্নাথ শাহজাহানের বৃত্তি ভোগ করিতেন। শাহজাহান কবি সুন্দর দাসকে 'মহাকবি রায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। কবি চিন্তামন শাহজাহানের অন্তরঙ্গ ছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষী দ্বারা তিনি পরিবারের সকল জাতকের কোষ্ঠি রচনা করিতেন; দিনক্ষণ দেখিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। বাদশাহ ও শাহজাদাদিগের জন্মদিনে তাহাদিগকে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তৌল করিতেন—এই প্রথার নাম তুলাদান। সেই তৌল অর্থ ফকির, দরবেশ এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। বসন্ত পঞ্চমী, হোলি, দশহরা প্রভৃতি হিন্দু উৎসব দরবারে অনুষ্ঠিত হইত।

হিন্দু মনসবদার এবং রাজাদিগের অভিষেকের দিনে হিন্দু প্রথানুসারে দরবারে সকলের কপাল চন্দন অনুলিপ্ত হইত, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইত। কাম্বে অঞ্চলে গোহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; উড়িষ্যা অঞ্চলে হিন্দুর পক্ষে পবিত্র ময়ূরপক্ষী বধ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ শাহজাহানের রক্তে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ হইয়াছিল; তাঁহার চরিত্রেও বিবিধ দোষগুণের সমাবেশ হইয়াছিল। কিশোর খুররাম পিতা জাহাঙ্গীরের অকৃত্রিম স্নেহভাজন ছিলেন, পিতা তাঁহাকে শাহজাহান উপাধি, দ্বিতীয় স্বর্ণ সিংহাসন, ত্রিশহাজারী মনসব দানে সম্মানিত করেন। কিন্তু শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে চারি বৎসর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিয়াছেন; অবশ্য এই বিদ্রোহের জন্য নূরজাহানেরও আংশিক দায়িত্ব ছিল। শাহজাহানের রক্তে পিতৃদ্রোহের ধারা ছিল। আঠাশ বৎসর বয়সে পুত্র সলিম পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, আঠাশ বৎসর বয়সে শাহজাহানও পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। রাজ্যারম্ভেই সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার পুত্র খসরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, পুত্রের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেন। শেষ পর্যন্ত শাহজাহান পিতার রাজত্বকালেই ভ্রাতা খসরুকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ আংশিক পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শাহজাহান রাজ্যারম্ভেই ভ্রাতা শাহরইয়রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং অন্ধ করিয়া দেন। শাহজাহানের আদেশে তাঁহার শ্বশুর আসফ খান নিরপরাধ ভ্রাতুষ্পুত্র দারবক্সকে হত্যা করিলেন; দারবক্সের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতা শাহরইয়র, দানিয়ালের দুই পুত্র

বংশধারা

তাহমুর্স এবং হুসাঙ ও অন্যান্য ছয়জন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া শাহজাহান রাজসিংহাসন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে শাহজাহান সিংহাসনের দ্বন্দ্বে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো, কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ এবং পাঁচজন পৌত্রের হত্যার নীরব সাক্ষী হইয়াছিলেন ; অবশ্য তৃতীয় পুত্র শুজাব সম্বন্ধে কোন শ্রুতিমধুর সংবাদ তিনি লাভ করেন নাই। সিংহাসন ছিল শাহজাহানের কাম্য—রক্তস্রোতের মধ্য দিয়া শাহজাহান তাঁহার কাম্য সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, রক্তস্রোতের মধ্য দিয়াই শাহজাহান সিংহাসনচ্যুত হন। বিনা অপবাধে নিহত আত্মীয়বর্গের অভিশাপ শাহজাহানকে শেষ জীবনে সম্পূর্ণ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পিতারূপে শাহজাহান

পিতারূপে শাহজাহান তাঁহার পূর্বপুরুষ বাবর, হুমায়ুন, আকবর এবং জাহাঙ্গীরের মত স্নেহশীল ছিলেন নিঃসন্দেহ। মুঘল রাজ বংশে পিতৃস্নেহের রূপ অপরূপ, মুঘল রাজপুত্রের মনোভাব নিষ্করুণ। 'সিংহাসনের খেলায়' মুঘল রাজপুত্র ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন নাই ; জ্যেষ্ঠপুত্র দারার প্রতি দুর্বলতা ও স্নেহ-প্রবণতা শাহজাহানের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হয় নাই।

স্বামীরূপে শাহজাহান

আগ্রার তাজমহলে শাহজাহানের পত্নী-প্রীতি প্রস্তরের অক্ষরে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। শাহজাহানের অন্তত তিন জন বিবাহিতা পত্নী ছিলেন, প্রথমা পত্নী পারস্য দেশীয় সাফবী বংশীয়া মীর্জা হুসেনের কন্যা, দ্বিতীয়া পত্নী নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানেব কন্যা (তাজবিবি), তৃতীয়া পত্নী আবদুর রহমান খান-ই-খানানের পৌত্রী। এই তিন জন পত্নী ভিন্ন তাঁহার হিন্দু পত্নীও ছিলেন। অসংখ্য দাসী ও নর্তকী শাহজাহানেব কৃপার পাত্রী ছিল। মুসলিম পুরুষ বিশেষত অভিজাত পরিবারের পুরুষ সন্তান ছিল বহুপত্নীক। পত্নী ছিল মুঘল পরিবারের বিলাসের সামগ্রী। একাধিক পত্নী মুসলিম সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। শাহজাহানের বহু-পত্নীত্ব মুঘল পরিবারের নীতি বহির্ভূত ছিল না। ইওরোপীয় ভ্রমণকারী বার্ণিয়ে, পিটার মুণ্ডী, টেভার্ণিয়ে শাহজাহানের চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার অবিশ্বাস্য কুৎসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুঘল রাজান্তঃপুরে মীনাবাজার, দরবারের সংশ্লিষ্টা নর্তকী, শত শত অন্তঃপুরিকা এবং দাসীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়াই এই সমস্ত কুৎসা পরিবেশিত হইয়াছে। সংগীত, নৃত্য এবং নর্তকী ছিল রাজদরবারের অচ্ছেদ্য অংশ। ইওরোপীয় ভ্রমণকারীরা প্রায়ই মুঘল রাজান্তঃপুরের সম্বন্ধে সংবাদ বা জনশ্রুতি বাজার হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং বাজারী কাহিনীর উপর রঙ করিতেন। মানুচ্চী বলিয়াছেন, বার্ণিয়ে কখনও রাজদরবারে প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং বার্ণিয়ে প্রদত্ত রাজপরিবার-সংশ্লিষ্ট সংবাদ নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সেনা ও সেনাপতিরূপে শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীর অপেক্ষা নিপুণ

ছিলেন। অবশ্য যোদ্ধারূপে আকবরের সহিত শাহজাহানের তুলনা হয় না। শাহজাহান কৈশোর ও প্রারম্ভ জীবনে চিতোর ও দাক্ষিণাত্যে সামরিক কৌশল ও কূটনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন; জীবনের অন্তভাগ পর্যন্ত শাহজাহান স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু কান্দাহারের যুদ্ধে তিনি পারদর্শিতার প্রমাণ দিতে পারেন নাই। অবশ্য মধ্য এশিয়ার অভিযানে কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ বিজয় শাহজাহানের পূর্বপুরুষগণ প্রায় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ঝুঝর সিং, খান জাহান লোদী ও পর্তুগীজ বিদ্রোহ দমন ভিন্ন উল্লেখ-যোগ্য নূতন কোন সামরিক অভিযানের অবকাশ তাঁহার ছিল না। কিন্তু শাহজাহান সুদূর দক্ষিণের মারাঠা বীর শিবাজীর অভ্যুত্থানের ভবিষ্যৎ রূপ কল্পনা করিতে পারেন নাই; ভারতের উপকূলে শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীতাও তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বাণিজ্য প্রসারের অন্তরালে যে বণিকদের অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহাও চিন্তা করিতে পারেন নাই। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গলার পর্তুগীজ সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে তিনি একটি খণ্ড ঘটনারূপে বিচার করিয়াছেন; তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ। বণিকের মানদণ্ড যে ভবিষ্যতে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে পারে, তাহা শাহজাহান কল্পনা করিতে পারেন নাই।

সেনাপতি শাহজাহান

শাহজাহানের অদূরদর্শিতা

শাসকরূপে শাহজাহান নূতন কোন রীতি বা প্রথা প্রবর্তন করেন নাই; আকবরের প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী ছিল তাঁহার শাসনের ভিত্তি। তাঁহার বিলাসব্যসন, আড়ম্বর ও সৌধ নির্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল প্রচুর। সুতরাং তিনি রাজস্বহার উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধাংশে বর্ধিত করেন। ফলে এক বৎসরের মধ্যে চার কোটী তঙ্কা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইল। খালসা ভূমির (বাদশাহের খাস জমি) শতকরা দশ ভাগের সাত ভাগ তিনি নগদ রাজস্বের বিনিময়ে বণ্টন করিয়া দিলেন। শাহজাহান নজর ও উপহারের মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। পূর্বে মাত্র কর্ষিত জমির উপর রাজস্ব ধার্য হইত, শাহজাহান কর্ষিত ও অকর্ষিত সমস্ত ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য করেন। এইরূপে প্রজার কর-ভার নানাভাবে বর্ধিত হইল। শাহজাহান নগদ অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের একচ্ছত্র অধিকার বণ্টন করিতেন এবং বাণিজ্যশুল্ক, বন্দর-কর নানাভাবে বৃদ্ধি করিতেন। শাহজাহানের রাজত্বে প্রজার শান্তি ছিল, সুখ ছিল না।

শাহজাহানের রাজস্ব সংগ্রহ নীতি

বিচারক্ষেত্রে শাহজাহান পিতৃপিতামহের আদর্শ অনুসরণ করিতেন। প্রতিদিন প্রভাতে ঝারোখা ই-দর্শনের সময় ব্যক্তিগত ভাবে প্রজার অভিযোগ শ্রবণ করিতেন, বুধবার ও শুক্রবার ভিন্ন দ্বিপ্রহরের নমাজের পর দারোগা-ই-

আদালত্ নামক কর্মচারী বাদশাহের সম্মুখে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন। বাদশাহ স্বয়ং "ফিরুজ তকৃত" নামক বিচারাসনে উপবেশন করিতেন, পার্শ্বে মুনসিফ (বিচারক) এবং মুফতি (আইন-ব্যাখ্যাতা) নামক সহকারী উপবেশন করিতেন। বাদশাহ স্বয়ং অভিযোগকারী ও অভিযুক্তদের সঙ্গে আলোচনা করিতেন এবং মুসলিম আইন অনুসারে বিচার করিতেন। শাহজাহান নির্মম অথচ ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন।

বিচারক শাহজাহান

প্রতি বৎসর শাহজাহান মক্কা তীর্থে শরীফ (প্রধান ধর্মযাজক), ফকির, দরবেশ এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য অর্থ প্রেরণ করিতেন। ঐতিহাসিক ওয়ারিস বলিয়াছেন, শাহজাহান মোট দশলক্ষ মুদ্রা মক্কার পুণ্যক্ষেত্রে দান করিয়াছেন।

দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে শাহজাহান ছিলেন রাজাধিরাজ। তিনি ছিলেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আচরণে ভদ্র, আলাপে মিষ্টভাষী, আলোচনায় মার্জিতরুচি। আকবর বা জাহাঙ্গীরের মত শাহজাহান ধৈর্যচ্যুত হইতেন না, ক্রুদ্ধ হইলেও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। দরবারের সূক্ষ্মতম রীতিনীতি তিনিও কখন লঙ্ঘন করেন নাই, অপরকেও করিতে দেন নাই। শাহজাহানের দরবার ছিল মর্তে অমরাবতী—যেমন ঐশ্বর্য, তেমন আড়ম্বর, তেমনি গুরুগম্ভীর। বহু ইওরোপীয় পর্যটক ভারতে আগমন করিয়া মুঘল দরবারের কল্পনাতীত ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্য দর্শনে বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়া যাইতেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে রাজদরবারে প্রবেশ কিম্বা রাজদর্শন দুর্লভ ছিল, সুতরাং বাদশাহ এবং দরবারকে কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার জনশ্রুতি প্রচারিত হইত ; রাজ্যে কোন সংবাদপত্র ছিল না—সুতরাং লোকমুখে প্রচারিত জনশ্রুতি ছিল সংবাদ প্রচারের বাহন। এইজন্যই শাহজাহানের অসুস্থতার সময় সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য জনশ্রুতির প্রবাহে বিভ্রান্ত হইয়াছিল।

মার্জিতরুচি শাহজাহান

স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য শাহজাহানেরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। শাহজাহান প্রত্যক্ষ ভাবে দারার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করিতেন ; তিনি রাজকার্যভার ও পাঞ্জা (সীলমোহর) প্রিয় কন্যা জাহানারার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে ফল শুভ হয় নাই। রোগাক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি যখন আংশিক সুস্থ হইয়াছিলেন, তখন যদি স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজদর্শন দিতেন তাহা হইলে জনশ্রুতি অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি দারার পক্ষ সমর্থন না করিয়া দিল্লীর সম্রাটরূপে যুদ্ধ করিলে দরবার দ্বিধাবিভক্ত হইত না। বৃদ্ধ বয়সে শাহজাহানের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। শাহজাহানকে কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে মৃত খসরু, শাহরইয়র এবং দারবক্সের ছায়া সতত আতঙ্কিত ও বিভীষিকাগ্রস্ত করিত।

শাহজাহানের ভুল-ত্রুটি

অনুশীলনী

১। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা কর।
(Describe the chief events of Jahangir's reign.)

২। পুত্ররূপে, পিতারূপে, শাসকরূপে, স্বামী-রূপে এবং মানুষরূপে জাহাঙ্গীরের চরিত্র বর্ণনা কর
(Describe Jahangir as a son, as a father, as an administrator, as a husband, and as a man.)

৩। মুঘল সাম্রাজ্যে নূরজাহান ছিলেন এক দিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ।
—আলোচনা কর।
('Nurjahan was not an unmixed blessings for the Mughal empire'
—Expand.

৪। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ: (ক) সলিমের বিদ্রোহ, (খ) নুরজাহান চক্র, (গ) মীর্জা ঘিয়াস, (ঘ) মহবৎখানের বিদ্রোহ, (ঙ) জাহাঙ্গীরের ধর্মমত, (চ) আবুল ফজলের হত্যা, (ছ) খসরু, (জ) মানসিংহ।
(Write short notes on : (a) Rebellion of Salim. (b) Nur Jahan's click, (c) Mirza Ghias. (d) Rebellion of Mahabat Khan. (e) Religion of Jahangir, (f) Murder of Abul Fazl, (g) Khusrav, (h) Man Singha.)

৫। শাহজাহানের প্রাক্ বাদশাহী জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা কর।
(Give an account of Shah Jahan before he came to the throne.).

৬। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্ণনা কর।
(Describe the chief events of Shah Jahan's reign.)

৭। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বের চিত্র বর্ণনা কর এবং উহাতে তাঁহার দায়িত্ব নিরূপণ কর।
(Give a pen-picture of the civil war amongst the sons of Shah Jahan. How far was Shah Jahan responsible for that ?)

৮। পুত্ররূপে শাহজাহান, পিতারূপে শাহজাহান, স্বামী রূপে শাহজাহান এবং সম্রাটরূপে শাহজাহানের চরিত্র বর্ণনা কর।
(Describe Shah Jahan as a son, as a father, as a husband and as an emperor)

৯। শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্বের দুইটি বিভিন্ন ধারা আলোচনা কর।
(Shah Jahan's reign was a two-sided medal—Discuss.)

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) আসফখান, (খ) বুন্দেলা বিদ্রোহ, (গ) পর্তুগীজ দমন, (ঘ) শাহজাহানের ধর্মজীবন, (ঙ) শাহজাহানের কারা-জীবন, (চ) শাহজাহানের সীমান্ত নীতি।
(Write short notes on : (a) Ashaf Khan, (b) Rebellion of Bundellas, (c) Suppression of the Portuguese (d) Religious life of Shah Jahan, (e) Imprisonment of Shah Jahan, (f) Frontier Policy of Shah Jahan.)

—

দশম অধ্যায়

ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেব

অধ্যায় পরিচয়ঃ আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁহার রাজত্বকালে গৌরবোজ্জ্বল মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে এবং উহার পতনেরও সূত্রপাত হয়। ঘটনা-বহুলতা, কর্মব্যস্ততা এবং ধর্মদ্বেষিতা তাঁহার রাজত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম চব্বিশ বৎসর উত্তর ভারত ছিল তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র। সিংহাসন লাভ, বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর সহিত সংঘর্ষ প্রভৃতিই তাঁহার রাজত্বের প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় পর্বে তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল দাক্ষিণাত্য। এই ছাব্বিশ বৎসরের প্রধান ঘটনা মারাঠা জাতির সহিত যুদ্ধ এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়। মুঘল রাজত্বের সর্বাধিক বিস্তার ও ধ্বংসবীজ বপন যুগপৎ আওরঙ্গজেবের কীর্তি ও অপকীর্তি।

রাজ্যাভিষেকঃ আগ্রা অধিকার ও পিতা শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করার পর দিল্লীর উপকণ্ঠে শালিমার উদ্যানে বিনা আড়ম্বরে আওরঙ্গজেবের প্রথম রাজ্যাভিষেক হয় (২১শে জুলাই, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। তিনি 'আলমগীর' (বিশ্বজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পর বৎসর খাজুয়ার যুদ্ধে শুজা এবং দেওরাই-এর যুদ্ধে দারার পরাজয়ের পর দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাসে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় বার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল (৫ই জুন, ১৬৫৯ খ্রীঃ)। শাহজাহানের মৃত্যুর পর তৃতীয় বার আওরঙ্গজেব মহাসমারোহের সহিত আগ্রার দুর্গে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন (মার্চ, ১৬৬৬ খ্রীঃ)।

আওরঙ্গজেব—প্রাচীন চিত্র

রাজ্যবিস্তারঃ পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটগণের ন্যায় আওরঙ্গজেবও সিংহাসনে আরোহণের পর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগে আসাম-রাজ মুঘল শাসনাধীন গৌহাটি অধিকার করেন। কোচগণও মুঘল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের

বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুমলা বাঙ্গলার শাসনকর্তারূপে বিশাল স্থল ও নৌ-বাহিনীসহ আসাম আক্রমণ করেন (১৬৬২ খ্রীঃ)। আহোম-রাজ জয়ধ্বজ সিংহ ক্ষতিপূরণ এবং বার্ষিক করদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। আওরঙ্গজেব আসামের পথে চীন অভিযানের পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ষার প্রকোপে, যুদ্ধের শ্রমে, মড়কে এবং আহোম সৈন্যদের বিষমিশ্রিত তীরের আঘাতে মুঘলবাহিনী ধ্বংসপ্রায় হইল। আসাম হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে সেনাপতি মীরজুমলাও আমাশয় রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই কামরূপ আওরঙ্গজেবের হস্তচ্যুত হয়।

মীরজুমলা ও আসাম

সাময়িক সাফল্য : মীরজুমলার মৃত্যু

মীবজুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খান বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদিগের অত্যাচার হইতে দক্ষিণ বঙ্গকে রক্ষা করেন এবং আরাকান রাজ্যের নৌশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। শায়েস্তা খান বাঙ্গলার নৌশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ আঠাশ বৎসরব্যাপী শাসন বাঙ্গলার এক স্মরণীয় যুগ। তাঁহার শাসনে বাঙ্গলা দেশ শান্তি ও সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, তাঁহার সময়ে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত।

শায়েস্তা খান বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত

শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর (১৬৯৪ খ্রীঃ) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌শান বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার দিওয়ান মুর্শিদ কুলি খান ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে প্রাদেশিক রাজস্ব-বিভাগ স্থানান্তরিত করেন। ফলে বাঙ্গলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। মুর্শিদকুলি খানের নামানুসারে এই স্থানের নাম হইল **মুর্শিদাবাদ**।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি : আওরঙ্গজেবের শাসনকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেব আফ্রিদি, ইউসুফজাই প্রভৃতি দুর্দান্ত আফঘান উপজাতি প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া মুঘল বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত কবিত। তাহাদেব উপদ্রবে কচ্ছ, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল। আওবঙ্গজেব যুদ্ধ করিয়া বা উৎকোচ দানেও তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। পরে ভেদনীতির প্রভাবে বিদ্রোহী নায়কগণের মধ্যে বিবোধের সৃষ্টি করিয়া সম্রাট স্বীয় প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধবিগ্রহেব জন্য আওরঙ্গজেব রাজপুত-বিদ্রোহ দমন এবং শিবাজীর বিরুদ্ধে নিজে ইচ্ছামত সৈন্যনিয়োগ করিতে পারেন নাই।

আফঘান উপজাতি শাখার বিদ্রোহ

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা দাউদ খান ছোটনাগপুরের

অন্তর্গত পালামৌ জয় করিলেন। ইহার চার বৎসর পরে তিব্বত আওরঙ্গজেবের প্রাধান্য স্বীকার করে। বিকানীরের রায়করণ ও বুন্দেলখণ্ডের চম্পৎ রায়ের বিদ্রোহ নির্মম হস্তে দমন করা হইল।

মেবার ও মাড়বারের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নীতির বিফলতা

এই যুদ্ধের সময়ে রাজসিংহের মৃত্যু হইলেও মেবার যুদ্ধ বন্ধ করে নাই। মেবার দমন করিতে না পারিয়া আওরঙ্গজেব রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। জিজিয়া করের পরিবর্তে রাণা সম্রাটকে স্বীয় রাজ্যের তিনটি বিভাগ প্রদান করিলেন, কিন্তু দুর্গাদাসের নেতৃত্বে মাড়বারের সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র . বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে (১৭১০খ্রীঃ) এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় এবং রাজসিংহের পুত্র অজিতসিংহ পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

রাজপুত নীতির ফল

রাজপুতের সহিত সুদীর্ঘ সংগ্রাম মুঘল সাম্রাজ্যকে সর্বনাশের পথে লইয়া গেল। এই সংগ্রামে আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের গৌরব কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই; বরং দিল্লী সাম্রাজ্য রাজপুত জাতির অকুণ্ঠ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। এই যুদ্ধে প্রভূত অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় হইল এবং শাসন-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল।

মারাঠা-মুঘল সংগ্রাম: আওরঙ্গজেবের রাজ্যলাভের পূর্বেই মারাঠা জাতির নেতা শিবাজী দাক্ষিণাত্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খানকে প্রেরণ করিলেন (১৬৬০ খ্রীঃ)। শায়েস্তা খান পুণা অধিকার করিয়া কল্যাণ অঞ্চল হইতে মারাঠাগণকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু শিবাজী একদা নৈশ আক্রমণ করিয়া পুণা পুনরুদ্ধার করেন এবং শায়েস্তা খান বিতাড়িত হন।

শিবাজী-আওরঙ্গজেব সংঘর্ষ

নবোৎসাহে শিবাজী সুরাট বন্দর ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করেন। হতাশ হইয়া আওরঙ্গজেব অম্বর-রাজ জয়সিংহ এবং বিখ্যাত সেনাপতি দিলওয়ার খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এইবার শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পুরন্দরের সন্ধির (১৬৬৫ খ্রীঃ) শর্তানুসারে তিনি বারটি দুর্গ রাখিয়া অবশিষ্ট দুর্গগুলি সম্রাটের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। জয়সিংহের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া শিবাজী পুত্রসহ আগ্রায় মুঘল দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে নজরবন্দী করা হয়। কথিত আছে যে, চতুর শিবাজী পিতৃশ্রাদ্ধের উৎসবের সুযোগে মিষ্টান্নের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন এবং নিজ রাজ্যে উপস্থিত হন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলগণের সহিত পুনরায় শিবাজীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শিবাজী হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় বার সুরাট লুণ্ঠন করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী

ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করিয়া রায়গড়ে অভিষিক্ত হইলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তি এই বীর মারাঠাকে দমন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পরেও (১৬৮০ খ্রীঃ) মারাঠা-মুঘল সংঘর্ষের নিবৃত্তি হয় নাই। শিবাজীর পুত্র মারাঠা-রাজ শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে কয়েক বৎসর যুদ্ধ করেন; কিন্তু তিনি মুঘল সৈন্যের হস্তে ধৃত হইয়া নৃশংস ভাবে নিহত হইলেন। তাঁহার শিশুপুত্র শাহু বন্দী হইয়া আওরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম মুঘলদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার বীরপত্নী তারাবাঈ স্বীয় নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীর অভিভাবিকা-রূপে যোগ্যতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মারাঠাগণ ক্রমশ মালব, বেরার, গুজরাট প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিল। আওরঙ্গজেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মারাঠাগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া মারাঠা শক্তি দমন করিতে সমর্থ হন নাই।

শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সহিত আওরঙ্গজেবের সংঘর্ষ

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে উপস্থিতির সুযোগে জাঠগণ দ্বিতীয় বার বিদ্রোহী হইল। জাঠগণ গোকুলের নির্মম মৃত্যু ও জাঠনারীগণের অপমান বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি লুণ্ঠন করিল (১৬০৮ খ্রীঃ)। আওরঙ্গজেব উত্তর-ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাঠদের প্রধান দুর্গ ধ্বংস করিলেন। কিন্তু জাঠগণ সুযোগ পাইলেই মুঘলদের অনিষ্ট করিত। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর চূড়ামনের নেতৃত্বে তাহারা পুনরায় বিদ্রোহী হইল। সর্বশেষে সর্দার সুরজমলের নেতৃত্বে তাহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল।

জাঠ বিদ্রোহ (১৬৬৮৮ খ্রীঃ)

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি : উদীয়মান মারাঠা শক্তি দমন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া মতাবলম্বী সুলতানগণের ধ্বংস সাধনই ছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি।

দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তারূপে অবস্থানের সময় তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা শাহজাহানের বাধা দানের ফলে তিনি সেই জয় সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অর্ধ-সম্পন্ন কার্য সফল করার জন্য তিনি জীবনের অবশিষ্ট ছাব্বিশ বৎসর (১৬৮১-১৭০৭ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। বাহিরে মারাঠা শক্তির উত্থান এবং ভিতরে কুশাসন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বিজাপুর-গোলকুণ্ডার পতন তখন আসন্ন। মুঘলবাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। শিয়া রাজ্য বিজাপুর ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং গোলকুণ্ডা ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল অধিকারভুক্ত হইল। এই দুই রাজ্যের পতনের পর ভূতপূর্ব পরাক্রান্ত বাহমনি রাজ্যের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। অনতিকাল পরেই তাঞ্জোর ও

ত্রিচিনোপল্লী পর্যন্ত ভূভাগে মুঘল অধিকার বিস্তৃত হয় (১৬৯১-১৬৯৭ খ্রীঃ)। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতির ফলে আকবরের ভারত-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল।

১ হইতে ১৫ পর্যন্ত চিহ্নিত স্থানগুলি আকবরের সুবা

কিন্তু এই সাফল্য ছিল প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংস করা আওরঙ্গজেবের জীবনের অদূরদর্শিতার অন্যতম পরিচায়ক। এই
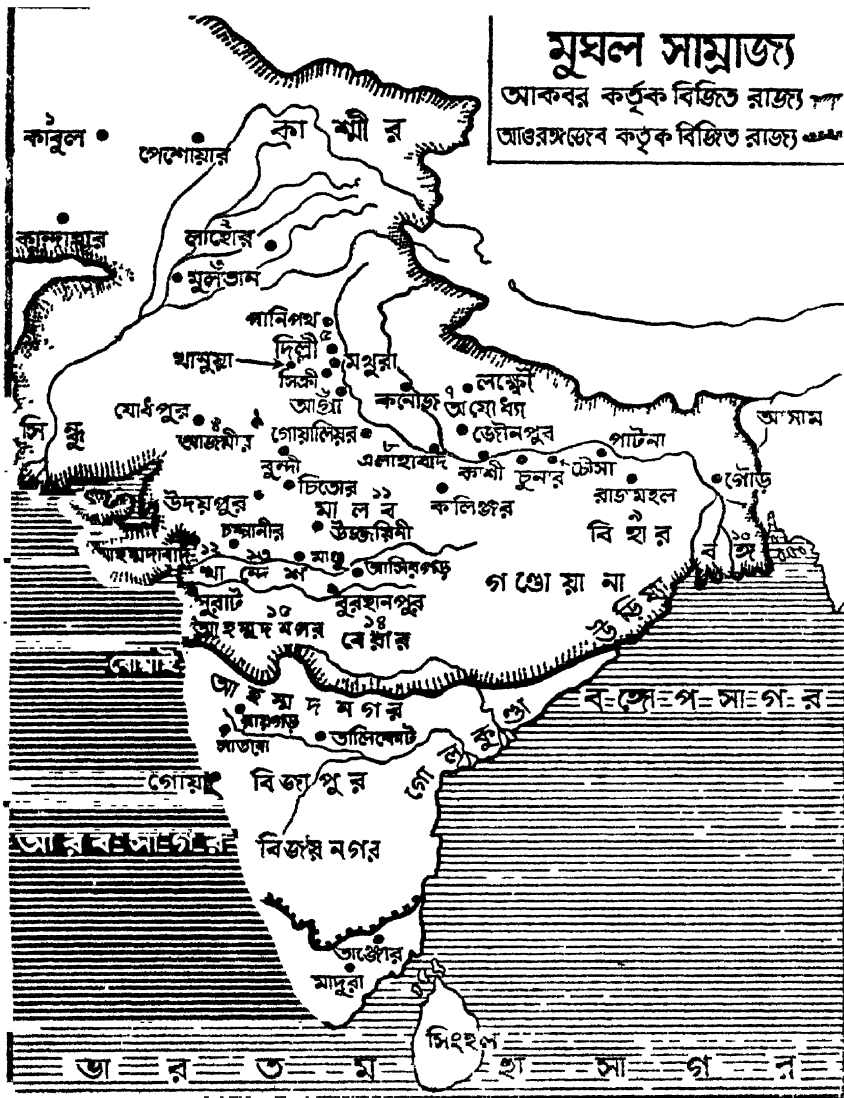
মুসলিম রাষ্ট্রদ্বয় ধ্বংসের ফলে দাক্ষিণাত্যে উদীয়মান মারাঠা শক্তির আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। হয়ত এই দুই রাজশক্তির সহায়তায় দিল্লীর সম্রাট মারাঠাদিগকে দমন করিতে পারিতেন। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতির ফলে আর্যাবর্তের রাজকর্মচারিদিগের উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব শিথিল হওয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইল। আওরঙ্গজেবের অনুপস্থিতির সুযোগে জাঠগণ দুইবার আগ্রা লুণ্ঠন করে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বহু সৈন্যনাশ ও অর্থব্যয়ে দিল্লীর রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়িল। মারাঠা দমনের ব্যর্থতায় ও নৈরাশ্যে আওরঙ্গজেবের দেহ ও মন দুইই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার ধর্মনৈতিক অনুদারতার ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আকবর প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। অন্য পুত্রদিগের উপরও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এমন কি নিজের ছায়া দর্শনেও তিনি আতঙ্কিত হইতেন। সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং সিংহাসনের জন্য তাঁহার পুত্রদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ কল্পনা করিয়া সম্রাট শিহরিয়া উঠিতেন। তিনি প্রিয় পুত্র কামবক্সের নিকট জীবনের বিফলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেন এবং সাম্রাজ্য বিভাগ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু প্রস্তাব কার্যকরী করার পূর্বেই ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নব্বই বৎসর বয়সে আহম্মদনগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। সুতরাং এই দাক্ষিণাত্য কেবল তাঁহার দেহেরই সমাধিক্ষেত্র নয়, কীর্তিরও সমাধিক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যের দুষ্ট ক্ষতই তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য নীতির ফল

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু

বাদশাহের ধর্মবিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশময় অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রাজপুতানা, মালব, বুন্দেলখণ্ড ও খান্দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দুর অসন্তোষ প্রকাশ পাইল। অনেক স্থলে মোল্লাদের শ্মশ্রু উৎপাটন করা হইল, জিজিয়া কর আদায়কারী কর্মচারী প্রহৃত হইল। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলের নেতৃত্বে জাঠগণ মথুরা অঞ্চলে বিদ্রোহ করে। বহু সৈন্যক্ষয় করিয়াও আওরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেব লক্ষাধিক সৈন্য প্রেরণ করিয়া গোকুলকে সপরিবারে বন্দী করেন। গোকুলকে প্রকাশ্য রাজসভায় প্রতি অঙ্গ ছেদন করিয়া হত্যা করা হইল এবং তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইল। বুন্দেলখণ্ডের রাজা চম্পৎরায় বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। চম্পৎরায়ের পুত্র ছত্রশাল বিদ্রোহী হইয়া দুই বার মুঘল সৈন্য পরাজিত করেন এবং আওরঙ্গজেবের সময়েই একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাতিয়ালার পার্শ্ববর্তী সৎনামী সম্প্রদায়ের অনুন্নত নিরীহ

আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির ফল

কৃষকগণও আওরঙ্গজেবের অনুদার নীতির ফলে বিদ্রোহী হইল। গুরুর শুভনাম-কীর্তনই ছিল তাঁহাদের ধর্মাচরণের মূলবস্তু। যুদ্ধবিদ্যায় তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না; সুতরাং নেতৃত্বের অভাবে তাহারা মুঘলবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয় এবং বহু সৎনামী হিন্দুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

আওরঙ্গজেবের আচরণে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি এবং অসন্তোষ প্রকটিত হইয়া উঠিল। নবম শিখগুরু তেগবাহাদুরকে আওরঙ্গজেবের ধর্ম-নীতির বিরোধিতার অপরাধে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। বাদশাহের আদেশ হইল—ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু; তেগবাহাদুর মৃত্যু বরণ করেন (১৬৭৫ খ্রী:)। গুরুর এই আত্মত্যাগে শিখদিগের মধ্যে এক অভিনব শক্তিপ্রেরণা সঞ্চারিত হইল এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহারা সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ করিতে লাগিল।

রাজপুত বিদ্রোহ: আকবরের দূরদর্শিতা, উদারতা ও ধর্মনীতির ফলে যে রাজপুতগণ মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিস্তম্ভ হইয়াছিল, আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং অনুদার ধর্মনীতির ফলে তাঁহারাও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এই সময়ে মাড়বার-রাজ যশোবন্ত সিংহ মুঘল সম্রাট শাহজাহানের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দারা শিকোর পক্ষ সমর্থন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আফঘান সীমান্তে জামরুদ নামক স্থানে অকস্মাৎ তাঁহার সন্দেহজনক ভাবে মৃত্যু হয়। যশোবন্তের রাণী মহামায়া শিশুপুত্র অজিত-সিংহকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশের পথে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে হস্তগত করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইবার এবং মাড়বার রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার সংকল্প করেন। রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস সম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া কৌশলে রাণীমাতা মহামায়া এবং অজিতসিংহকে লইয়া যোধপুরে পলায়ন করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া আওরঙ্গজেব স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং মাড়বার রাজ্যের অন্তর্গত যোধপুর ও অন্যান্য নগর অধিকাব করেন। তিনি বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন এবং ধ্বংসা-বশেষের উপর মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ঘোর সংকটের সময় অজিত-সিংহের মাতা তাঁহার আত্মীয় মেবাররাজ রাজসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করায় রাজসিংহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অজিতসিংহের পক্ষ সমর্থন করিয়া মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মুঘল বাহিনী মেবারের সমতল প্রদেশ অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়া শ্মশানভূমিতে

আওরঙ্গজেবের রাজপুত-নীতির অদূরদর্শিতা

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু: আওরঙ্গজেব কর্তৃক মাড়বার দখল

রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস

পরিণত করিল। বীরশ্রেষ্ঠ রাজসিংহ দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন এবং রাজপুতগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া দিল্লীর সৈন্যগণকে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

রাণা রাজসিংহ

সম্রাটের চতুর্থ পুত্র মুহম্মদ আকবর রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে অভিযানগুলি পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজপুত সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার রসদ লুণ্ঠিত হইলে তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যর্থতায় অসন্তুষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব অপর পুত্র আজমকে মেবার বিজয়ের ভার অর্পণ করেন। পিতার ব্যবহারে অপমানিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া রাজপুতগণের সহায়তায় সিংহাসনের লোভে মুহম্মদ আকবর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৬৮১ খ্রীঃ)। কিন্তু অবিলম্বে সম্রাট এক কূট জালপত্র রচনা করিলেন। পত্রের মর্মার্থ ছিল, "মুহম্মদ আকবর, তুমি রাজপুতদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছ যে, তুমি পিতার বিদ্রোহী, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই তুমি রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।" পত্রখানি কৌশলে রাজপুত শিবিরে প্রেরণ করা হইল। রাজপুতগণ পত্র পাঠ করিয়া বিভ্রান্ত হইল এবং আকবরের পক্ষ ত্যাগ করিল। নিরুপায় হইয়া মুহম্মদ আকবর রাঠোর বীর দুর্গাদাসের সহায়তায় দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিয়া মারাঠা-রাজ শম্ভুজীর (শিবাজীর পুত্র) আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব স্বীয় কন্যা জেবউন্নিসা বেগমকে মুহম্মদ আকবরের সাহায্যকারিণী সন্দেহে সলিমগড় দুর্গে কারারুদ্ধ করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জেবউন্নিসা কারারুদ্ধ ছিলেন। পিতাব ভয়ে আকবর পারস্যে পলায়ন করেন এবং সেই-খানেই ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

শাহজাদা মুহম্মদ আকবরের বিদ্রোহ

আওরঙ্গজেবের কূটকৌশল

আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতিঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান এবং পরধর্মদ্বেষী। সুতরাং শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, সুফী মতাবলম্বী মুসলমান এবং হিন্দুগণকে তিনি বিধর্মী (কাফের) বিবেচনা করিতেন। তাঁহার তরবারির নাম ছিল "রাফিজ কুশ" অর্থাৎ বিধর্মী হন্তা। বিধর্মী অপরাধে তিনি দারাকে এবং সুফী সাধু সরমদকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, ভারতীয় রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র; এ রাষ্ট্র ইসলামের অনুশাসনে শাসিত হইবে, ইসলামের ধর্মরাজ্যে বিধর্মীদের সম্মানজনক স্থান নাই। সমগ্র ভারতবর্ষকে সুন্নী মুসলমানের দেশে পরিণত করাই ছিল তাঁহার রাজ্যশাসনের প্রধান লক্ষ্য! আওরঙ্গজেব সর্বাগ্রে মুসলমান, পরে ভারত সম্রাট—ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। সম্রাটের এই অনুদারতায় কর্মচারিগণ তাঁহার নির্দেশে হিন্দু প্রজার উপর নানারূপ নির্যাতন করিয়া ইসলাম

ধর্ম বিষয়ে আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণ ও অসহিষ্ণু নীতি

ধর্মপ্রচারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত ও হিন্দু কর্মচারিগণ পদচ্যুত হইল এবং কাশী, মথুরা, গুজরাট প্রভৃতি তীর্থস্থানের পবিত্র মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইল। তিনি হিন্দুর মেলা, শোভাযাত্রা, ধর্মোৎসব প্রভৃতি বন্ধ করেন ও তীর্থযাত্রীকে করভারে নিপীড়িত করেন। রাজপুত ব্যতীত কোন হিন্দুর পক্ষে হস্তী, অশ্ব বা পালকী ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল। হিন্দু বণিকদিগের উপর দ্বিগুণ কর স্থাপন করা হইল; রাজস্ব ও হিসাব বিভাগেও হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হইল। অবশ্য পর বৎসরই এ নিষেধ পরিবর্তন করা হয়। তিনি মুদ্রার পৃষ্ঠে আল্লার নামাঙ্কন নিষিদ্ধ করেন, কারণ অপবিত্র হিন্দুগণ পবিত্র আল্লার নাম স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিবে। প্রকাশ্যে ধর্ম আচরণ করা হিন্দুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য হিন্দুদিগকে পুরস্কার ও উচ্চ রাজসম্মানের প্রলোভন প্রদর্শিত হইতে লাগিল। রাজপুতদের মধ্যে ছত্রশালের এক পুত্র, জাঠবীর গোকুলের পুত্র, গোপালসিং চন্দাবতের পুত্র এবং কুচবিহারের রাজা শিবনারায়ণের পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। শাহজীর কন্যা, মনোহরপুরের রাজা অমর সিংহের কন্যা, আসামের রাজকন্যা এবং জাঠরাজ গোকুলের কন্যাকে মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইল। সংকীর্ণ অনুদার নীতির ফলে হিন্দু সম্প্রদায় ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হিন্দুগণ সাধারণত প্রতিবাদ করে না কিন্তু একবার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলে হিন্দুগণ আমরণ প্রতিবাদ করে।

জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত ঃ হিন্দুদের কর্মচ্যুতি

আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র অন্যান্য মুঘল সম্রাটের মত উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। তিনি ভারতের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মুসলমান নরপতি। তাঁহার চরিত্রে বহু রাজোচিত গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। ইসলাম ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মের অনুশাসনগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। বল্‌খের যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি নমাজ লঙ্ঘন করেন নাই। স্বধর্মানুরাগ ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালীর জন্য মুসলিমগণ তাঁহাকে জীবন্ত ধর্মগুরু (জীন্দাপীর) আখ্যা দিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা কখনও চারের বেশী ছিল না। তিনি মদ্যপান করিতেন না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিতেন না। যুদ্ধে সাহস, রাজকর্মে শ্রমশীলতা, দৈনন্দিন জীবনে আড়ম্বরশূন্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ছিল তাঁহার চরিত্রের অলংকার। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, উদ্যম, অনমনীয় একমুখী কর্তব্যনিষ্ঠা ও গভীর কূটনীতিজ্ঞান ছিল। তিনি আরবী, ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর মুক্তাবিন্দুর মত সুন্দর ছিল। কোন গ্রন্থ রচনা না

চরিত্রের গুণাবলী

করিলেও তাঁহার লিখিত পত্রাবলী তাঁহার গভীর সাহিত্যবোধ ও মুসলিম শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় "ফতোয়া ই-আলমগীরী" নামক আইন-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিনি মুসলমান সমাজের কদর্যতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশে মুসলিম পীরের সমাধি-পূজা, জন্মোৎসব বা তিরোধান দিবস পালন-উৎসব নিষিদ্ধ হয়; মুসলিম নারীর পক্ষে দেহনিবদ্ধ পরিচ্ছদ ব্যবহার ও অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ হয়; দরবারে সংগীত, চিত্র, আলেখ্য দর্শন, তুলাদান, মীনাবাজার, নওরোজ ইত্যাদি উৎসব নিষিদ্ধ হইল—কারণ ঐগুলি কোরাণসম্মত অনুষ্ঠান নহে।

পিতার কারাদণ্ড, পুত্রহত্যা, রাজনীতিতে শঠতা প্রভৃতি অপকর্ম তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছে; কিন্তু তিনি ভ্রাতৃহত্যা না করিলে ভ্রাতারাই তাঁহাকে হত্যা করিত। মুঘলযুগে ভ্রাতৃহত্যা সিংহাসন আরোহণের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান পিতৃদ্রোহী ও ভ্রাতৃহন্তা ছিলেন। আওরঙ্গজেব তৎকালীন ঘটনাস্রোতেই এই নির্মমতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। কার্য সিদ্ধির জন্য আওরঙ্গজেব মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও শঠতার আশ্রয় অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিতেন। এই নীতি সাময়িক সফলতা আনয়ন করিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিফলতার কারণ হইয়াছিল। পিতা শাহজাহানের প্রতি তাঁহার ব্যবহার কোন যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না। দারার ছিন্নমুণ্ড কারাগারে পিতার নিকট প্রেরণ, মুরাদকে মদ্যপানে অচেতন করিয়া বন্দী করা এবং মিথ্যা অপবাদে প্রাণদণ্ড দান, সুলেমান শিকোকে কোরাণ হস্তে প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিষপান করাইয়া হত্যা রাজনীতি হইলেও মানবতার নীতিবিরুদ্ধ।

চরিত্রের দোষাবলী

পরধর্মে অসহিষ্ণুতা ছিল আওরঙ্গজেবের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আওরঙ্গজেব ভগবানকে ভয় করিতেন—ভালবাসিতেন না। সুতরাং মানুষও আওরঙ্গজেবকে ভয় করিত, ভালবাসিত না। আওরঙ্গজেবের পৃথিবী কোরাণের পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোরাণ ভিন্ন যে অন্য কোন সত্য থাকিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। মহিষী জৈনাবাদীর মৃত্যু ভিন্ন আওরঙ্গজেব জীবনে কখনও একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করেন নাই। হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহার ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদকে যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া পরে হত্যা করিয়াছিলেন। পুত্র মুহম্মদ আকবর পিতার ভয়ে পারস্যে পলায়ন করিয়া সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। অপর পুত্রগণকেও পিতার নজরবন্দিরূপে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইয়াছিল। এমন কি কন্যা জেবউন্নিসাকে তিনি কারারুদ্ধ করেন। মুঘল রাজ-পরিবারে রাজকুমারীর কারাবাস এই প্রথম ও শেষ।

অন্যকে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই আওরঙ্গজেবও জীবনে কাহারও বিশ্বাস অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। সম্রাটের একার পক্ষে বিশাল

সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব বলিয়া সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজ্যের প্রতিকার্যে শিথিলতা, অসাধুতা ও উৎকোচ গ্রহণ অলিখিত নিয়মে পরিণত হইয়াছিল। কঠোর শাসন দ্বারাও সম্রাট এই দুর্নীতি দূর করিতে সমর্থ হন নাই। রাষ্ট্রনৈতিক অদূরদর্শিতা, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস, সংকীর্ণহৃদয়তা, সন্দিগ্ধপ্রকৃতি এবং পরধর্মদ্বেষিতার জন্য শাসকরূপে আওরঙ্গজেব বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। 'জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজার আনুগত্য ও সহানুভূতি ব্যতীত কোন সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না' —এই ঐতিহাসিক সত্যকে আওরঙ্গজেব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের মূল কথা ছিল, সর্বাগ্রে তিনি মুসলমান, তারপর হিন্দুস্থানের বাদশাহ। সাম্রাজ্যের স্থায়ী মঙ্গল ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যেখানেই বিরোধ, সেইখানেই তিনি ধর্মের জন্য সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুই যে তাঁহার একমাত্র শত্রু ছিল তাহা নহে ; শিয়া, মাহাদী, সুফী—কেহই তাঁহার বিষদৃষ্টি হইতে মুক্তি পায় নাই। তাঁহার "সংকীর্ণ নীতি ও পরধর্ম বিদ্বেষের ফলে সুদৃঢ় মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। পঞ্জাবে সৎনামী সম্প্রদায় এবং মথুরায় জাঠজাতি বিদ্রোহী হয় এবং বুন্দেলরাজ একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ রাজপুত জাতি বিদ্রোহী হয় এবং শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়। শিখজাতি ধর্ম ও আত্ম-রক্ষার জন্য এক যোদ্ধৃ-জাতিতে পরিণত হয়। ইহার ফলে মুঘল সাম্রাজ্য তাঁহার রাজত্বকালে চরমশীর্ষে আরোহণ কবিলেও তাঁহার জীবিত অবস্থায় উহার পতনের সূত্রপাত হয়।

ধর্মান্ধতা

অন্যান্য মুঘল সম্রাটগণের ন্যায় আওরঙ্গজেবের শিল্প ও স্থাপত্যানুরাগ ছিল না। তাঁহার রাজত্বে ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেব সুন্দরকে ভয় করিতেন। জীবনে আনন্দ, উৎসব, প্রীতি, মমতাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া তিনি পরিহাস করিতেন ; কোরাণবর্ণিত নির্দেশই তাঁহার জীবনের পথ নির্দেশ করিত। তিনি নানাকার্যে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিজেও শান্তিলাভ করেন নাই এবং অপরকে শান্তি দেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে জীবনের বিফলতা অনুভব করিয়া আল্লাহর নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। অনুতপ্ত মুসলমানরূপেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আওরঙ্গজেবের সৌন্দর্য-ভীতি

অনুশীলনা

১। সিংহাসনারোহণের পূর্ব পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা কর।

(Trace the career of Aurangjeb till his accession to the throne.)

২। ভ্রাতৃযুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ কর।

(What were the causes of the success of Aurangjeb in the civil war of 1657-58.)

৩। আওরঙ্গজেবের ধর্ম ও রাজনীতির মূল উৎস সন্ধান কর। আওরঙ্গজেবের জীবনের উপর ও সাম্রাজ্যের উপর উহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

(What were motives that guided Aurangjeb in his politics and religion? What were their effects on his life and empire?)

৪। "প্রথমে মুসলমান, পরে সম্রাট"—ইহাই ছিল আওরঙ্গজেবের মূল নীতি।—বিষয়টি বিস্তার কর।

("Aurangjeb was a Muslim first and a King next"—Expand)

৫। আওরঙ্গজেবের নীতি ছিল ভারতের জাতীয়তা বিরোধী, হিন্দু-বিদ্বেষ প্রসূত। আওরঙ্গজেব আকবরের জাতীয়তার স্বপ্ন বিফল করিয়া দিয়াছিলেন—আলোচনা কর।

(Aurangjeb's religious policy was anti-national and anti-Hindu. He reversed the national development of India which was the dream of Akbar—Discuss.)

৬। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল বর্ণনা কর।

(Write a detailed account of the Deccan Policy of Aurangjeb.)

৭। 'দাক্ষিণাত্য কেবল আওরঙ্গজেবের দেহেরই সমাধিক্ষেত্র নহে, কীর্তিরও সমাধিক্ষেত্র' —আলোচনা কর।

(The Deccan was not only the grave of the body of Aurangjeb but also the grave of his achievements—Comment.)

৮। মানুষরূপে এবং বাদশাহরূপে আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবের দায়িত্ব নিরূপণ কর।

(Give an estimate of Aurangjeb as a man and as an emperor. How far was he responsible for the fall of the Mughal Empire.)

৯। 'আওরঙ্গজেবের বিবিধ গুণ, তাঁহার [illegible] দোষের আকর হইয়াছিল'—আলোচনা কর।

('Aurangjeb died a victim to his own greatness'.—Comment.)

১০। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধ আলোচনা কর।

(Give an account of Aurangjeb's relation with the North-West Frontier.)

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) মীরজুমলা, (খ) দুর্গাদাস, (গ) শাহজাদা মুহম্মদ আকবর, (ঘ) জাঠ ও সৎনামী বিদ্রোহ।

(Write short notes on: (a) Mirjumla, (b) Durgadas, (c) Prince Muhammad Akbar, (d) Jath & Satnami rebellion.)

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়

মহারাষ্ট্র দেশ ও মারাঠা জাতি : পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বর্তমান অন্ধ্রদেশের অন্তর্বর্তী সুবিস্তীর্ণ পর্বতময় বিরাট ভূখণ্ডই মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। এই প্রদেশ অত্যন্ত পর্বতসঙ্কুল ; ইহা পশ্চিমঘাট, সাতপুরা এবং বিন্ধ্যপর্বতমালার নানা শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিভক্ত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্ব দিকস্থ ভূমিই মারাঠা জাতির আদি বাসভূমি। এই ভূমি চিরদিনই বীরপ্রসূ। মহারাষ্ট্রের জলবায়ু, পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি এবং উৎপন্ন শস্যের স্বল্পতা অধিবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীল, সাহসী, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী করিয়া তুলিয়াছিল। আরব সাগরের সান্নিধ্য মারাঠা জাতিকে সমুদ্রমুখী করিয়াছিল। মারাঠা জাতি ছিল দুর্ধর্ষ সৈনিক, সুদক্ষ নাবিক ও নৌ-যোদ্ধা।

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন-ইতিহাস : এই দেশ ছিল প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। আলাউদ্দীন ও মুহম্মদ তুঘলকের সময়ে এই অঞ্চল মুসলমান রাজ্য ছিল। বাহমনি রাজ্যের পতনের পর মহারাষ্ট্রে আহম্মদনগর ও বিজাপুর সুলতানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের রাজত্বকালে বহু মারাঠা সর্দার জায়গির লাভ করিয়া রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েক জন মারাঠা সাধু এবং ধর্মপ্রচারক ভক্তি, ধর্ম ও সাম্যের বাণী প্রচার করিয়া মহারাষ্ট্রে এক নূতন জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টি করেন। শিবাজীর গুরু রামদাস ছিলেন দেশপ্রেমিক ও সমাজ-সংস্কারক ; তিনি মারাঠা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুর জাতীয় ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

ছত্রপতি শিবাজী : দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর অভ্যুদয় একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের গিরিদুর্গে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ) শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শাহজী প্রথমে আহম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। পুণা জেলায় তাঁহার বিস্তৃত জায়গির ছিল। বাদশাহ শাহজাহানের আক্রমণে আহম্মদনগরের পতনের পর শাহজী বিজাপুরের আদিলশাহী দরবারে কর্মগ্রহণ করেন এবং কর্ণাটক প্রদেশে নূতন জায়গির লাভ করেন। শিবাজীর বাল্যজীবন পুণায় তাঁহার মাতা **জিজাবাঈ**-এর (দেবগিরির যাদববংশীয়া) সাহচর্যে ও **দাদাজী কোণ্ডদেব** নামক এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বে অতিবাহিত হইয়াছিল। মাতার শিক্ষা ও সাহচর্যের গুণে তাঁহার

হৃদয়ে মাতৃভক্তি ও নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বাল্যজীবনে শিবাজী কতদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। সম্ভবত হায়দর আলী ও রণজিৎ সিংহের ন্যায় তিনিও নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই শিবাজী অশ্বারোহণ, মল্লক্রীড়া, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি বীরোচিত কর্মে সুনিপুণ হইলেন। পার্বত্য মাওলী জাতীয় কৃষকগণেব সহায়তায় তিনি একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন কবেন। মাতাব নিকট রামায়ণ ও মহাভাবতের উপাখ্যান এবং মাতৃ-পিতৃকুলেব বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া ভাবতবর্ষে একটি স্বাধীন হিন্দুবাজ্য স্থাপনের কল্পনা কিশোর বয়সেই শিবাজীকে উদ্বুদ্ধ কবিয়াছিল। সমসাময়িক বাজনৈাতক অবস্থা শিবাজীর শক্তি বিস্তাবেব অনুকূল ছিল। দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলি তখন ছিল হীনবল, এই সময় মুঘল সম্রাট আওবঙ্গজেব উত্তবাপথেই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

ছত্রপতি শিবাজী
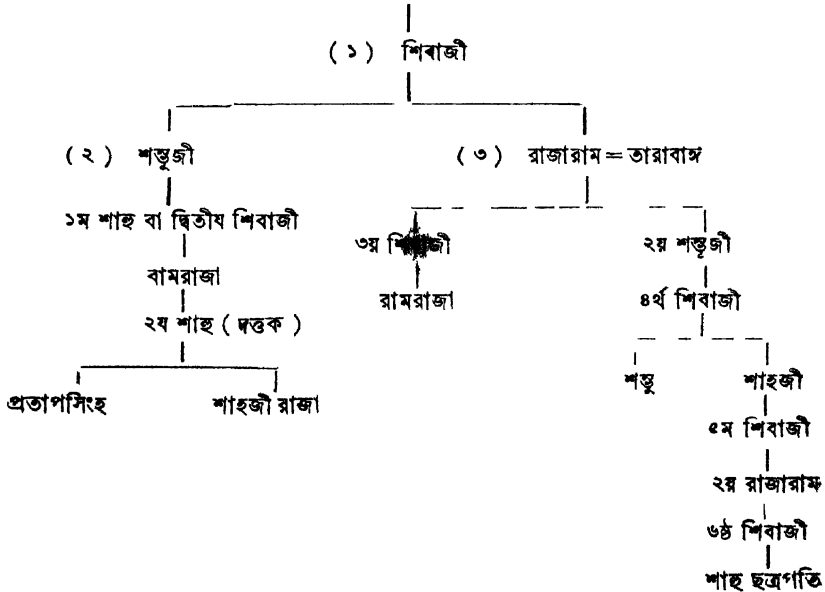
ষোড়শ (মতান্তরে উনবিংশ) বৎসর বয়সে এই আদর্শবাদী তরুণ মারাঠা হিন্দু যুবকের সামরিক জীবনের সূত্রপাত হয়। উত্তরাপথে মুঘল সম্রাটের কর্মব্যস্ততা এবং বিজাপুর সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে তিনি পার্বত্য মাওলী যোদ্ধাগণের সহায়তায় বিজাপুর রাজ্যের অধীন পুণার কুড়ি মাইলের মধ্যবর্তী তোরণ দুর্গ অধিকার করেন (১৬৪৬ খ্রীঃ)। পর বৎসর তাঁহার অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর শিবাজী স্বাধীনভাবে তাঁহার ঈপ্সিত কর্মসাধনে তৎপর হইলেন। তিনি কৌশলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত চাকন, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গ এবং কোঙ্কন প্রদেশ অধিকার করিলেন ও রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তখন শিবাজীর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর।

তোরণ দুর্গ অধিকার (১৬৩৬ খ্রীঃ)

দাদাজীর মৃত্যু ঃ শিবাজীর অবাধ স্বাধীনতা

বিজাপুর রাজ্যের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্ব ঃ এই উদীয়মান মারাঠা বীরকে বিজাপুরের রাজ্যাংশ অধিকার করিতে দেখিয়া বিজাপুরের সুলতান পিতা শাহজীকে বন্দী করিয়া পুত্র শিবাজীকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। শিবাজী পিতাকে কারামুক্ত করিবার জন্য প্রথমত দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্তা সম্রাট শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেবের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন মুসলমান ওমরাহের অনুরোধে বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে পুত্রের 'সৎ ব্যবহার'-এর শর্তে কারামুক্ত করেন। শিবাজী তাঁহার শর্ত পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের বশংবদ জাউলীর অর্ধ-স্বাধীন মারাঠা সর্দার চন্দ্ররাওকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি জাউলী অধিকার করেন। এই বৎসরই দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার আওরঙ্গজেবের সঙ্গে বিজাপুর সুলতানের সংগ্রামের সুযোগে শিবাজী পুরন্দর দুর্গ অধিকার করেন। মুঘল পরিবারে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব আরম্ভ হইলে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের সহিত বিজাপুর সুলতানের সন্ধি স্থাপিত হয়।

শাহজী কারারুদ্ধ

শিবাজীর আক্রমণাত্মক কার্য সাময়িক বন্ধ

আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি স্থাপনের পরেই বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি আফজল খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। সম্মুখ যুদ্ধ বিপজ্জনক মনে করিয়া চতুর শিবাজী প্রতাপগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবাজীকে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইবার জন্য সেনাপতি আফজল খান নানা প্রকার অভিসন্ধি করেন। দুইটি দেবমন্দির কলুষিত করিয়াও তিনি শিবাজীকে দুর্গ হইতে বাহিরে আনিতে পারিলেন না। কৃষ্ণজী ভাস্কর নামে এক মারাঠা ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায় আফজল খান সন্ধির প্রস্তাব

শিবাজী ও বিজাপুর সুলতান

করিয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সন্ধির শর্ত আলোচনা করার উদ্দেশ্যে শিবাজী ও আফজল খান প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে সাক্ষাৎ করিলেন। সুচতুর শিবাজী কৃষ্ণজী ভাস্কর ও দূত গোপীনাথের নিকট আফজল খানের দুরভিসন্ধির সন্ধান পাইয়া পরিধানের নিম্নে লুক্কায়িত লৌহবর্ম এবং বামহস্তের অঙ্গুলীতে লৌহনির্মিত "বাঘনখ" পরিধান করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। আফজল খান অতর্কিতে শিবাজীকে আক্রমণ করিলে শিবাজী বিদ্যুৎগতিতে "বাঘনখ" ও "বিছুয়া" নামক বিষ মাখান তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে তাহাকে হত্যা করিলেন। সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে বিজাপুরের সৈন্যদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মারাঠাগণ শত্রুশিবির লুণ্ঠন এবং কোঙ্কন প্রদেশের দক্ষিণাংশ ও কোলাপুর অধিকার করিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সেনাদল শিবাজীকে পানহালা দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিল। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এই ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই।

শিবাজী ও আফজল খানের সাক্ষাৎকার

আফজল খান নিহত

আওরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্ব ঃ বিজাপুর সুলতানের আক্রমণ রোধ করিয়াও শিবাজী নিরাপদ হইতে পারিলেন না; তাঁহাকে আরও অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, তখনই শিবাজীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করার পর আওরঙ্গজেব শিবাজীর সাফল্য ও শক্তিবিস্তারে শঙ্কিত হইয়া সুবাদার শায়েস্তা খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (১৬৬০ খ্রীঃ)। শায়েস্তা খান পুণা ও চাকন অধিকার করিয়া কল্যাণ অঞ্চল হইতে মারাঠাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু শিবাজীর এক আকস্মিক নৈশ আক্রমণে পুণার পুনরুদ্ধার ঘটে এবং শায়েস্তা খানের পুত্র ও কয়েকজন দেহরক্ষী নিহত হয়। শায়েস্তা খান একটি অঙ্গুলীর মায়া বিসর্জন করিয়া পুণা হইতে পলায়ন করিলেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। নবোৎসাহে শিবাজী পর বৎসর মুঘল অধিকারভুক্ত সমৃদ্ধ সুরাট বন্দর ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করেন এবং "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে এই দুঃসাহসিক অভিযান ও সুরাট লুণ্ঠন শিবাজীর খ্যাতি বৃদ্ধি করিল।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ

শায়েস্তা খানের আক্রমণ ও পরাজয়

সুরাট লুণ্ঠন ও শিবাজীর 'রাজা' উপাধি গ্রহণ

শিবাজীকে দমন করা অত্যাবশ্যক মনে করিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব অম্বর-রাজ জয়সিংহ এবং বিখ্যাত সেনাপতি দিলওয়ার খানকে সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। কূটকৌশলী জয়সিংহ বিজাপুরের সুলতানের সহায়তায় পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলে

পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ)

শিবাজী তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ) অনুসারে তিনি মাত্র বারটি দুর্গ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দুর্গ মুঘল হস্তে সমর্পণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে মুঘল সেনাপতি জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে শিবাজী নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুঘল সৈন্যের সহায়তা করেন।

শিবাজীর এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ধূর্ত আওরঙ্গজেব শিবাজীকে আগ্রার দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। জয়সিংহের প্রতিশ্রুতি ও অভয়দানে নির্ভয় হইয়া শিবাজী পুত্র শম্ভুজীসহ আগ্রার দরবারে উপস্থিত হইলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)।

শিবাজীর আগ্রা দরবারে উপস্থিতি: বন্দিত্ব ও মুক্তিলাভ

কিন্তু দরবারে শিবাজীর প্রতি পদমর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় নাই। রাজপুতগণও এই শর্তভঙ্গে দুঃখিত হন। শিবাজী প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ফলে, তিনি পুত্রসহ অগ্রায় নজরবন্দী হইলেন। কিন্তু চতুর শিবাজী কৌশলে মিষ্টান্নের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন এবং মথুরা, আগ্রা, বারাণসী, গয়া পর্যটনের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পর শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবল শত্রুরূপেই অবতীর্ণ হইলেন। জয়সিংহের মৃত্যুর পর শাহজাদা মুয়াজ্জমকে সাহায্য করিবার জন্য মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। তাঁহাদের মধ্যস্থতায় আওরঙ্গজেব শিবাজীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু

পুনরায় মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ

১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। শিবাজী পুরন্দরের সন্ধি অনুসারে হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং দ্বিতীয় বার সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি খান্দেশ এবং সুরাটের চৌথ আদায় করেন, ফলে, ইহাতে তাঁহার কুড়ি লক্ষ মুদ্রা নূতন আয় হইল। সর্বত্র শিবাজীর জয় ঘোষিত হইল।

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী **ছত্রপতি ও গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক** * উপাধি ধারণ করেন এবং রায়গড়ে মহাসমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। এইবার ছত্রপতি শিবাজী রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করিলেন; অচিরকাল মধ্যেই তিনি বলগানা ও বেরার জয় করেন। গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি বিজাপুরের কর্ণাটক আক্রমণ করেন এবং কর্ণাটকের নিকটবর্তী জিঞ্জি অধিকার করেন (১৬৭৭ খ্রীঃ)। তারপর তিনি ভেলোর, বেলারি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। মুঘল নৌ-সেনাপতি

* আওরঙ্গজেবের উপাধি ছিল "খলিফা"—ইসলাম ধর্ম ও রাজ্যের প্রতিপালক। শিবাজীর উপাধি "গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক"—'গো' অর্থাৎ বেদ। শিবাজী হিন্দু ধর্মরক্ষকরূপে মুসলিম ধর্মরক্ষক আওরঙ্গজেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

জিঞ্জি অধিকারে অপমানিত বোধ করিয়া ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের সাহায্যে শিবাজীর নৌ-বাহিনীকে পরাভূত করেন। শিবাজী সুরাট বন্দর অধিকার করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে শিবাজীর কর্মময় জীবনের অবসান হইল। শিবাজীর রাজ্য-কেন্দ্র ছিল রায়গড়; রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বিদেশী অধিকৃত অঞ্চল ব্যতিরেকে সমুদ্রোপকূল-ভাগের রামনগর অর্থাৎ সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুর হইতে দক্ষিণে প্রায় গোয়া পর্যন্ত। পূর্বদিকে তাঁহার রাজ্য বলগানা, নাসিক, পুণা এবং সাতারা সহ কোলাপুর পর্যন্ত ও পশ্চিমে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃত্যুর পূর্বে শিবাজী তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী কিছু অঞ্চল এবং বর্তমান মহীশূরের কোলার ও বাঙ্গালোর জয় করিয়াছিলেন। ফলে, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলও শিবাজীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।
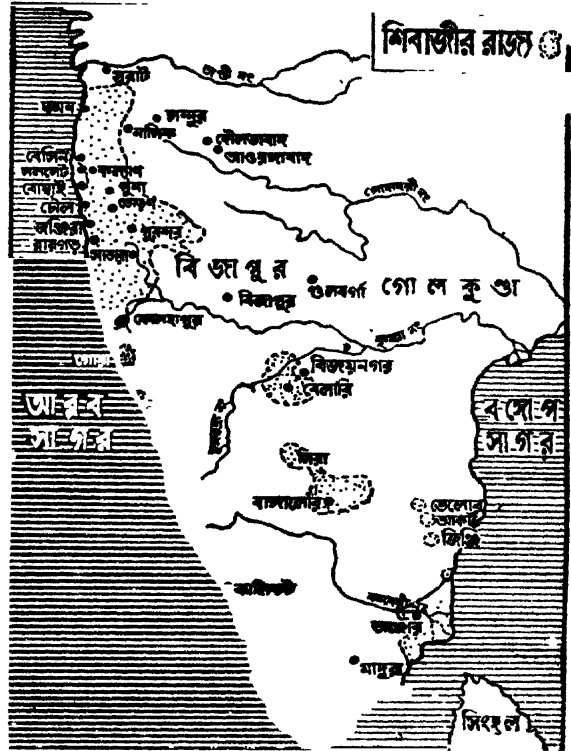
শিবাজীর মৃত্যু

শিবাজীর রাজ্যশাসন পদ্ধতি ঃ শিবাজী কেবলমাত্র দুঃসাহসিক বীর এবং সমরকুশল সেনাপতি হিসাবেই ইতিহাসে পরিচিত নহেন; তিনি সুদক্ষ শাসক হিসাবেও সমধিক পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী তাঁহার অপূর্ব সংগঠনশক্তির পরিচায়ক। শের শাহ এবং আকবরের ন্যায় তিনি রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য স্থায়ী ও সুদৃঢ় করিবার জন্য উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। মুঘল সম্রাটের ন্যায় শিবাজী ছিলেন রাজ্যের একচ্ছত্র নায়ক; কিন্তু সেই একনায়কত্বের মহান আদর্শ ছিল মানবকল্যাণ এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে স্বীয় দেশ ও প্রজাদিগকে রক্ষা করা। শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈর-

শাসক হিসাবে শিবাজী

তান্ত্রিক, কিন্তু স্বৈরতন্ত্র হইলেও উহা স্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হয় নাই। শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা স্বয়ং। কিন্তু আট জন মন্ত্রিসমন্বিত **অষ্টপ্রধান** নামে এক মন্ত্রিসভা তাঁহার শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রধান মন্ত্রীর পদবী ছিল **পেশোয়া** (সর্বাগ্রস্থিত)। অন্য সাত জন মন্ত্রীর উপাধি ছিল অমাত্য (মজমুয়াদার বা মজুমদার), মন্ত্রী, সামন্ত (দবীর), সুনীস (সচিব), সেনাপতি, পণ্ডিত রাও (বিচারক) এবং ন্যায়াধীশ (প্রধান ধর্মোপদেষ্টা)। ন্যায়াধীশ এবং পণ্ডিত রাও ব্যতীত অন্যান্য প্রধানগণ শাসনকার্যের সঙ্গে সামরিক কার্যও নির্বাহ করিতেন, আবার তিন জন প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তারও কার্য করিতেন। শাসন-সংক্রান্ত ত্রিশটি বিভাগ ছিল। মন্ত্রী বা প্রধানগণ এই সমস্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বাধিনায়ক; মন্ত্রীদের নিযুক্তি এবং পদচ্যুতি রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। রাজার কার্যে বাধা প্রদানের অধিকার কাহারও ছিল না। মন্ত্রিগণ রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করিতেন। এই সভার ক্ষমতা উপদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

রাজা ও অষ্টপ্রধান

শাসন বিভাগ

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ছত্রপতির রাজ্য কয়েকটি 'প্রান্ত' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসকগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রদেশ শাসন করিতেন। কর্ণাটকের শাসনকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা অপেক্ষা বেশী ছিল।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

প্রান্ত বা প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া রাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রত্যেক প্রান্ত 'পরগণা' ও 'তরফে' বিভক্ত ছিল। 'গ্রাম'ই ছিল রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশ। সমগ্র জমির পরিমাপ করিয়া উৎপন্ন শস্যের দুই-পঞ্চমাংশ রাজকর-রূপে ধার্য হইয়াছিল। কৃষকগণ ইচ্ছানুসারে শস্য বা নগদ তঙ্কা দ্বারা রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত। জমি কখনও ইজারা দেওয়া হইত না। কৃষকগণের প্রতি যাহাতে কোন প্রকারের অত্যাচার না হয় সেদিকে শিবাজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মহারাষ্ট্রের অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে শস্যের প্রাচুর্য ছিল না বলিয়া এই যৎসামান্য অর্থে শাসন ও দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় নির্বাহ হইত না। সেইজন্য শিবাজী স্বীয় রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চল হইতে **চৌথ** (চতুর্থাংশ), **সরদেশমুখী** (দশমাংশ) নামে দুই প্রকার বিশেষ কর আদায় করিতেন। বিজাপুর ও মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ হইতে এই দুইটি কর আদায় করা হইত। এই কর প্রেরিত না হইলে মারাঠা সৈন্যগণ উক্ত অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিত। শিবাজী সম্ভবত রামনগর (বর্তমান ধরমপুর) রাজ্যের নিকট হইতে চৌথ আদায় প্রথা অনুকরণ করিয়াছিলেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা : দুই-পঞ্চমাংশ রাজকর

চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজী দাবি করিতেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্রের "সরদেশমুখ" অর্থাৎ প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ ছিল সরদেশমুখী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দাবির পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি ছিল না। এই দুইটি কর দ্বারা মারাঠা রাজ্যের যে শুধু প্রভূত আয় হইত তাহা নহে ; এই আদায় উপলক্ষ্য করিয়া বিজাপুর ও মুঘল সাম্রাজ্যে মারাঠা বাহিনীর প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল।

সামরিক শাসন : মারাঠা রাজ্য সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসন বিভাগের ন্যায় সৈন্য বিভাগের সংস্কারেও শিবাজী অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সৈন্যদলের অধ্যক্ষগণ ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নতম সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি ছিল 'নায়ক'। নায়কের উপর 'হাবিলদার', তার উপর 'জুমলাদার'। সর্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ 'সর্নোবৎ' বা সেনাপতি নামে অভিহিত হইতেন। তিনি অষ্টপ্রধানের সদস্য ছিলেন। শিবাজী সৈন্যাধ্যক্ষগণকে জায়গিরের পরিবর্তে নগদ বেতন দিতেন। তাঁহার সামরিক দলের দুইটি প্রধান অঙ্গ ছিল—অশ্বারোহী সৈন্য ও নৌ-বহর। অশ্বারোহী সৈন্য ছিল আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বারগীর ও শীলাদার। বারগীরগণ (বর্গী) রাজ সরকার হইতে অশ্ব, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পাইত। শীলাদারগণ স্বকীয় সাজসজ্জা, অশ্ব ও অস্ত্রাদিসহ সৈন্যদলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যোগদান করিত। প্রকৃতপক্ষে শিলাদারগণ বর্তমান যুগের জাতীয় সৈন্যদলের (National Militia) অনুরূপ ছিল। শিবাজী সৈন্যদলে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বিধান ছিল। সৈন্যদলে এবং মারাঠা শিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজার প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইত। বিলাস ও ব্যসনের প্রতি মারাঠা সৈন্যের কোন আসক্তির সুযোগ ছিল না। বাহুল্য বর্জন ও ক্ষিপ্রতাই ছিল মারাঠা বাহিনীর বৈশিষ্ট্য। শত্রুর সম্মুখীন না হইয়া রসদ প্রভৃতি লুণ্ঠন ও খণ্ডযুদ্ধ দ্বারা শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করাই ছিল মারাঠা রণনীতি (গোরিলা নীতি)। শিবাজীর পার্বত্য দুর্গগুলিই ছিল তাঁহার সামরিক শক্তির কেন্দ্র। তাঁহার অধীনে ২৪০টি দুর্গ ছিল। তিনি একটি শক্তিশালী নৌ-বহর গঠন করিয়াছিলেন। মারাঠা নৌ-বহর বিভিন্ন প্রকার চারিশত পোতের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। শিবাজীর নৌ-বহর সে যুগে ইওরোপীয় নৌ-বহর হইতে নিকৃষ্ট ছিল না। এই নৌ-বহর গঠনে শিবাজী মুঘল সম্রাটগণের অপেক্ষা অধিকতর দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সৈন্য বিভাগ

সেনাবাহিনী

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

নৌ-বহর

মুঘল-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের বিজয়ের কারণ : মুঘল ও মারাঠাদের যুদ্ধে মারাঠাদের বিজয়ের প্রথম কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব। দিল্লী হইতে

পুণার দূরত্ব প্রায় পাঁচ শত মাইল; সুতরাং অতদূরে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা সহজ ব্যাপার নয়। মারাঠা সৈন্য নিজের দেশে যুদ্ধ করিত, মুঘল সৈন্য বিদেশে যুদ্ধ করিত। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য পথঘাট ও জলবায়ুর সঙ্গে মারাঠাদের পরিচয় ছিল; কিন্তু মুঘলদের পক্ষে সমস্তই ছিল নূতন। মুঘল সৈন্যগণ অর্থের জন্য যুদ্ধ করিত, মারাঠাগণ স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিত। মারাঠা জাতির জীবন-মরণ এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিত। সুতরাং যুদ্ধে মারাঠাদের ছিল জীবন পণ। মারাঠা যুদ্ধনীতির সঙ্গে মুঘল যুদ্ধনীতির বহু পার্থক্য ছিল। মারাঠা যুদ্ধ গেরিলা নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত। মুঘলবাহিনী অজগরের মত শ্লথগতি, ব্যয়-বহুল এবং আরাম ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিল। মুঘল-শিবির ছিল চলন্ত শহর। সেনাপতিগণ স্ত্রীপুত্র, দাসদাসী, মোসাহেব এবং নর্তকী সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। আওরঙ্গজেব সেনাপতিদের পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। তদুপরি সৈন্যাধ্যক্ষগণ শিবাজীর মত বিচক্ষণ ছিলেন না। মুঘলদের একটি পরাজয়ের ফল অনেক সময় সমস্ত সৈন্যকে হতোৎসাহ করিয়া দিত; মারাঠা পরাজয় জলতরঙ্গের উপর আঘাতের মত অচিরকাল মধ্যে মিলাইয়া যাইত। মুঘল সৈন্যদের মধ্যে প্রাথমিক মুসলিম যুগের ধর্মোন্মাদনা ছিল না। দিল্লীর ঐশ্বর্য মুঘল জাতির আদিম শৌর্যকে ক্ষয়িষ্ণু করিয়া দিয়াছিল। আওরঙ্গজেবকে একসঙ্গে অনেক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এমন কি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংসের পরে দাক্ষিণাত্যে কোন শিয়া মুসলমান সুন্নী আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করে নাই। অন্যদিকে রাজপুত, শিখ, জাঠ, সৎনামী প্রভৃতি সমস্ত হিন্দু আওরঙ্গজেবকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের কোন শক্তিশালী নৌ-বহর ছিল না। শিবাজীর নৌ-বহর তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। শিবাজীর পক্ষে হিন্দুরাজগণের সাহায্যও যথেষ্ট মনোবল সঞ্চার করিয়াছিল। পূর্বে আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ হিন্দুর বিরুদ্ধে মুঘল পক্ষে কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শেষ জীবনে মুঘল পক্ষে কোন সুদক্ষ রাজপুত সেনাপতি ছিল না। মারাঠা জাতি নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ ভারতের ইতিহাসে যে সকল শ্রেষ্ঠ কর্মবীর আবির্ভূত হইয়াছেন, শিবাজী তাঁহাদের অন্যতম সন্দেহ নাই। তাঁহার সাহস, উদ্যম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাঁহার অপূর্ব রণ-নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য। মাতৃভক্তি, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বধর্মানুরাগ তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। হিন্দুধর্মের রক্ষক এবং হিন্দু স্বাধীনতার প্রতীক হইলেও শিবাজী আওরঙ্গজেবের ন্যায় পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের অমুসলমানের প্রতি ঘৃণা ছিল অপরিসীম। শিবাজী ধর্মনির্বিশেষে মানুষকে মানুষরূপে জ্ঞান

চরিত্র ও গুণাবলী

করিতেন। মুসলমান তাঁহার শত্রু হইলেও তিনি মসজিদ ও কোরাণকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহার নিকট ধর্ম ছিল সৎবৃত্তি ও কর্মের উৎস, অন্ধ বিশ্বাস নহে। সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিক কাফি খান শিবাজীকে "নরকের কুকুর", "শয়তানের অবতার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অথচ তিনি শিবাজীর উদারতা ও নারীর প্রতি মর্যাদাবোধের প্রশংসা করিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভের জন্য অবশ্য শিবাজী ছল ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে, বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের মত শত্রুর বিরুদ্ধে চাণক্যের "শঠে শাঠ্যং" নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল। শিবাজীর উদারতা, মহানুভবতা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য সমগ্র দেশের লোক এখনও এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে।

উদার ধর্মমত

পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শিবাজীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলা যাইতে পারে। তাঁহার চরিত্রে আদর্শ ও বাস্তবের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বধর্মকে পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্তিদানের মহান আদর্শই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সামান্য জায়গিরদারের পুত্ররূপে শিবাজী কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং অসামান্য সংগঠন-প্রতিভা ও বাহুবলে প্রবল পরাক্রান্ত, কৌশলী, ধূর্ত বিচক্ষণ মুঘল সম্রাট ও বিজাপুর সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া একটি স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী বিচ্ছিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করিয়া জাতি গঠন এবং নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় শিবাজীর উদ্বোধনী শক্তি ছিল, অন্যের প্রাণে প্রেরণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার উৎসাহে ও প্রেরণায় মারাঠা জাতির প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হইয়াছিল। ফলে শতাধিক বৎসর তাহারা ভারতে প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র এবং সামরিক প্রণালী তাঁহার অপূর্ব সংগঠন-শক্তির নির্ভুল প্রমাণ। শিবাজী হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট সৃজনীপ্রতিভা এবং জাতিস্রষ্টা বলিয়া শ্রদ্ধেয়।

শিবাজীর কৃতিত্ব

মহান আদর্শ

সংগঠন-প্রতিভা

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **শম্ভুজী** মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৮০ খ্রীঃ)। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ কবিকুলেশ। সাহস ও বীরত্বের অধিকারী হইলেও শিবাজীর ন্যায় শম্ভুজীর চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ গোলযোগে মারাঠা রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হয়। তাঁহার সময়ে পর্তুগীজ ও জাঞ্জিবারের সঙ্গে নৌ-যুদ্ধে মারাঠা শক্তির অপচয় হয়। তিনি আওরঙ্গজেবের

বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান করিয়া সম্রাটের বিরাগভাজন হন। আওরঙ্গজেব মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিয়া কবিকুলেশ এবং পঁচিশ জন মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষসহ শম্ভুজীকে বন্দী করেন। ইসলাম ধর্ম অবমাননার অপরাধে তিন সপ্তাহ কাল নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর তপ্তশলাকা বিদ্ধ করিয়া আওরঙ্গজেব অনুচরগণসহ শম্ভুজীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (১৬৮৯ খ্রীঃ)। তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র **শাহু** (পরবর্তিকালে দ্বিতীয় শিবাজী) রাজবন্দী রূপে আওরঙ্গজেবের রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব মনে করিলেন—তিনি শত্রু জয় করিয়াছেন। কিন্তু এই জয় শত্রুর মনে প্রতিহিংসা জাগরিত করিল।

শাহু

জাতীয় জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে শিবাজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্করজী মলহর, পরশুরাম ত্রিম্বক প্রভৃতি মারাঠা বীর মুঘল শক্তিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আওরঙ্গজেব এইবার রাজাহীন মারাঠা রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মারাঠাদের পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল জাতীয় যুদ্ধ। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র **রাজারাম** কর্ণাটকের অন্তর্গত জিঞ্জি দুর্গে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সান্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ ক্রমাগত বাদশাহী ফৌজকে বিব্রত ও শক্তিহীন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আওরঙ্গজেবের শিবির পর্যন্ত লুণ্ঠিত হইল। ক্রমাগত আট বৎসর (১৬৯০-১৬৯৮ খ্রীঃ) যুদ্ধের পর জিঞ্জি দুর্গ মুঘলদের অধিকারভুক্ত হইল বটে, কিন্তু রাজারাম পূর্বেই "পোড়ামাটি" নীতি অনুসারে সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মুঘলদের বিশেষ লাভ হয় নাই। রাজারাম নূতন করিয়া সাতারাতে রাজধানী স্থাপন করিয়া মুঘল শক্তি বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন

রাজারাম

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বীরপত্নী **তারাবাঈ** তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে যোগ্যতার সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিতে লাগিলেন। হিন্দুবিদ্বেষী কাফি খান বলিয়াছেন—তারাবাঈ ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, কর্মপটিয়সী। স্বামীর জীবদ্দশায় সামরিক জ্ঞান ও শাসন-কুশলতা দ্বারা তিনি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তারাবাঈ-এর প্রেরণায় মারাঠা সৈন্য মালব, গুজরাট, বরোদা প্রভৃতি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিল। আওরঙ্গজেব কোনক্রমেই সম্মুখ যুদ্ধে মারাঠাগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের শক্তি দমন করিতে পারিলেন না। বিখ্যাত প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক মানুচ্চী বলিয়াছিলেন, "মারাঠা সৈন্যের সাহস ও শৌর্যের সম্মুখে মুঘল সৈন্য ও সেনাপতি ছিল ভীত, কম্পিত ও ত্রস্ত। দাক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্য বিজিত এবং মারাঠা সৈন্য বিজেতার আসন লাভ করিয়াছে।" এই নিদারুণ নৈরাশ্যের

তারাবাঈ

মধ্যে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে মারাঠা শত্রুর করাল ছায়া তাঁহাকে বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। রাজ্য গঠন পর্যন্ত শিবাজীর জীবনের ঘটনা বর্ণনা কর। শিবাজীর জীবনের আদর্শ ও কর্মের প্রেরণা বিশ্লেষণ কর।

(Trace the career of Sivaji till his accession. What were the motives and ideals that guided him ?)

২। বিরাট মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পার্বত্য মূষিক শিবাজীর সাফল্যের কারণ বর্ণনা কর।

(What were the causes of the success of 'Small Sivaji' against the 'Great Mughals' ?

৩। শিবাজীর রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(Give a short account of Sivaji's administrative and military system.)

৪। শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেবের সহিত মারাঠা রাজ্যের সম্বন্ধ বর্ণনা কর।

(Narrate the relation of Aurangjeb with the Maratha Kingdom after Sivaji's death.)

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) প্রথম বাজীরাও (খ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (গ) বর্গী ও শিলাদার (ঘ) চৌথ ও সরদেশমুখী (ঙ) হিন্দু-পদ পাদশাহী।

(Write short notes on : (a) Baji Rao I. (b) Third battle of Panipath, (c) Bargis and Silahdars. (d) Chauth and Saradeshmukhy. (e) Hindu-Pad-Padshahi).

দ্বাদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ

অধ্যায় পরিচয়ঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৭০৭ খ্রীঃ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের গতিবেগ দ্রুত হইল। তাঁহার চৌদ্দজন বংশধর নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহাদের অযোগ্যতা, সিংহাসনের জন্য ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে অবিরাম অবশ্যম্ভাবী বিরোধ এবং ক্ষমতালাভের জন্য স্বার্থপর ওমরাহদের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র দ্বারা এই যুগের ইতিহাস কলঙ্কিত। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে রাজপুত, মারাঠা, শিখ ও আফঘান জাতি স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। পারস্যরাজ নাদীরশাহ এবং আফঘানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ শাহ দুররাণীর তাণ্ডব আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মাদ্রাজ অঞ্চলে ও বাঙ্গালা দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব স্থাপনে কার্যত ভারতবর্ষে ইংরেজাধিকার বদ্ধমূল হইল। মুঘলবংশের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সিপাহী বিদ্রোহের পরে (১৮৫৮ খ্রীঃ) ইংরেজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়।

আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল যুগ (১৭০৭-১৮৫৮ খ্রীঃ)**ঃ** আওরঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সামাজ্য বিভাগ করিয়া সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রদের মধ্যে পৈতৃক সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ অনিবার্য হইল। সিংহাসনের দ্বন্দ্ব মুঘল রাজবংশের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। জ্যেষ্ঠ মুয়াজ্জম অপর ভ্রাতা আজমকে নিহত করিয়া আটান্ন বৎসর বয়সে সিংহাসন অধিকার করেন। দুই বৎসর পর (১৭০৯ খ্রীঃ) ভ্রাতা কামবক্সকে নিহত করিয়া তিনি রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। তিনিই ইতিহাসে **শাহ আলম** বা **বাহাদুর শাহ** নামে পরিচিত। বিদ্বান এবং উদার হইলেও তিনি রাজকার্যে এত অযোগ্য ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে "শাহ-ই-বে-খায়ের" (অমঙ্গলের রাজা) আখ্যা দিয়াছিল। তাঁহার পাঁচ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে রাজপুত ও মুঘল সংঘর্ষের সমাপ্তি হইল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মেবার, মাড়বার এবং অম্বরের অধিপতিগণ মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিতসিংহকে মাড়বারের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

ভ্রাতৃবিরোধ

শাহ আলম বা প্রথম বাহাদুর শাহ

১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাররুকশিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফাররুকশিয়রকে সিংহাসনচ্যুত

করিয়া বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন (১৭১৯ খ্রীঃ) এবং বাহাদুর শাহের পৌত্র রোসন আখ্‌তারকে সিংহাসন দান করেন। এই রোসন আখ্‌তারই বিখ্যাত **মুহম্মদ শাহ।** সৈয়দ হোসেন আলী দাক্ষিণাত্য অভিযানের পথে মুহম্মদ শাহ কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। সৈয়দ আবদুল্লা বিদ্রোহের চেষ্টা করিলে মুহম্মদ শাহ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন (১৭২২ খ্রীঃ)। এই কার্যে আমীর নিজাম-উল-মুল্‌ক মুহম্মদ শাহের প্রধান সহায়ক ছিলেন।

মুহম্মদ শাহ

প্রাদেশিক রাজ্যের উত্থান : সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনেও মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল না। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক হায়দরাবাদে, সাদৎ আলি খান অযোধ্যায় এবং মুর্শিদকুলী খান বাঙ্গলায় 'প্রায় স্বাধীন' রাজ্য স্থাপন করেন।

মুর্শিদকুলী খান টোডরমলের মূলনীতি গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি রাজস্ব প্রথা প্রচলন করেন। তিনি উত্তর ও মধ্যবঙ্গে ভূমি পরিমাপ করান, মালজামানী (অর্থাৎ ইজারাদারি) প্রথা প্রবর্তন করেন। সমস্ত দেশকে কতকগুলি চাকলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক চাকলায় একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। চাকলার অধীনে বিভিন্ন জমিদারি স্থাপন করেন। বাঙ্গলার বহু জমিদার পরিবার মুর্শিদকুলী খানের সৃষ্টি। তিনি প্রত্যেক জমিদারের নিকট হইতে রাজস্বের হিসাবপত্র ও অর্থ কঠোর ভাবে দাবি করিতেন। যে সমস্ত হিন্দু জমিদার হিসাব দিতে অপারগ হইতেন, তাঁহাদিগকে "বৈকুণ্ঠে" অর্থাৎ মলমূত্র পূর্ণ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বাধ্য করিতেন—অনেক হিন্দু জমিদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন।

মুর্শিদকুলী খান

রাষ্ট্র শাসনে মুর্শিদকুলী খান অনেক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গলার রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত হইল। মুর্শিদকুলীখান এক কোটী মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন; রাজধানীর রাজকোষ তখন প্রায় শূন্য। এই দুঃসময়ে বাঙ্গলা দেশ হইতে এই অর্থপ্রাপ্তিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খানকে ফেরিস্তা বা দেবদূত বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে বিহারের নবাব-নাজিম আলীবর্দী খান, বাঙ্গলার রায়রায়ান আমীনচাঁদ এবং বিখ্যাত বণিক জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মুর্শিদকুলী খানের পৌত্র সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খান নিহত হন। দিল্লীর বাদশাহ আলীবর্দী খানকে বাঙ্গলার নবাব বলিয়া স্বীকার করেন। এই সময় দিল্লীর নিকটবর্তী রোহিলখণ্ডের আফঘানগণ মুহম্মদ খান নামক একজন ধর্মান্তরিত হিন্দুকে নেতৃপদে বরণ করিয়া স্বাধীন রোহিলখণ্ডের পত্তন করিল (১৭৪৫ খ্রীঃ)।

জাঠবীর চূড়ামণের ভ্রাতুষ্পুত্র বদনসিংহ জাঠদিগকে সংহত করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। কিছুকাল পরে মারাঠা বীর রঘুজী ভোঁসলে বাঙলা দেশে চৌথ আদায়ের জন্য উপস্থিত হইলেন। মধ্য ভারতে রাজপুতগণও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া গেল। মারাঠাগণ মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য স্থাপন করিল ; পেশোয়া বাজীরাও ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মুঘল সাম্রাজের অস্তিত্ব ভস্মরেখাকারে পরিণত হইল। মুঘল সাম্রাজ্যের এই চরম দুর্দিনে পারস্যরাজ নাদীর শাহের ভারত আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল (১৭৩৯ খ্রীঃ)।

শিখ জাতির উত্থান : শিখনায়ক বান্দার বিদ্রোহ

এই সময়ের সর্বপ্রধান ঘটনা **শিখনায়ক বান্দার** অভ্যুত্থান। পঞ্জাবের অন্তর্গত সরহিন্দের মুঘল শাসনকর্তা শিখগুরু গোবিন্দসিংহের শিশু পুত্রগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় বান্দা সরহিন্দ লুণ্ঠন করেন এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্রহত্যাকারী সরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজির খানকে হত্যা করেন। বাহাদুর শাহ স্বয়ং বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লৌহগড় দুর্গে অবরুদ্ধ করলেন, কিন্তু বান্দা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

জাঁহাদার শাহ

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর (১৭১৫ খ্রীঃ) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জাঁহাদার শাহ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ছিলেন বিলাসী, মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী নর্তকী লালকুমারী তাঁহার রাজত্বকালে দ্বিতীয় নূরজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লালকুমারী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী। এক বৎসর রাজত্বের পরই জাঁহাদার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফাররুকশিয়র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

ফাররুকশিয়র ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

ফাররুকশিয়রের সিংহাসনলাভের প্রধান সহায়ক ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লা ও সৈয়দ হোসেন আলি খান নামক ভ্রাতৃদ্বয়। সম্রাটের অযোগ্যতার সুযোগে এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। ওমরাহগণের আত্মকলহে রাজদরবার ষড়যন্ত্র-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ওমরাহগণ ছিল তিন দলে বিভক্ত—হিন্দুস্থানী (ভারতবর্ষে জাত), ইরাণী (পারস্য ও খোরাসান হইতে আগত) এবং তুরাণী (মধ্য এশিয়া হইতে আগত)।

দরবারে দলাদলি

বিভিন্ন দলের পরস্পর ষড়যন্ত্র ও বিবাদে সাম্রাজ্য দুর্বল হইতে লাগিল। মাড়বাররাজ অজিতসিংহ বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু পরে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। শিখনায়ক বান্দা ধৃত হইয়া অনুচরবর্গসহ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। আগ্রার

পশ্চিমে ভরতপুরের জাঠনায়ক চূড়ামণ বিদ্রোহী হইলে সৈয়দ আবদুল্লা তাঁহাকে আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। সৈয়দ হোসেন আলীর সহিত চুক্তির ফলে বালাজী বিশ্বনাথ দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবা হইতে চৌথ আদায়ের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাকে বাৎসরিক দশ লক্ষ মুদ্রা রাজকোষে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইল।

জাঠ বিদ্রোহ

১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাররুকশিয়রের চক্রান্তে শঙ্কিত হইয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে পদচ্যুত ও হত্যা করেন। তাঁহাদের মনোনীত বাহাদুর শাহের দুইজন পৌত্রের পর পর অকাল মৃত্যু হইলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় রোশন আখ্‌তার নামে বাহাদুর শাহের আর এক পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (১৭১৯ খ্রীঃ)। রোশন আখ্‌তার "মুহম্মদ শাহ" উপাধি গ্রহণ করিলেন।

রোশন আখ্‌তার

সিংহাসন লাভের পর **মুহম্মদ শাহ** সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হুসেন আলী খান দাক্ষিণাত্য অভিযানের পথে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন (১৭২০ খ্রীঃ)। সৈয়দ আবদুল্লা সম্রাটের বিরুদ্ধে তখন বিদ্রোহ করেন এবং মুহম্মদ ইব্রাহিম নামক বাহাদুর শাহের আর একটি পৌত্রকে সিংহাসন দানের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরাজিত ও বন্দী আবদুল্লাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইল (১৭২২ খ্রীঃ)।

মুহম্মদ শাহ

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনেও মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল না। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল। মুহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী **নিজাম-উল্-মুলক** উপাধিধারী মীর কমরউদ্দীন চিন্‌কিলিচ খান সমরখন্দী নামক এক ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া একটি স্বাধীন সুবিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (১৭২৪ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম ছিলেন তাঁহারই বংশধর। অযোধ্যার শাসনকর্তা **সাদৎ খান ইরাণী** এবং বাঙ্গলার **সুবাদার আলীবর্দী খান**ও কার্যত স্বাধীন হইলেন।

স্বাধীন মুসলিম রাজ্য

রোহিলা আফঘানগণ আলী মুহম্মদ খান নামক একজন ধর্মান্তরিত হিন্দুর নেতৃত্বে স্বাধীন রোহিলখণ্ডের পত্তন করিল। পঞ্জাবের শিখ ও ভরতপুরে জাঠগণের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মধ্যভারতের রাজপুতগণও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইল। মারাঠাগণ মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর নেতৃত্বে বীরদর্পে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইল (১৩৩৭ খ্রীঃ)। ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। এই চরম দুর্দিনে পারস্য সুলতান

স্বাধীন রোহিলখণ্ড

মারাঠাগণের রাজ্য বিস্তার

নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল।

নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্যের সাফাবী বংশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আফঘানদের সঙ্গে যুদ্ধে নাদীর নামক একজন নীচবংশীয় সর্দার ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের বাদশাহ হুসেন সাফাবীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, ফলে নাদীর উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি নীচ বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে কটূক্তি ও শ্লেষবাক্য শুনিতে হইত। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রভুকে বঞ্চিত করিয়া তিনি স্বয়ং সিংহাসন লাভ করেন এবং উচ্চকুল-সম্ভবা সাফাবী বাদশাহজাদীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এক বৎসর পরে নাদীর শাহ ভারতবর্ষ অভিযানের সংকল্প করেন। যুদ্ধ করিতে হইলে একটা কারণ প্রদর্শন করা রাজনৈতিক শিষ্টাচার। নাদীর শাহ কারণ প্রদর্শন করিলেন যে, দিল্লীর দরবারে পারস্যের দূতের প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শিত হয় নাই ; রাজদূতের অপমান পরোক্ষে রাজার অপমান, অতএব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ রাজার কর্তব্য। সুতরাং নাদীর শাহ দিল্লী অভিযানে অগ্রসর হইলেন (১৭৩৮ খ্রীঃ)। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর (মূল্যবান হীরকখণ্ড) ও ধনরত্ন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কান্দাহারকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় মুঘলদের সঙ্গে পারস্যের সাফাবী রাজবংশের প্রায় একশত বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই যুদ্ধ ছিল মুঘল-সাফাবী গোষ্ঠীর বংশগত আভিজাত্যের সংগ্রাম।

নাদীর শাহ

ভারত আক্রমণের কারণ

নাদীর শাহ বিনা বাধায় গজনী, কাবুল ও লাহোর জয় করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ কর্ণাল নামক স্থানে তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কর্ণালের যুদ্ধে বাদশাহী ফৌজ পারসিকদের হস্তে পরাস্ত হইল। পরাজিত মুহম্মদ শাহ বিজয়ী নাদীর শাহের সহিত একসঙ্গে দিল্লী প্রবেশ করিলেন। কয়েক দিন পরে দিল্লীতে নাদীর শাহের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয় এবং দিল্লীর নাগরিকগণ প্রায় নয় শত পারসিক সৈন্যকে হত্যা করে। ক্রোধান্ধ নাদীর শাহ তাঁহার সেনাবাহিনীকে দিল্লীর অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের আদেশ দিলেন। ফলে দিল্লীর প্রায় সকল গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অতি নৃশংস ভাবে লক্ষাধিক নরনারীর

কর্ণালের যুদ্ধ

মুহম্মদ শাহের বশ্যতা স্বীকার

দিল্লীর নির্মম হত্যাকাণ্ড

হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। অবশেষে মুহম্মদ শাহের অনুনয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্থগিত হয়। নাদীর শাহ প্রায় দুই মাস দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। প্রায় পনর কোটি নগদ টাকা, পঞ্চাশ কোটি টাকার মণি-মাণিক্য ও অলংকার, শাহজাহানের ভুবনবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ড কোহিনূর প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া নাদীর শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযানের ফলে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। বাদশাহ উপাধিধারী মুহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি সকলই অন্তর্হিত হইল। এই আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইল। বিস্মিত জগৎ প্রথম বুঝিতে পারিল, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" অসহায় পুত্তলিকা মাত্র ; মুঘল সাম্রাজ্যের বাহিরের দীপ্তি ভিতরের অসারতাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে নাই। নাদীর শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নহে, শক্তিহীনতার সুস্পষ্ট পরিচয় মাত্র।

নাদীর শাহের দিল্লী লুণ্ঠন ও প্রত্যাবর্তন

আক্রমণের ফলাফল

আহম্মদ শাহ দুররাণীর ভারত আক্রমণ : ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নাদীর শাহ নিহত হইলে তাঁহার আফঘান সেনাপতি আহম্মদ শাহ দুররাণী পারস্যের পূর্বভাগে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন আফঘানিস্থানের "আবদালী" বংশসম্ভূত এবং আফঘানিস্থান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি "দুর্-ই-দওরান" অর্থাৎ (দুর—রত্ন, দওরান—যুগ) যুগরত্ন উপাধি ধারণ করেন। এইজন্যই তাঁহার বংশ "দুররাণী" বংশ নামে পরিচিত। নাদীর শাহের ভারত আক্রমণের ফলে মুঘল রাজশক্তির দুর্বলতা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি আফঘানিস্থানের অধিপতি রূপে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগে আফঘানিস্থান হইতে মামুদ গজনভী এবং মুহম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; শেষভাগে আবার আহম্মদ শাহ দুররাণী উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

দুররাণীর পরিচয়

বহুবার ভারত আক্রমণ

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের রাজত্বের শেষ ভাগে মারাঠা-উৎপীড়িত মুসলমানগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আহম্মদ শাহ দুররাণী পঞ্জাব আক্রমণ করেন। কিন্তু যুবরাজ আহম্মদ শাহের হস্তে তাঁহার পরাজয় হয়। পরবর্তী বাদশাহ আহম্মদ শাহের সময়ে তিনি দুইবার ভারত আক্রমণ (১৭৪৮-১৭৪৯ খ্রীঃ) করিয়া কাশ্মীর ও পঞ্জাব অধিকার করেন। দুররাণীর চতুর্থ বার ভারত অভিযান কালে দ্বিতীয় আলমগীর ছিলেন দিল্লীর বাদশাহ। এই অভিযানে দিল্লী ও মথুরায় হত্যাকাণ্ড এবং লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল (১৭৫৬ খ্রীঃ)। মারাঠাগণ পঞ্জাব অধিকার করিলে দুররাণী পঞ্চম বার ভারতে প্রবেশ করিয়া **পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** (১৭৬১ খ্রীঃ) মারাঠা শক্তিকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। পঞ্জাবের শিখ দমনের উদ্দেশ্যে তিনি আরও চারিবার পঞ্জাবে অভিযান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আহম্মদ শাহ দুররাণীর মৃত্যুর পর দুররাণী বংশের পতন আরম্ভ হয়। পঞ্জাবে শিখশক্তি তাঁহার বংশধরকে উপেক্ষা করিয়া পঞ্জাবে প্রকৃত পক্ষে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিল।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রীঃ)

মুঘল সাম্রাজ্যের কঙ্কাল (১৭৪৮-১৮৫৮ খ্রীঃ) ঃ মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর (১৭৪৮ খ্রীঃ) পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ নির্বিঘ্নেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অল্পকাল স্থায়ী রাজত্বকালে আফঘানিস্থানের আধিপতি আহম্মদ শাহ দুররাণী দুই বার ভারত অভিযান করেন। ফলে পঞ্জাব ও মুলতান বাদশাহের হস্তচ্যুত হইল। নিজাম-উল-মুল্কের পৌত্র গাজীউদ্দীন ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া চক্ষু অন্ধ করিয়া দিলেন। জাঁহাদার শাহের পুত্র **দ্বিতীয় আলমগীর** সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষ চতুর্থ বার আহম্মদ শাহ দুররাণী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং দিল্লী ও মথুরায় হত্যা-কাণ্ড ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হয় (১৭৫৬ খ্রীঃ)। ইহার পর বৎসরই (১৭৫৭ খ্রীঃ) পলাশীর যুদ্ধের ফলে ও রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বাঙ্গলাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

আহম্মদ শাহ

দ্বিতীয় আলমগীর আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পুত্র **দ্বিতীয় শাহ আলম** দিল্লীর বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত হইলেন (১৭৫৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রিত রূপে এলাহাবাদে অবস্থান করেন। তাঁহার নিকট হইতেই রায় দুর্লভের চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ করে (১৭৬৫ খ্রীঃ)। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি মারাঠাদের আশ্রয়ে দিল্লীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে রোহিল-খণ্ডের আমীর গোলাম কাদীর দিল্লী আক্রমণ করিয়া শাহ আলমকে বন্দী করেন এবং জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলে দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজ আশ্রয়ে বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় শাহ আলম

শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **দ্বিতীয় আকবর** (১৮০৬-১৮৩৭খ্রীঃ) এবং পৌত্র **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ** (১৮৩৭-১৮৫৮ খ্রীঃ) ইংরেজের বৃত্তিভোগী বাদশাহ হইলেন। দ্বিতীয় আকবরই বাদশাহের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহের জন্য

রাজা রামমোহন রায়কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিগণ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহে যোগদানের অপরাধে তিনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রেঙ্গুণে নির্বাসিত হইলেন এবং সেইখানেই দিল্লীর শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহের দেহাবসান হইল (১৮৬২ খ্রীঃ)।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের রাজত্বকালে সুদৃঢ় হইয়া উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে উহা ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর জল সিঞ্চন করিয়াছিলেন, শাহজাহান ফলভোগ করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব উহার মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন ইহার পতনের অন্যতম কারণ। সে যুগে দ্রুত যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের নানাবিধ অসুবিধা ছিল। কোন দূরবর্তী প্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হইতে যথা সময়ে সৈন্য প্রেরণ করিয়া উহার দমন সকল সময় সহজ বা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ক্ষমতার উৎস না হইয়া দুর্বলতার কারণ হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিশালতা

সুলতানী আমলের শাসনের ন্যায় মুঘলশাসনও ছিল সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসকগণের সহিত প্রজাসাধারণের কোন হৃদয়ের বন্ধন ছিল না। জাতীয় চেতনার সঞ্চার না হওয়ায় জনসাধারণের রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয় নাই। এইজন্য বিশাল সাম্রাজ্যের ঐক্য প্রতিষ্ঠা একরকম অসম্ভব ছিল। সম্মিলিত ভারতবাসীর জাতীয় প্রীতির উপর আকবর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণের (বিশেষত আওরঙ্গজেবের) অনুদার নীতি ও হিন্দুবিদ্বেষের ফলে সেই ভিত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িল।

সামরিক শক্তির উপর নির্ভরতা

জাতীয়বোধের অভাব.

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র, অনুদার ধর্মনীতি ও সুদীর্ঘ জীবন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আংশিকরূপে দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্ততার জন্য রাজ্যের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের কর্মস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁহার অনুদার ধর্মনীতির ফলে রাজপুত, জাঠ, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি শক্তির অভ্যুদয় হয় এবং তাহাদের বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়ে। আওরঙ্গজেবের ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে বহু সৈন্য নাশ ও অগণিত অর্থব্যয় এবং দীর্ঘকাল সম্রাটের

পতনের জন্য আওরঙ্গজেবের দায়িত্ব : সন্দিগ্ধচিত্ততা, পরধর্মদ্বেষিতা

অনুপস্থিতিতে উত্তর-ভারতের শাসন প্রণালীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে।

মুঘল সম্রাটগণের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী শাসকের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য তাঁহাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটের উপর অক্ষুণ্ণ ছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তের বৎসরের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সাতটি ভীষণ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। একমাত্র বাহাদুর শাহ ব্যতীত আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক বুদ্ধিবিহীন, বিলাসপরায়ণ, অক্ষম ও মন্ত্রীদের হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহাদের পক্ষে নবজাগ্রত হিন্দুশক্তি অথবা বিদেশী বণিকদিগকে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল।

আওরঙ্গজেবের পরবর্তী বাদশাহদের দুর্বলতা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল দরবারের ওমরাহগণ ছিলেন ষড়যন্ত্রপ্রিয় ও স্বার্থান্বেষী। সাম্রাজ্যের কল্যাণ অপেক্ষা স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারা বেশী সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও যুদ্ধ নিত্যকার ব্যাপার ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল-মুল্‌ক, গাজীউদ্দীন প্রভৃতি আমীরগণ অনেকাংশে দায়ী ছিলেন সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিগণের স্বার্থপরতা

বৈদেশিক আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হইয়াছিল। নাদীর শাহ এবং আহম্মদ শাহ দুররাণীর আক্রমণ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মুঘল সামরিক শক্তি দুর্বল ও অন্তঃসারহীন। শাহজাহানের সময়েই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিযানের ব্যর্থতায় মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ক্রমবর্ধমান সামরিক দুর্বলতা সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের ভারত আগমন, বসতি ও বাণিজ্য বিস্তারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মুঘলগণ বুঝিতে পারে নাই। সর্বশেষে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী জাতি ভারতবর্ষে নানা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া দেশের রাজনৈতিক ভিত্তিমূল নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

বৈদেশিক আক্রমণ

মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা

মুঘল সম্রাটগণের সামরিক শক্তির উৎস ছিল স্থলবাহিনী। বহুদূর বিস্তৃত ও অরক্ষিত উপকূলভাগ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা উপযুক্ত নৌ-বহর নির্মাণ করেন নাই। ফলে তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য বণিকদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সক্ষম হন নাই।

নৌ-বলের অভাব

সংক্ষেপে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ : সাম্রাজ্যের বিশালতা, সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরতা, আওরঙ্গজেবের রাজনীতি ও ধর্মনীতি এবং দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল স্থিতি, দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্যদ্বয় ধ্বংস,

পরবর্তী দুর্বল মুঘল সম্রাটগণের বিলাসিতা, অক্ষমতা ও আত্মকলহ, অপরিবর্তনীয় মুঘল যুদ্ধ-নীতি, নৌ-বলের অভাব, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা লাভ ও প্রাদেশিক রাজ্যস্থাপন, হিন্দু-জাগরণ, মারাঠা, রাজপুত, শিখ, জাঠ প্রভৃতি জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ, বিদেশী নাদীর শাহ ও আহম্মদ শাহ দুর্রাণীর আক্রমণ। সর্বশেষে ইংরেজ জাতি ভারতে বাণিজ্য-বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে ঘটনা বিপর্যয়ে ব্রিটিশ জাতি মুঘল শাসনকেন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হইল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল সাম্রাজ্যের দান : মুঘলবংশ সগৌরবে ১৫২৬ হইতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত একাশি বৎসর ভারতে রাজত্ব করে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শূরবংশ মাত্র পনর বৎসরের জন্য একটি ছেদচিহ্ন রচনা করিয়াছিল। এই স্বল্পপরিসর সময় নিরর্থক হয় নাই। কারণ শের শাহ তাঁহার কেন্দ্রীয় যুগোপযোগী ধর্মনিরপেক্ষ শাসন, প্রজাহিতকর সংস্থান এবং রাজস্বব্যবস্থা দ্বারা সম্রাট আকবরের জন্য একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করিয়াছিলেন। ১৭০৭ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল বংশের পতনের যুগ; তারপর ১৭৬৫ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের কঙ্কাল বহনের যুগ।

আকবরের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শের শাহের প্রভাব

মুসলিম-ভারতের কোন রাজবংশ এত দীর্ঘকাল একচ্ছত্র রাজত্ব করেন নাই। বাবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছয় জন ক্ষমতাশালী বাদশাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিদেশী ও ভিন্নধর্মী হওয়া সত্ত্বেও মুঘল বংশ ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেশাতিরিক্ত স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা আরব, পারস্য ও সমরখন্দের প্রতি সতৃষ্ণ এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। ভারতের সম্পদ বিদেশে প্রেরণ করিয়া তাঁহারা দেশের রক্ত শোষণ করেন নাই। তাঁহারা বিশ্বজনীন ইসলামের স্বপ্নও দেখেন নাই। মুসলমান হইলেও রুমের তুর্কী সুলতান এবং পারস্যের বাদশাহকে মুঘল বংশ হিন্দুস্থানের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিল।

স্বদেশ জ্ঞানে মুঘল বাদশাহদের ভারত শাসন

আওরঙ্গজেব ভিন্ন প্রায় সকল সম্রাটই ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দেশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রজা হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হিন্দুর ন্যূনাধিক প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদার রূপে, সর্বোচ্চ সেনাপতি বা মনসবদার রূপে অথবা রাজস্ব ব্যবস্থাপক রূপে নিযুক্ত হইতেন। বিবাহসূত্রে বহু রাজপুত পরিবারের সঙ্গে মুঘল পরিবার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। অনেক হিন্দু পরিবার দরবারে সম্মান লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর সকল মুসলমান রাজ্যেই অ-মুসলমানের স্থান অতি সংকীর্ণ; অ-মুসলমানকে ধর্মের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু

রাষ্ট্র শাসনে হিন্দুর প্রভাব

মুঘল রাজত্বে হিন্দুগণ অন্য মুসলমান রাজ্যের তুলনায় অনেকটা সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ১৫৬১ হইতে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুগণ জিজিয়া কর, তীর্থস্নান কর ও কেশ-মুণ্ডন কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। হিন্দুগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে উপভোগ করিত; তাহারা ধর্মানুষ্ঠান, মন্দির নির্মাণ ও শাস্ত্রালোচনার নানাবিধ সুযোগ লাভ করিত। বিচার ও ধর্ম ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে হিন্দুগণও উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারিত। আকবর ও আওরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে মুঘল সাম্রাজ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে প্রমাণিত হয় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য সম্ভব ও সুফলপ্রদ।

মুঘল রাজত্বে হিন্দুর ব্যক্তি স্বাধীনতা

মুঘল রাজ্যে নানাদিক দিয়া সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্বে আসাম, পশ্চিমে কাবুল, দক্ষিণে রামেশ্বর, উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এক সম্রাট, এক রাষ্ট্র, এক শাসন, এক বিধান, এক রাষ্ট্রভাষা, এক মুদ্রা এবং এক মিলিত সংস্কৃতি ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সূচনা করিত।

সর্বভারতীয় ঐক্য

মুঘল রাজত্বকাল সমন্বয়ের যুগ। মুঘল যুগে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথেষ্ট সমন্বয় ও উন্নতি হইয়াছিল। মুঘল বংশে নানা জাতির রক্ত ও সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া অ-মুসলমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরব জাতি ভারতবর্ষ জয় করিলে হয়ত ভারতও মিশর কিংবা পারস্যের মত সম্পূর্ণভাবে 'আরবায়িত' হইত এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ভাষা, জাতীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমন্বয়

মুঘল সাম্রাজ্যে অনেক দোষও ছিল। মোল্লা ও ধর্মান্ধ মুসলিমগণ নানাদিক দিয়া ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিত। মুঘল রাজকর্মচারিগণ প্রায়ই সম্রাটগণের উদার নীতির মর্ম বুঝিতে পারিতেন না। সেইজন্য সর্বক্ষেত্রে হিন্দুগণের জ্ঞানবিকাশের সুযোগ হয় নাই। তবুও মুঘল যুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রাদেশিক ভাষা, শিল্প, স্থাপত্য, সংগীত ও চারুকলা মোটের উপর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হিন্দু যে কেবল "মুসলমানের জন্য জল তুলিত এবং কাঠ কাটিত," তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

মুঘল যুগে প্রাদেশিক ভাষা ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি

আত্মীয়বিরোধ, সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র, হত্যা ও অনাচার মুঘল রাজ্যে অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল। সম্রাটের একাধিক পুত্র-সন্তানের জন্ম অভিশাপ ও অকল্যাণ বলিয়া বিবেচিত হইত। মুঘল রাজান্তঃপুরিকাগণ প্রায়ই অবিবাহিতা থাকিয়া রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রে জটিলতা সৃষ্টি করিতেন। মুঘল রাজ-পরিবারের

মুঘল পরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব

বিলাস হিন্দু-মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার ফলে সমাজে অনেক ক্লেদ সৃষ্টি হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেবের অত্যধিক ধর্মবিশ্বাস, অনুদার নীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ পূর্বতন যুগের বহু শুভ প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের নিষ্ফলতা পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ শাসনে একটা মূল্যবান উপদেশ।

অনুশীলনী

১। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে নাদীর শাহের আক্রমণকাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

(Trace the history of decomposition of Mughal Empire from Aurangjeb to the invasions of Nadir Shah.)

২। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি ?

(What were the causes of the fall of the Mughal Empire ?)

৩। মুঘল সম্রাজ্যের উপর অন্তঃপুরিকাদের প্রভাব ও পরিণতি আলোচনা কর।

(What was the nature and extent of feminine influence on the Mughal Empire ?)

৪। মুঘল পিতা ছিলেন আদর্শ, মুঘল রাজপুত্র ছিলেন জঘন্য—এই বাক্যের যথার্থ্য নির্ণয় কর।

(Mughal fathers were ideal, Mughal sons were criminals. Do you agree ?)

৫। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল রাজবংশের দানের রূপ বর্ণনা কর।

(What were the contributions of the Mughals to the history of India ?)

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ (খ) আহম্মদ শাহ দুররাণীর অভিযান।

(Write short notes on : (a) Invasions of Nadir Shah. (b) Invasions of Ahmad Shah Durrani.)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুঘলযুগে ভারতবর্ষ

অধ্যায় পরিচয়ঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যেমন মৌর্যযুগ এবং গুপ্ত যুগ, মধ্যযুগের ইতিহাসেও তেমনি মুঘলযুগে হিন্দুর বিরুদ্ধে উষ্মা সত্ত্বেও জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-কলায়, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে—জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মনীষার অপূর্ব বিকাশ সাধন হইয়াছিল।

বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণীঃ মুঘলযুগে বহু বিদেশী জ্ঞানী-গুণী, রাজদূত, বণিক, পর্যটক ও ধর্মপ্রচারক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণে মুঘলযুগের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদেশী ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইংরাজ পর্যটক রাল্‌ফ ফিচ, হকিন্স এবং স্যার টমাস রো, ওলন্দাজ পেলসায়ার্ত, ফরাসী টেভারনিয়ে, বার্ণিয়ে এবং ইতালীয় মানুচ্চি বিখ্যাত।

রাল্‌ফ ফিচ (১৫৮৫ খ্রীঃ)ঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে রাল্‌ফ ফিচ ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী নগর দুইটিই ছিল তখন লণ্ডন হইতে বৃহত্তর। বাঙ্গলার বাখরগঞ্জে অবস্থিত বাকলা একটি সুন্দর শহর ছিল। উহার বিশাল অট্টালিকা ও সুপ্রশস্ত রাজপথ দর্শন করিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন।

এই সময় রুডলফ্ একাভিবা, ফ্রান্সিস জেভিয়ার এবং মনসারেট খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সম্রাট আকবরের অনুগ্রহ লাভ করেন। রুডলফ্ এবং মনসারেটের বিবরণে সমসাময়িক মুঘল যুগের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য বর্ণিত আছে। জেভিয়ার মুঘল রাজনীতিও আলোচনা করিয়াছেন।

টেভার্ণিয়ে (১৬৪১-১৬৬৭ খ্রীঃ)ঃ ইনি ছিলেন ফরাসী দেশীয় জহরৎ ব্যবসায়ী। মুঘল রাজসভায় ঐশ্বর্য, আড়ম্বর এবং ময়ূর সিংহাসন দর্শনে তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, অর্থের আদান-প্রদান, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

বার্ণিয়ে (১৬৫৭-১৬৬৬ খ্রীঃ)ঃ বার্ণিয়ে ছিলেন একজন ফরাসী চিকিৎসক। তিনি আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, আওরঙ্গজেব ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতি-বিদ্। মুঘল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ছিল অতুলনীয়। মুঘল যুগে প্রাদেশিক

শাসনকর্তাগণ প্রায় সকলেই ছিলেন অত্যাচারী। বাঙ্গলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল। বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও চিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভারতের বাহিরেও রপ্তানি হইত। বাঙ্গলার ধান্য, চিনি, তুলা, মসলিন ও রেশম বিখ্যাত ছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, শায়েস্তা খানের সময়ে বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। বিদেশী বণিকগণ বলিত—"বাঙ্গলায় প্রবেশের একশত পথ আছে, কিন্তু বহির্গমনের একটি মাত্র পথ" অর্থাৎ বলপূর্বক বিতাড়িত না হইলে কেহ বাঙ্গলা ত্যাগ করে না। বাঙ্গলা দেশে অতুলনীয় স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি ছিল। মুঘল যুগে বাঙ্গলা দেশ সত্যই 'সোনার বাঙ্গলা' ছিল।

মানুচ্চি (১৬৪০-১৬৫৩ খ্রীঃ): ইতালীর মানুচ্চি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রথমে তিনি ছিলেন দারা শিকোর একজন গোলন্দাজ কর্মচারী, পরে চিকিৎসকের ব্যবসা অবলম্বন করেন। তাঁহার মতে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। মানুচ্চি রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, কৃষকগণের দুরবস্থা এবং মুঘল অন্তঃপুরের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মানুচ্চি পরিবেশিত মুঘল অন্তঃপুরেব কুৎসা গ্লানিকর।

মুঘল যুগে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ: মুঘল যুগে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ধর্মগতভাবে মুঘল যুগে ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান বিভাগ ছিল—হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই বিভাগের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার তিনটি করিয়া শ্রেণী ছিল। বাদশাহ ও বাদশাহের নিজ পরিবার ছিল সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন বাদশাহের আত্মীয়বর্গ ও আমীরগণ। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে তুর্ক, তাতার, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই ছিলেন মনসব, জায়গির বা উচ্চ রাজপদের অধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন মহাজন (শ্রেষ্ঠী), বণিক, গণক, লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, গ্রন্থকার প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী অথবা ধনী ব্যক্তি। এই শ্রেণীর লোকের বংশগত কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। ব্যক্তিগত যোগ্যতাই ছিল এই শ্রেণীর উন্নতির সোপান। এই দুই শ্রেণী ভিন্ন স-ভূমি অথবা ভূমিহীন চাষী, শ্রমিক, ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ী, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, জোলা প্রভৃতি শিল্পিগোষ্ঠীর সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। দাস শ্রেণী সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বিদেশ হইতেও দাসদাসী আমদানি করা হইত।

জীবনযাত্রার মান: ভারতবর্ষের ধনরত্ন ছিল প্রচুর। কিন্তু এই ধনরাশি জনসাধারণের হস্তে ছিল না। ধনী ছিল অত্যন্ত ধনী, দরিদ্র ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। প্রাসাদতুল্য বাসগৃহ, বহুমূল্য বসনভূষণ, আহারে বিলাস ও বিহারে আড়ম্বর ছিল মুঘলযুগের বৈশিষ্ট্য। মুঘলযুগে মৃত কর্মচারীদের সম্পত্তি ও জায়গির রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। উচ্চ রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল না। মুঘল আমীরগণ বিলাসব্যসন, বসনভূষণ, আহার-বিহার, প্রাসাদ, মসজিদ, সরাই

নির্মাণে ও নৃত্যগীতে যথাসর্বস্ব ব্যয় করিতেন এবং স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিতেন। অন্তঃপুরে অসংখ্য মহিলার অবস্থিতি মুঘল বাদশাহ ও আমীরদের আভিজাত্যের নিদর্শন ছিল। দাসদাসীর সংখ্যা আমীরদের সম্মানের মানদণ্ড ছিল। হিন্দু অভিজাতবর্গও মুসলমান আমীরদের মত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেন না। তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেন। অনেকটা এই কারণেই তাঁহারা মিতব্যয়ীও ছিলেন। অনেক সময় তাঁহারা আমীরদের অত্যাচারের ভয়ে যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়াও দরিদ্রের মত জীবন যাপন করিতেন। বৈদেশিক বিবরণীতে দেখা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাহারা সাধারণত মাটির দেওয়াল ঘেরা তাল, বাঁশ অথবা খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে বাস করিত। গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লোক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শয়ন করিত। দরিদ্রের কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড ভিন্ন অন্য কোন পরিচ্ছদ ছিল না।

সামাজিক আচার ব্যবহার ঃ হিন্দুর সমাজ বন্ধন দৃঢ় থাকায় প্রকাশ্য ভাবে কেহ হিন্দু সমাজের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিত না; কারণ, সমাজের বিধান অমান্য করিলে সমাজচ্যুতির ভয় ছিল। মুসলমান আগমনের পরে ধর্মান্তর গ্রহণ প্রতিরোধের জন্য হিন্দুগণ সমাজের বন্ধন যথেষ্ট দৃঢ় করিয়াছিলেন। অবগুণ্ঠন এবং অবরোধ প্রথা হিন্দু সমাজে অজ্ঞাত না থাকিলেও মুসলমান আগমনের পরে উহার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। ভারতে সাধারণ ভাবে দাসপ্রথা প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত থাকিলেও দাস সংগ্রহ এবং দাসদাসী ক্রয়বিক্রয় মুসলমান আগমনের পরে মুসলমান ও হিন্দু সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া উঠে। মুঘল যুগে উচ্চ সমাজে বিবাহ, জন্মদিন, সিংহাসন অরোহণের দিন, ঈদ, মহরম, হোলি প্রভৃতি উৎসব নৃত্যগীত ও ভোজন সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। উৎসবের দিনে আমীরগণ বাদশাহকে উপহার বা নজরানা দিতেন। বাদশাহও মর্যাদা অনুসারে আমীরগণকে উপাধি, তরবারি ও ভূষণ উপহার দিতেন। হিন্দুর মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা এবং কুলীনের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর সতীদাহ নিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মারাঠা ও জাঠদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীদের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। অনেক বাদশাহ ও আমীর হিন্দু নারী, বিশেষতঃ রাজপুত নারী বিবাহ করিয়াছিলেন। হিন্দু অন্তঃপুরিকার প্রভাবে মুসলমান সমাজে বিবাহ, বসন-ভূষণ প্রভৃতি ব্যাপারে নানাপ্রকার হিন্দু প্রথা প্রচলিত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক রেখাবিদের উপর বিশ্বাস ছিল। মুঘল পরিবারের প্রত্যেক জাতকের কোষ্ঠি রচনা করান হইত, গণকেরও যথেষ্ট সমাদর ছিল।

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য ঃ ভোগই ছিল মুঘলগণের জীবন-

যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। মুঘল বাদশাহ, বেগম, আমীর সকলেই ভোগবিলাসী ও সৌখীন ছিলেন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা হয় দেশে উৎপন্ন হইত, নতুবা বিদেশ হইতে আসিত। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সরকারী কারখানা ছিল। সম্রাট আকবরের সময় সকল কারখানার বিভিন্ন বিভাগে দুই সহস্র কারিগর কাজ করিত। বাদশাহের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই এই সকল কারখানায় প্রস্তুত হইত। আবুল ফজল বলেন, আকবর স্বয়ং সপ্তাহে একবার কারখানা পরিদর্শন করিতেন, শিল্পিদিগকে উৎসাহিত করিতেন এবং সুদক্ষ কারিগরকে পুরস্কৃত করিতেন। প্রত্যেকটি সরকারী কারখানা পরিদর্শনের জন্য একজন দারোগা বা অধিকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। আকবর স্বয়ং একটি কামান নির্মাণ করেন ও বন্দুকের কলকব্জার উন্নতি সাধন করেন।

শিল্প-কারখানা

মুঘল বাদশাহগণ কখনও কুটিরশিল্প নষ্ট করেন নাই। হিন্দুশিল্পী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক জাতিভেদ ন্যূনাধিক পরিমাণে রহিয়া গেল। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বাঙ্গলার মসলিন ও রেশম, আগ্রার রঙীন বস্ত্র, কাশ্মীরের শাল এবং লাহোরের কম্বল বিখ্যাত ছিল। বিদরের মীনার কাজ, গজদন্তের সূক্ষ্ম কাজ, উড়িষ্যার রূপালী জরি এবং বারাণসীর সোনালী জরীর কাজেরও খ্যাতি ছিল। বারুদ তৈয়ারী করিবার জন্য ইওরোপে ভারতে উৎপন্ন গন্ধকের বিশেষ চাহিদা ছিল।

কুটিরশিল্প

মুঘলযুগে ঐশ্বর্যের জন্য দেশ-বিদেশে ভারতবর্ষের খ্যাতি ছিল। স্থলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কান্দাহারের এবং উত্তর-পূর্বে তিব্বত ও নেপালের পথে বাণিজ্য চলাচল ছিল। জলপথে পশ্চিমে পারস্যোপসাগর ও আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের পথে পণ্য বিনিময় হইত। রাজধানী এবং প্রধান নগরগুলি রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। আগ্রা ও দিল্লীর সহিত লাহোর, কান্দাহার, আহম্মদাবাদ, বুরহানপুর, সুরাট, লাহরি বন্দর (সিন্ধু), ভৃগুকচ্ছ, জৌনপুর, পাটনা এবং সাঁতগা (বাঙ্গলা দেশ) সংযুক্ত ছিল। বন্দর শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক এবং সীমান্ত শুল্ক সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠিগণ হুন্ডীর সাহায্যে দূরাঞ্চলে অর্থ প্রেরণ করিতেন। প্রধানত স্বর্ণকারগণ মহাজনী ব্যবসা করিয়া জীবনযাপন করিত।

বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্য কেন্দ্র

মুঘল সম্রাট, আমীর, এমন কি মুঘল রাজান্তঃপুরিকাগণও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। আকবরের মাতা হামিদাবানু বেগম এবং জাহাঙ্গীরের মহিষী নূরজাহানের পণ্যদ্রব্য স্থলপথে এবং জলপথে আমদানি ও রপ্তানি হইত; বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্য সম্রাটের প্রয়োজনে ক্রীত হওয়ার পরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য আসিত। দ্রব্যমূল্য সম্রাটের কর্মচারিগণই স্থির করিতেন।

মুঘল-পরিবারের ব্যবসা

এই সময়ে ইওরোপ হইতে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিক ভারতে বাণিজ্যের জন্য ঘন ঘন যাতায়াত করিত। ভারতীয় পণ্যের বিনিময়ে ইওরোপ হইতে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ভারতে আসিত। ইওরোপীয় বণিক ভারতের বস্ত্র, সুগন্ধি, মসলা, আভ্রক, রঙ, অহিফেন, লৌহ, শর্করা, নীল, গন্ধক, লবণ ইত্যাদির ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিত।

ইওরোপের সহিত বাণিজ্য

ভারতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য ছিল বহু প্রকার এবং উহা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। নগদ মূল্য অপেক্ষা বিনিময়-প্রথা অধিক প্রচলিত ছিল। শ্রমিকের পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প ছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, শায়েস্তা খানের সময় বাঙ্গলা দেশে জীবনযাত্রার সামগ্রী অত্যন্ত সুলভ ছিল। পঁচিশ গজ বস্ত্রের মূল্য ছিল এক টাকা। বাখরগঞ্জে আট আনার মৎস্যে এক শত লোকের ভূরিভোজন সম্পন্ন হইত। এক টাকায় চারিটি বড় মেষ বা আটটি ছাগল বিক্রীত হইত।

দ্রব্যমূল্য

মুঘল স্থাপত্য ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পূর্ববর্তী মুঘল বাদশাহগণ সকলেই সৌন্দর্যপ্রিয়, শিল্পানুরাগী এবং শিল্পস্রষ্টা ছিলেন। এই শিল্পধারা তৈমুরীয় বা মুঘল শিল্পরীতি নামে পরিচিত। নগর, মসজিদ এবং সমাধি পরিকল্পনায় ও নির্মাণে তৈমুরবংশের অসীম উৎসাহ ছিল দিল্লীতে হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজী বেগম নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি, সেকেন্দ্রার আকবরের স্বয়ং পরিকল্পিত সমাধি,

হুমায়ুনের সমাধি— দিল্লী

আগ্রায় নূরজাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁহার পিতা ইতিমাদ্‌উদ্দৌলার সমাধি, লাহোরের অদূরে শাহদরায় জাহাঙ্গীরের স্বয়ং পরিকল্পিত সমাধি স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। বাবর আগ্রায় একটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন। দিল্লীতে হুমায়ুন নির্মিত দীন-ই-পানাহ্ (ধর্মের আশ্রয়) প্রাসাদ শের শাহ ধ্বংস করিয়া শের মণ্ডল নির্মাণ করেন। আকবর দিল্লী, আগ্রা ও লাহোরের প্রাসাদদুর্গ এবং সিক্রীর প্রাসাদপুরী নির্মাণ করেন।
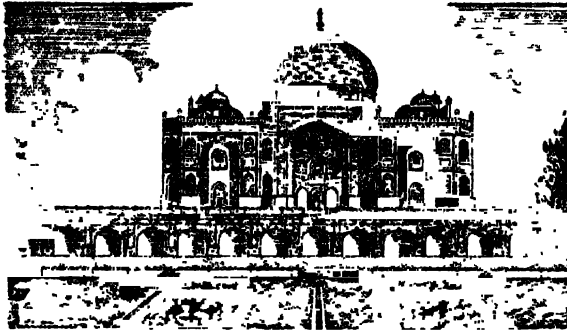
ফতেপুর সিক্রী ঃ আকবর বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার পুত্র সলিম ফতেপুর নিবাসী শেখ সলিম চিস্‌তীর আশীর্বাদলব্ধ সন্তান। সুতরাং ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিস্‌তীর সম্মানার্থে ফতেপুর সিক্রীতে একটি নূতন নগর নির্মাণ

করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়। ফতেপুরের স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম শিল্পাদর্শ ও শিল্পরীতির পূর্ণ মিলন হইয়াছে। এই ফতেপুরেই নির্মিত হইয়াছিল সলিম চিস্‌তীর শুক্তি-খচিত অনুপম সমাধি, জাম-ই-মসজিদ, দিওয়ান-ই-খাস, ইবাদৎ খানা (প্রার্থনা গৃহ), হিরণ মিনার, পাঁচ মহল, বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজা, হিন্দুস্থাপত্য অনুকরণে যোধপুরী মহল, বীরবলের সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত প্রাসাদ। প্রায় ষোল বৎসর পরে এই স্বপ্নময় প্রাসাদপুরী পরিত্যক্ত হয়। আবুল ফজল বলেন, আকবরের স্থাপত্য ছিল তাঁহার বিরাট মনের প্রতিচ্ছবি। আওরঙ্গজেবের অতিধার্মিকতা সুন্দরের প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হইয়া মুঘল স্থাপত্যের উৎসমুখ নির্মমভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।
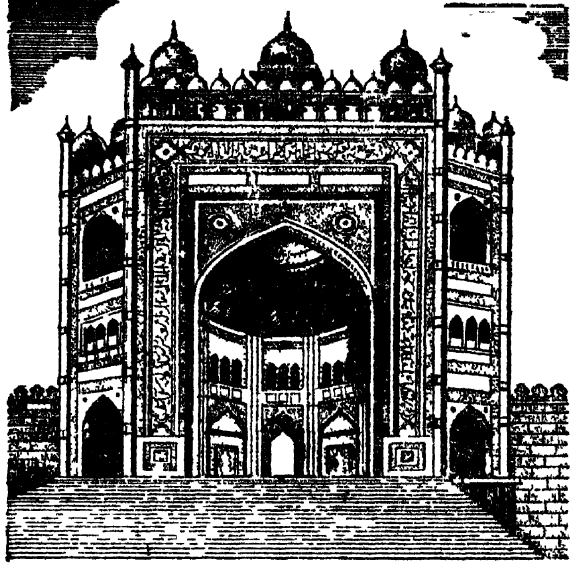
বুলন্দ-দরওয়াজা

জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব প্রত্যেকেই **আগ্রা দুর্গ** ও **দিল্লী দুর্গে** (লাল কেল্লা) বিভিন্ন মহল নির্মাণ করেন। শাহজাহান দিল্লী নগরীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া উহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'শাহজাহানাবাদ'। শাহজাহান কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রার দুর্গে নির্মিত দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, শিশমহল (নৃত্য গৃহ), আঙ্গুরী বাগ প্রভৃতির শিল্প সৌন্দর্য অপরূপ। শিল্প সাধনায় উৎফুল্ল শাহজাহান লাল কেল্লার দিওয়ান-ই-খাসে উৎকীর্ণ করিলেন—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে তাহা এইখানে।" লাহোর দুর্গেও শাহজাহান দিওয়ান-ই-খাস, দিওয়ান-ই-আম, নহবৎখানা প্রভৃতি নির্মাণ
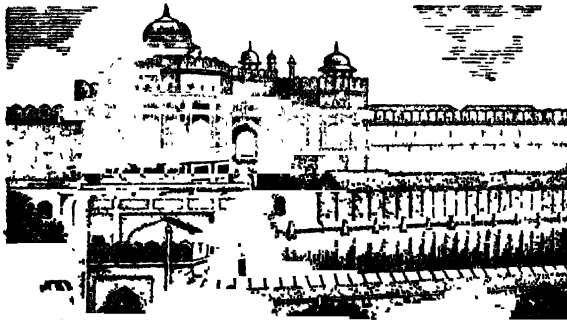
আগ্রা দুর্গ

করেন। লাহোরের প্রাসাদেও ছিল বিখ্যাত মোতিমহল, হীরামহল, রঙমহল। রঙমহলে চলিত ঋতুতে ঋতুতে ফুলের উৎসব, প্রতি সন্ধ্যায় আতস বাজীর খেলা। শাহজাহান গর্ব করিতেন, তিনি মর্ত্যে স্বর্গ রচনা করিয়াছেন।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন মুঘলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরসিক ; শিল্প সাধনা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। শিল্পস্বপ্নে বিভোর হইয়াই শাহজাহান সাতটি সিংহাসনের পরিকল্পনা করেন। ইহার মধ্যে ময়ূরসিংহাসন বিখ্যাত। শিল্পী বেবাদল খান সাত বৎসর (১৬২৮ ১৬৩৫ খ্রীঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই ময়ূরসিংহাসন নির্মাণ সমাপ্ত করেন। ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ কবিতে ব্যয় হইয়াছিল এক কোটি মুদ্রা।
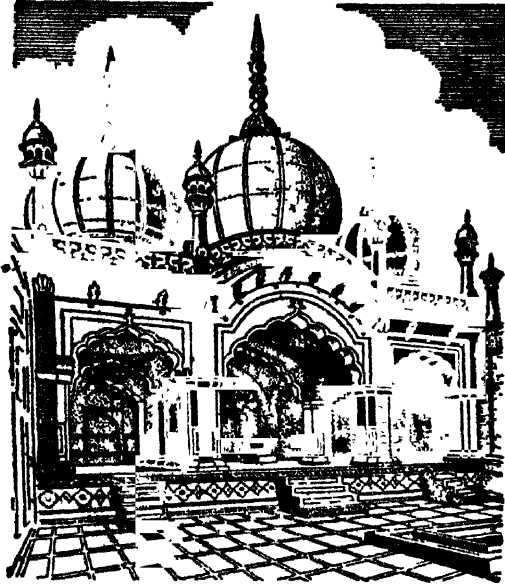
মোতি মসজিদ—দিল্লী দুর্গ

জাম-ই-মসজিদ ঃ মুঘলযুগে জনসাধাবণের জন্য বহু জাম-ই-মসজিদ নির্মিত হয়। বাবর, আকবর এবং শাহজাহান সম্ভল, দিল্লী, ফতেপুব এবং আগ্রায় কয়েকটি জাম-ই-মসজিদ (জুম্মা মসজিদ) নির্মাণ করেন। ইহাদেব মধ্যে আগ্রা ও দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ বিখ্যাত। জাহানারা বেগম আগ্রায বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এক লক্ষ লোকের নমাজের উপযোগী জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ করেন। শাহজাহান অন্তঃপুরিকাদের জন্য আগ্রায় একটি শ্বেত মর্মর গঠিত মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহাই বিখ্যাত মোতি মসজিদ। দিল্লীর লাল কেল্লাতেও এইরূপ একটি মোতি মসজিদ আছে। মসজিদটি অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ।

তাজমহল ঃ শাহজানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী তাজবেগমের সমাধি 'তাজমহল'। এই তাজমহলের স্বপ্ন দেখেন শাহজাহান, উহার পরিকল্পনা করেন ইস্‌ফানদিয়ার রুমী। ইরানীয় ওস্তাদ ইসা সিরাজী ছিলেন ইহার নির্মাণ কার্যে প্রধান স্থপতি। বাঙ্গালী বলদেও দাস ছিলেন রূপকার। বাগদাদের একজন তরুণ শিল্পী প্রস্তরের উপরে আরবী অক্ষর ক্ষোদিত করেন। দূর হইতে অক্ষরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পদল। মসৃণ শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত তাজমহলের মধ্যে যেন তাজবেগমের

লাবণ্য রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাজমহল নির্মাণ করিতে বাইশ হাজার শ্রমিকের একুশ বৎসর (১৬৩২-১৬৫৩ খ্রীঃ) লাগিয়াছিল। কেহ কেহ তাজ-মহলে ইতালীয় সূক্ষ্ম শিল্পরীতির স্পর্শ সুস্পষ্ট অনুভব করেন।

মুঘল যুগে হিন্দু স্থাপত্য ঃ আকবরের সময় হিন্দুর মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। মানসিংহ বাইশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বৃন্দাবনে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। অম্বররাজ জয়পুরে মুসলমানের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় বীরসিংহ বুন্দেলা মথুরাতে 'কেশব দেও মন্দির' নামে একটি অনুপম মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। শাহজাহান ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুর মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন এবং কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেন। আওরঙ্গজেব চিতোর, বিকানীর ও গুজরাট অঞ্চলের বহু হিন্দু মন্দির ও স্থাপত্য নিদর্শন ধ্বংস করিয়াছিলেন।

মুঘল চিত্রকলা ঃ ইসলাম ধর্মে চিত্র অঙ্কন নিষিদ্ধ হইলেও সৌন্দর্য-বিলাসী মুঘল বাদশাহগণ চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুঘলবংশের আদি বাসভূমি সমরখন্দে তৈমুরের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি নূতন চিত্ররীতির উদ্ভব হয়। মুঘলগণ হস্তলিখিত পুস্তকের মলাট ও পুস্তক বর্ণিত ঘটনার চিত্র অঙ্কন করাইয়া পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাইতেন। সুন্দর হস্তাক্ষর মুঘল বাদশাহগণ শিল্পরূপে গণ্য করিতেন। আবদুস সামাদের মুঘল মুদ্রা পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক মুঘল বাদশাহের রাজ-সভায় দরবারী কবির মত দরবারী চিত্রকরও থাকিতেন। চিত্রশালা দরবারের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। বহু দূর দেশ হইতে নিপুণ চিত্রকর দরবারে আমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইতেন। দশ্বনাথ, বসাওন প্রভৃতি ভারতীয় চিত্রকব দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন। আকবর জাতিধর্ম নির্বিশেষে গুণীর সমাদর করিতেন। আকবরের দরবারে একশত জন চিত্র-করের মধ্যে তের জন ছিলেন হিন্দু। মুঘল চিত্রকরগণ কাগজের উপর অঙ্কিত ক্ষুদ্রচিত্র (মিনিয়েচার) ও প্রাচীর চিত্র (ফ্রেস্কো) অঙ্কনে বিশেষ পার-দর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। মুঘল চিত্রের মধ্যে দরবার ও শিকারের দৃশ্যগুলি খুব বিখ্যাত। সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন, অত্যধিক মণ্ডন, বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত মুঘল চিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক সময় একজন শিল্পী পরিকল্পনা করিতেন, অন্য একজন রেখাঙ্কন করিতেন, তৃতীয় জন বর্ণানুরঞ্জন করিতেন। আবার কখনও একই চিত্রে একাধিক চিত্রকর একই চিত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ করিতেন। যে কোন লোক সুন্দর চিত্র উপহার দিয়া জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিত। হিন্দুস্থানের চিত্রকর মনোহর, হিরাতের আবুল হাসান এবং ওস্তাদ মনসুর জাহাঙ্গীরের দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন। বাদশাহ ভিন্ন আমীরদেরও চিত্রশালা ছিল। আওরঙ্গ-জেবের সময়ে রাজ-প্রাসাদের প্রাচীর-চিত্র এবং সেকেন্দ্রায় আকবরের

সমাধি-প্রাচীরের চিত্রেব উপর চুণকাম করিয়া দেওয়া হয় এবং দরবারী চিত্রকরগণ অবহেলিত হন। এই সময় চিত্রশালাব দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং মুঘল সাম্রাজ্যে চিত্রাঙ্কন পাপ বলিয়া নিন্দিত হইতে থাকে।

গঙ্গা —১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত বাঙ্গলার পটচিত্র

রাজপুত ও অন্যান্য প্রাদেশিক চিত্রকলা ঃ মুঘল দরবাবে অবহেলিত চিত্রকবগণ প্রাদেশিক আমীবদের দরবাবে এবং বাজপুত রাজন্যবর্গের সভায় আশ্রয় লাভ করেন। বাজপুত রাজন্যবর্গেব পৃষ্ঠপোষকতায় ভাবতীয় চিত্রে নূতন একটি ধাবাব উন্মেষ হয়। জয়পুবেব চিত্রকলা অপূর্ব মণ্ডনেব জন্য খ্যাতিলাভ কবিয়াছিল। কাংড়া অঞ্চলের বাজপুত চিত্রে ভাবেব গভীরতা অধিক। ভাবতীন বাগ-বাগিনীব চিত্রগুলি ইহাব উদাহবণ। কাংড়া (কাশ্মীর) অঞ্চলেব কৃষ্ণলীলা চিত্র এবং বাঙ্গলার পটচিত্র পববর্তিকালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্বর্ণখচিত ও চিত্রিত আববণ (মলাট) ও অভ্যন্তরে চিত্রাঙ্কনেব বিচিত্র মণ্ডনধাবা মুঘল যুগেব পাণ্ডুলিপিগুলিকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করিয়াছে।

প্রাদেশিক সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থ ঃ মুঘল বাজপরিবারে অনেকেই সাহিত্যবসিক, সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজ দববাবে কবি ও কাব্যের বিশেষ সমাবেশ ছিল। গ্রন্থ বচনা, গ্রন্থাগাব স্থাপন, পুস্তক অনুবাদ ও অনুলিখনে মুঘল রাজবংশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তৈমুব, বাবব এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী (তুজুক), হুমায়ূনেব ভ্রাতা কামবাণের কবিতা সংগ্রহ (দিওয়ান), দারা শিকোর উপনিষদেব অনুবাদ (সব-ই-আসবার) মুঘল রাজবংশের চিরস্মরণীয় কীর্তি। মুঘল অন্তঃপুরিকাগণ কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। হুমায়ূনের ভগ্নী গুলবদন বিখ্যাত ইতিহাস 'হুমায়ুননামা' রচনা করেন। জাহাঙ্গীরের মহিষী নূরজাহান,

শাহ্‌জাহানের কন্যা জাহানারা এবং আওরঙ্গজেবের কন্যা জেব্‌উন্নিসা ফার্সী কবিতা রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। মুঘলগে অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, যোগবাশিষ্ট, নলদময়ন্তী উপাখ্যান ও বহু চিকিৎসা গ্রন্থ ফার্সীতে অনূদিত হয়। এই সময়ে আবুল ফজল, নিজামউদ্দীন বক্সী, বদাউনী, আবদুল হামিদ লাহোরী এবং কাশিম ফেরিস্তা ইতিহাস রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুঘল যুগের হিন্দু ঐতিহাসিক সুজন রায় ক্ষেত্রী, ঈশ্বরদাস নগর, ভীম সেন প্রভৃতির গ্রন্থ বিখ্যাত। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ হইলেও মুহম্মদ হাসিম 'কাফি খান' ছদ্মনামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন।

আবুল ফজল

বাংলা ভাষা: প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার মুঘলযুগের সর্বমুখী উৎকর্ষের নিদর্শন। মুঘল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়; বাংলায় মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস, চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মুকুন্দরাম, অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র মুঘলযুগেই আবির্ভূত হন। মুঘলযুগে গোবিন্দদাসের করচা এবং জ্ঞানদাসের পদাবলী বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এই যুগেরই রচনা। বাংলা মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী রচনা মুঘলযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, ক্ষেমানন্দের বেহুলা-লখিন্দরের পাঁচালী এবং দ্বিজ জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী মুঘলযুগে রচিত হয়। মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা এবং ব্যাঘ্র দেবতা এই যুগেই মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। বাউল সাধকদের রচনা মুঘল-যুগের বাংলা সংগীত-সাহিত্যকে অপরূপ সুষমামণ্ডিত করিয়াছে। বাউল সংগীতের মধ্যে রহিয়াছে হিন্দু-মুসলিম বাঙালী মনের অপূর্ব আধ্যাত্মিক সমন্বয়, বাঙালী মনের অতীন্দ্রিয় জগৎ প্রীতির সন্ধান।

তুলসীদাস

হিন্দী ভাষা: মুঘলযুগে তুলসীদাস, মীরাবাঈ, সুরদাস, নরহরি, ভূষণ প্রভৃতি লেখকের লেখনী-স্পর্শে হিন্দীভাষা ও কাব্য সাহিত্য এক অপূর্ব রূপ-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তুলসীদাসের রামচরিত-মানস, মীরাবাঈ-এর ভজন, সুরদাসের দোঁহা পৃথিবীর যে কোন কোমল-কান্ত রচনায় শ্রেষ্ঠ অবদানের সহিত তুলনীয়। অনেক মুসলমান হিন্দী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আবদুর রহিম খান-ই-খানান, দরিয়া শাহ্ এবং ইয়ারা শাহ্ অতি মধুর হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছেন। মুঘল পরিবারের মধ্যে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহন এবং দারা শিকো হিন্দী পদ রচনা করিয়াছেন। এই যুগে মানসিংহ, বীরবল, টোডরমল, জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দরবারে হিন্দু কবিগণ 'মহাপাত্র', 'কবিপ্রিয়' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

মীরাবাঈ

মারাঠী ভাষা : সুলতানী আমল হইতে মহারাষ্ট্র দেশে একটা ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি মহাজন লৌকিক ভাষায় ভক্তিমূলক পদ রচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব ধর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। শিবাজীব গুরু রামদাস সপ্তদশ শতাব্দীতে 'দাসবোধ' নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া মারাঠা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। এই ধর্ম বিষয়ক রচনাকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল।

মুঘলযুগে সংগীত : ইসলামে সংগীত নিষিদ্ধ হইলেও মুঘল বাদশাহ-গণের সংগীতপ্রীতি প্রবাদস্বরূপ ছিল। আকবর স্বয়ং উচ্চাঙ্গের সংগীতরসিক ছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে তানসেন প্রমুখ ছত্রিশ জন সংগীতজ্ঞের উল্লেখ আছে। আকবর স্বয়ং কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এবং কয়েকটি সুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের সংগীতে মুসলমানী প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

১। বিদেশীর দৃষ্টিতে মুঘল যুগের চিত্র অঙ্কন কর।

(Give a description of Mughal India in the light of foreign accounts)

২। মুঘল যুগে ভারতীয় সমাজ, রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটি আলেখ্য রচনা কর।

(Write a short description of Indian society, Indian habits and ways of Indian life in the Mughal period.)

৩। মুঘল যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার মান বর্ণনা কর।

(Give an idea of trade, commerce, industry, price of commodities and standard of Indian life in the Mughal period)

৪। মুঘল শিল্পকলা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(Give a description of Mughal art and architecture.)

৫। মুঘল যুগে হিন্দী ও বাংলা ভাষার উন্নতি উল্লেখ করিয়া প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বর্ণনা কর।

(Write an account of the growth of provincial literature of India during the Mughal period with special reference to Bengali and Hindi.)

৬। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ : (ক) বার্নিয়ে (খ) রাল্‌ফ ফিচ (গ) ফতেপুর সিক্রী (ঘ) ময়ূর সিংহাসন (ঙ) তুলসীদাস (চ) মীরাবাঈ।

(Write short notes on : (a) Barnier, (b) Ralf Fitch, (c) Fatepur Sikri (d) Peacock-throne (e) Tulsidas (f) Mirabai.)

সমাপ্ত

মধ্যযুগ (১২০৬-১৭৫৭ খ্রীঃ)

সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ)

দিল্লীতে দাস-রাজত্ব (১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ)

খ্রীষ্টাব্দ	
আনুমানিক ১২০৬	দাস-বংশীয় সুলতান কুতুবউদ্দীনের সিংহাসনারোহণ।
১২১০	কুতুবউদ্দীনের মৃত্যু; আরাম শাহের সিংহাসনারোহণ ও সিংহাসনচ্যুতি; ইলতুৎমিসের সিংহাসনারোহণ।
১২২১	চেঙ্গিস খানের অধীনে মোঙ্গল আক্রমণ।
১২৩৬	রজিয়ার সিংহাসনারোহণ।
১২৪০	রজিয়ার সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যা।
১২৪৬	নাসিরউদ্দীন মামুদ।
১২৬৬	ঘিয়াসউদ্দীন বলবন।
১২৭৯	বঙ্গদেশে তুঘ্রিল খানের বিদ্রোহ।
১২৮৭	ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যু।

খলজী বংশ (১২৯০—১৩২০ খ্রীঃ)

আনুমানিক ১২৯০	দাস-বংশের অবসান; জালালউদ্দীন খলজীর সিংহাসনারোহণ।
১২৯৪	আলাউদ্দীন খলজীর দেবগিরি লুণ্ঠন।
১২৯৬	আলাউদ্দীন খলজীর সিংহাসন অধিকার।
১২৯৭	আলাউদ্দীন খলজীর গুজরাট জয়।
১৩০১	রণথম্ভর জয়।
১৩০২-১৩০৩	চিতোর জয়।
১৩০৫	মালব, উজ্জয়িনী, ধারা প্রভৃতি রাজ্য জয়।
১৩০৬-১৩০৮	মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য বিজয়।
১৩১৬	আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যু।

তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩ খ্রীঃ)

আনুমানিক ১৩২০	খলজী বংশের অবসান।
১৩২৫	মুহম্মদ বিন তুঘলক।
১৩২৭	দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর।
১৩২৯	তাম্র-মুদ্রার প্রচলন।

খ্রীষ্টাব্দ

আনুমানিক ১৩৩৬ বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা।

১৩৩৯ বাঙ্গলায় স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠা।

১৩৪৫ বাঙ্গলায় ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা।

১৩৪৭ দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী রাজ্য স্থাপন।

১৩৫১ মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু ; ফিরুজ শাহের সিংহাসনারোহণ।

১৩৫৩-৫৯ ফিরুজ শাহের বঙ্গদেশে অভিযান।

১৩৮৮ ফিরুজের মৃত্যু।

১৩৯৮ তৈমুরের ভারত আক্রমণ।

১৪১৪ বাঙ্গলায় রাজা গণেশ।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪—১৪৫১ খ্রীঃ)

১৪১৪ খিজির খানের সিংহাসনারোহণ।

১৪৫১ সৈয়দ বংশের বিলোপ।

লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬ খ্রীঃ)

১৪৫১ বাহ্‌লুল লোদীর দিল্লীর সিংহাসনারোহণ।

১৪৬৯ গুরু নানকের জন্ম।

১৪৭২ শের খানের জন্ম।

১৪৮৬ বাঙ্গলায় হাবসী দাসদের আধিপত্য।

১৪৮৯ সিকন্দর লোদী। বিজাপুরে আদিলশাহী বংশ স্থাপন

১৪৯০ আহম্মদনগরে স্বাধীন নিজামশাহী বংশ স্থাপন।

১৪৯৩ বাঙ্গলার রাজা হুসেন শাহ।

১৪৯৭-৯৮ ভাস্কো-ডা-গামার জলপথে ভারতে আগমন।

১৫০৯ পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক।

১৫০৯ বিজয়নগরে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্ব।

১৫১০ পর্তুগীজের গোয়া অধিকার।

১৫১২-১৮ গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী বংশের স্বাধীনতা লাভ।

১৫১৭ ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যারম্ভ।

মুঘল রাজত্ব (১৫২৬—১৭৫৭ খ্রীঃ)

১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ। বাবর কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন।

১৫২৭ খানুয়ার যুদ্ধ ; রাণা সংগ্রামসিংহের পরাজয়।

আনুমানিক ১৫২৯ গোগরার যুদ্ধ ; পূর্ব-ভারতে মুঘল রাজ্য প্রতিষ্টা।
১৫৩০ কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যু। বাবরের মৃত্যু, হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণ।
১৫৩৮ শের খানের বাঙ্গলা বিজয়।
১৫৩৯ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়। শের শাহ দিল্লীর সম্রাট।
১৫৪০ বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়।
১৫৪২ অমরকোটে আকবরের জন্ম।
১৫৫৫ সরহিন্দের যুদ্ধ ; হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন অধিকার।
১৫৫৬ হুমায়ুনের মৃত্যু। আকবরের সিংহাসন লাভ। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, হিমুর পরাজয়।
১৫৬২ যোধবাঈ ও আকবরের বিবাহ।
১৫৬৪ জিজিয়া কর রহিত ; গণ্ডোয়ানা বিজয়।
১৫৬৫ তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের পতন।
১৫৬৮ আকবরের চিতোর অধিকার।
১৫৭১ ফতেপুর সিক্রী নগরীর প্রতিষ্ঠা।
১৫৭২ আকবর কর্তৃক গুজরাট বিজয়।
১৫৭৬ বাঙ্গলার সুলতান দাউদ খানের মৃত্যু। আকবর কর্তৃক বাঙ্গলা বিজয়। হলদিঘাটের যুদ্ধ।
১৫৮২ দীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রবর্তন।
১৫৯৭ রাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যু।
১৬০০ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন।
১৬০৫ আকবরের মৃত্যু। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ।
১৬০৬ শিখগুরু অর্জুনের হত্যা।
১৬১২ সুরাটে প্রথম ইংরাজ কুঠি নির্মাণ।
১৬১৫ মুঘল সম্রাটের নিকট মেবারের বশ্যতা স্বীকার। স্যার টমাস রোর ভারতে আগমন।
১৬২২ শাহজাদা খুররামের বিদ্রোহ।
১৬২৬ মহবৎ খানের বিদ্রোহ।
১৬২৭ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। শিবাজীর জন্ম (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ)
১৬২৮ শাহজাহানের সিংহাসন লাভ।
১৬৩১ মমতাজের মৃত্যু।
১৬৩২ মুঘলগণের বিজাপুর অভিযান।
১৬৩৩ আহম্মদনগর রাজবংশের লোপ।
১৬৩৪ বাঙ্গলায় ইংরাজদের বাণিজ্যাধিকার লাভ।
১৬৩৬ আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত। শাহজীর বিজাপুরে কর্ম গ্রহণ।
১৬৩৯ মাদ্রাজে ইংরাজের দুর্গ স্থাপন।

খ্রীষ্টাব্দ	
আনুমানিক ১৬৪৬	শিবাজী তারণ দুর্গ অধিকার।
১৬৫১	হুগলীতে ইংরাজ কুঠি আরম্ভ।
১৬৫৩	ওলন্দাজদের চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপন।
১৬৫৬	শিবাজীর জাউলি রাজ্য অধিকার।
১৬৫৭	সিংহাসনের জন্য শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিরোধ।
১৬৫৮	ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধ। আওরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক।
১৬৫৯	দারা শিকো নিহত। শাহজাহান ও মুরাদ অবরুদ্ধ। আফজল খানের হত্যা।
১৬৬০	শুজার আরাকানে পলায়ন। মীরজুমলার বাঙ্গলা অধিকার।
১৬৬১	ইংরাজগণের বোম্বাই লাভ। মুরাদ নিহত।
১৬৬৩	শায়েস্তা খান বাঙ্গলার সুবাদার।
১৬৬৪	শিবাজীর সুরাট লুণ্ঠন ও রাজা উপাধি ধারণ।
১৬৬৬	শাহজাহানের মৃত্যু। শিবাজী আগ্রায় বন্দী। আগ্রা হইতে পলায়ন।
১৬৬৮	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোম্বাই লাভ।
১৬৭৪	শিবাজীর রাজ্যাভিষেক।
১৬৭৫	আওরঙ্গজেব কর্তৃক শিখগুরু তেগবাহাদুর নিহত।
১৬৭৮	যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু। আওরঙ্গজেবের মাড়ওয়ার অধিকার।
১৬৭৯	জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন।
১৬৮০	শিবাজীর মৃত্যু।
১৬৮১	আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে গমন।
১৬৮৬-৮৭	বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতন।
১৬৮৯	শম্ভুজীর প্রাণদণ্ড। রাজারামের রাজ্যাভিষেক।
১৬৯০	জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা।
১৬৯৮	ইংরাজগণের সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারি লাভ।
১৭০০	রাজারামের মৃত্যু, তারাবাঈ কর্তৃক মারাঠাশক্তি পরিচালনা।
১৭০৭	আওরঙ্গজেবের মৃত্যু।
১৭০৮	শাহুর মুক্তিলাভ ও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু।
১৭১৪	বালাজী বিশ্বনাথ পেশোয়া।
১৭১৬	শিখনায়ক বান্দা নিহত।
১৭২০	বাজীরাও পেশোয়া।
১৭৩৯	নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ।
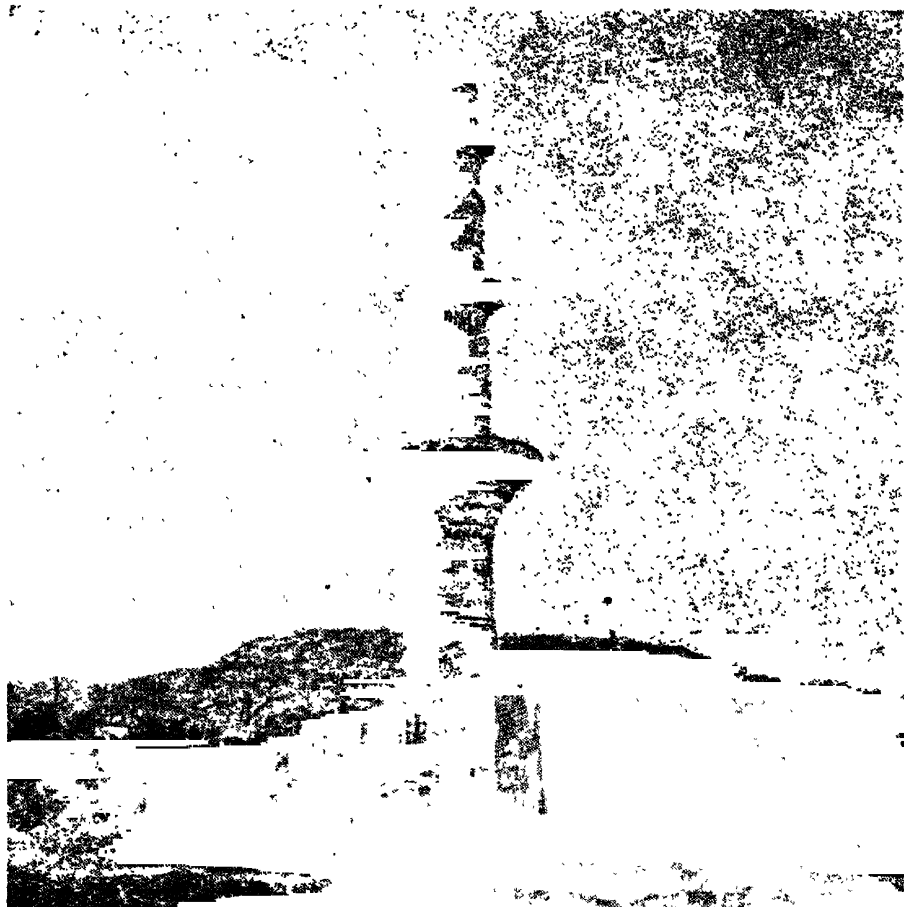
চাঁদমিনার—দৌলতাবাদ

জামা-ই-মসজিদ—মহাটীর

বাহমন শাহের সমাধি—গুলবর্গা।

ষাট-গুম্বজ মসজিদ—বাগেরহাট (খুলনা)

ফিরুজশাহ তুঘলকের সমাধি
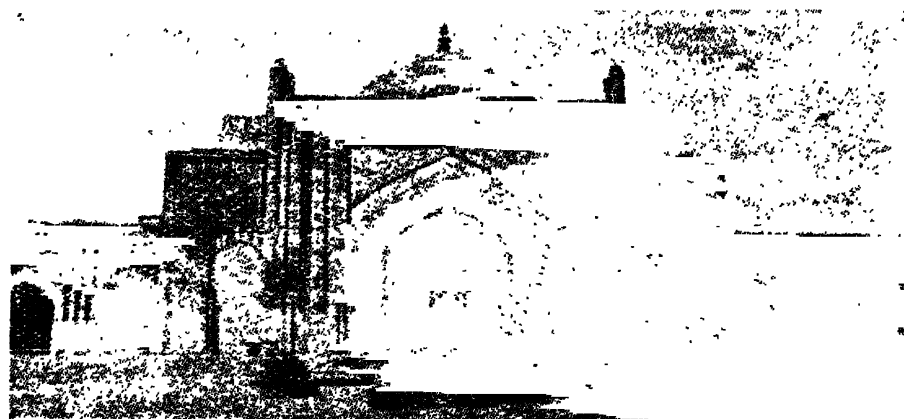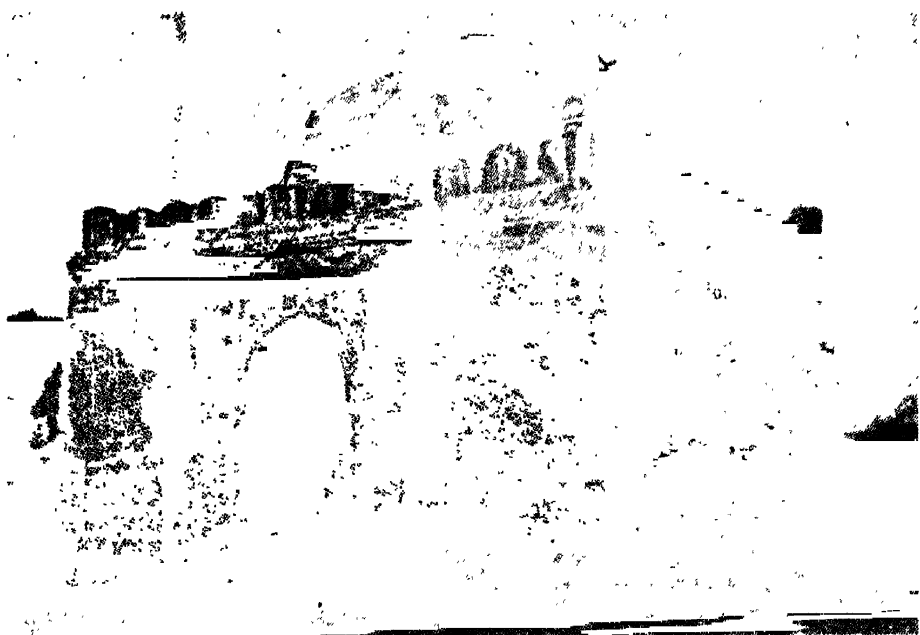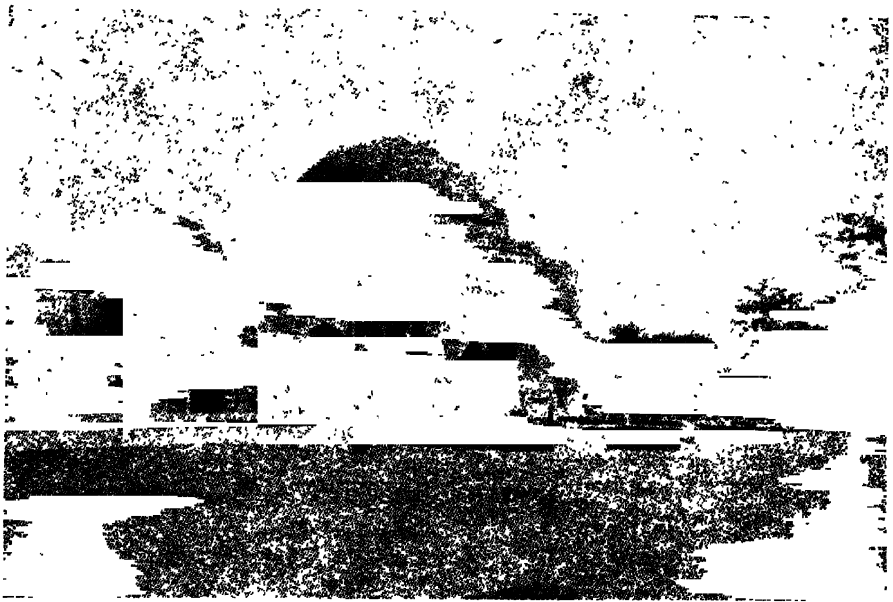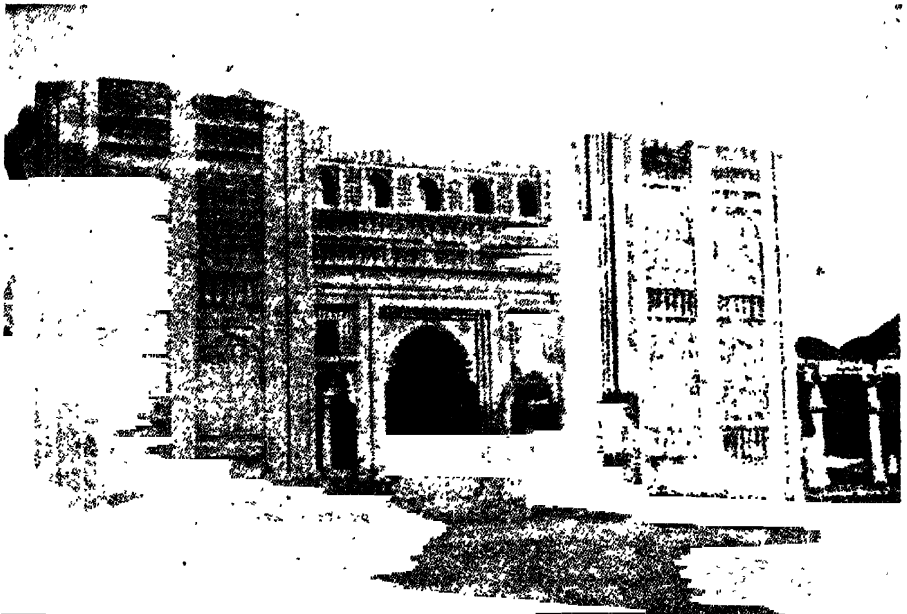
রঙমহলের (দিল্লীদুর্গ) অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য
(Scales of Justice)
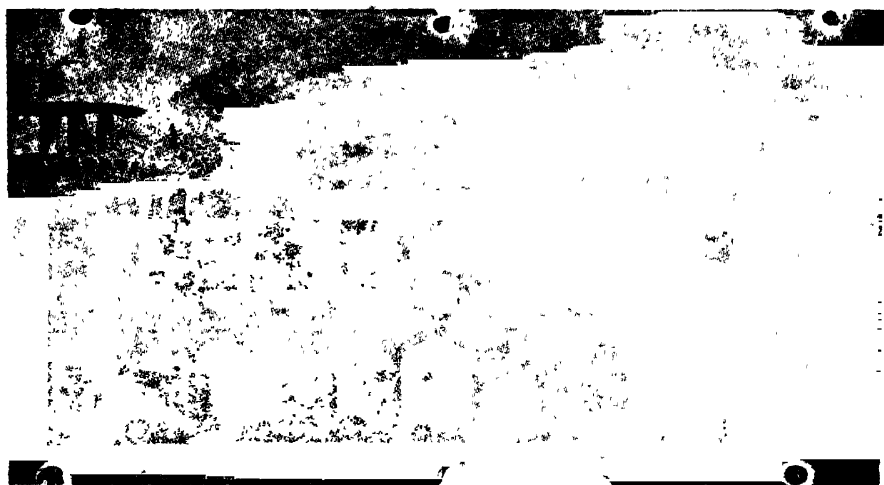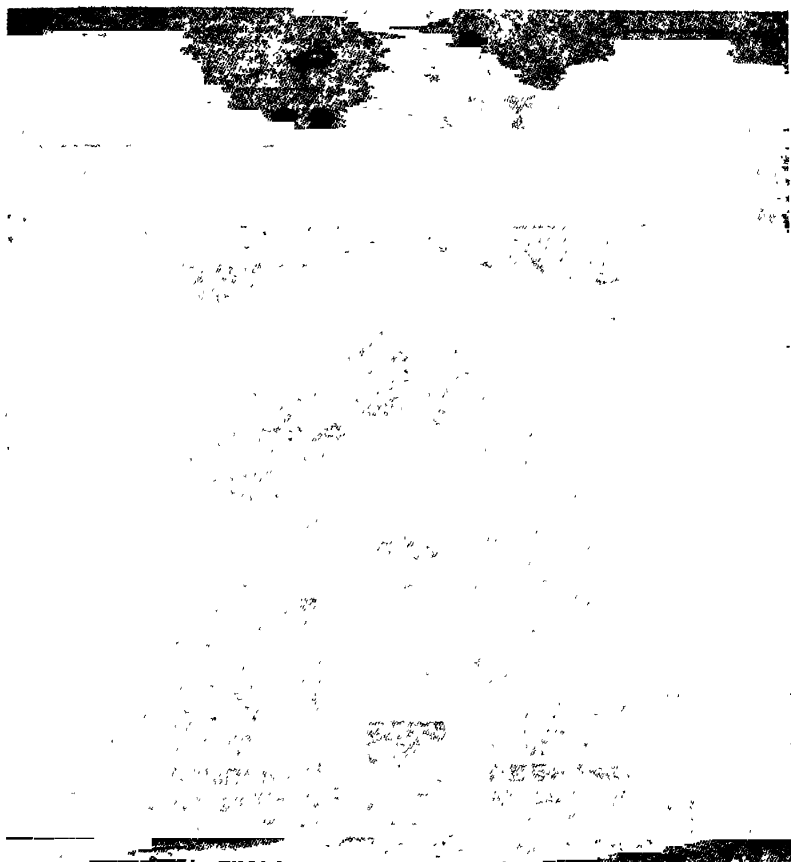
আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রায় প্রস্তর তোরণের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য
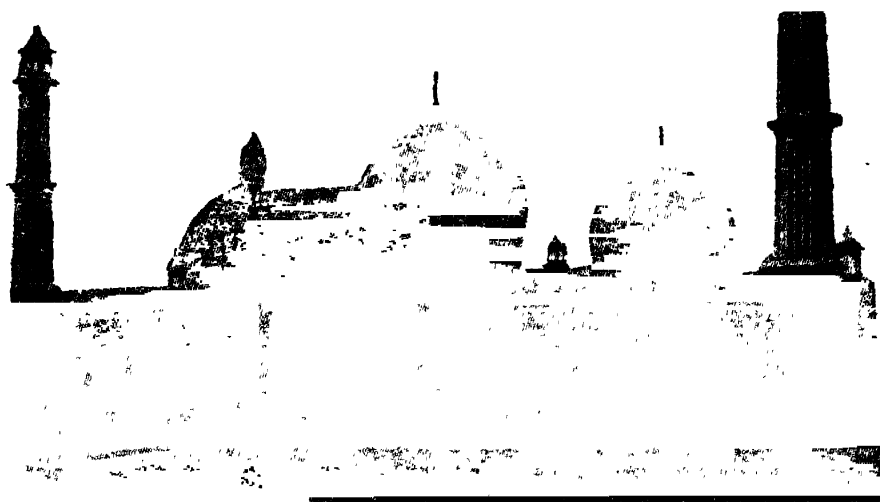
তাজমহল—আগ্রা
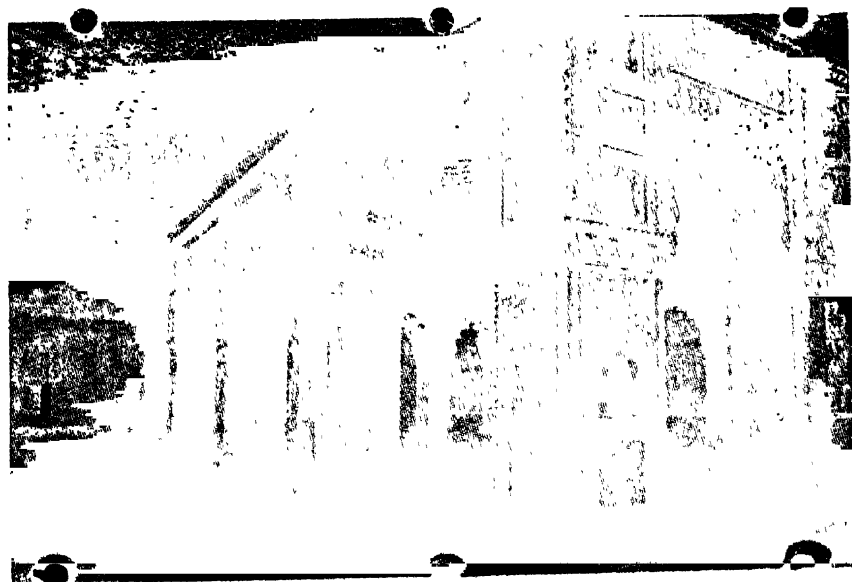
দিওয়ান-ই-খাস—লালকেল্লা
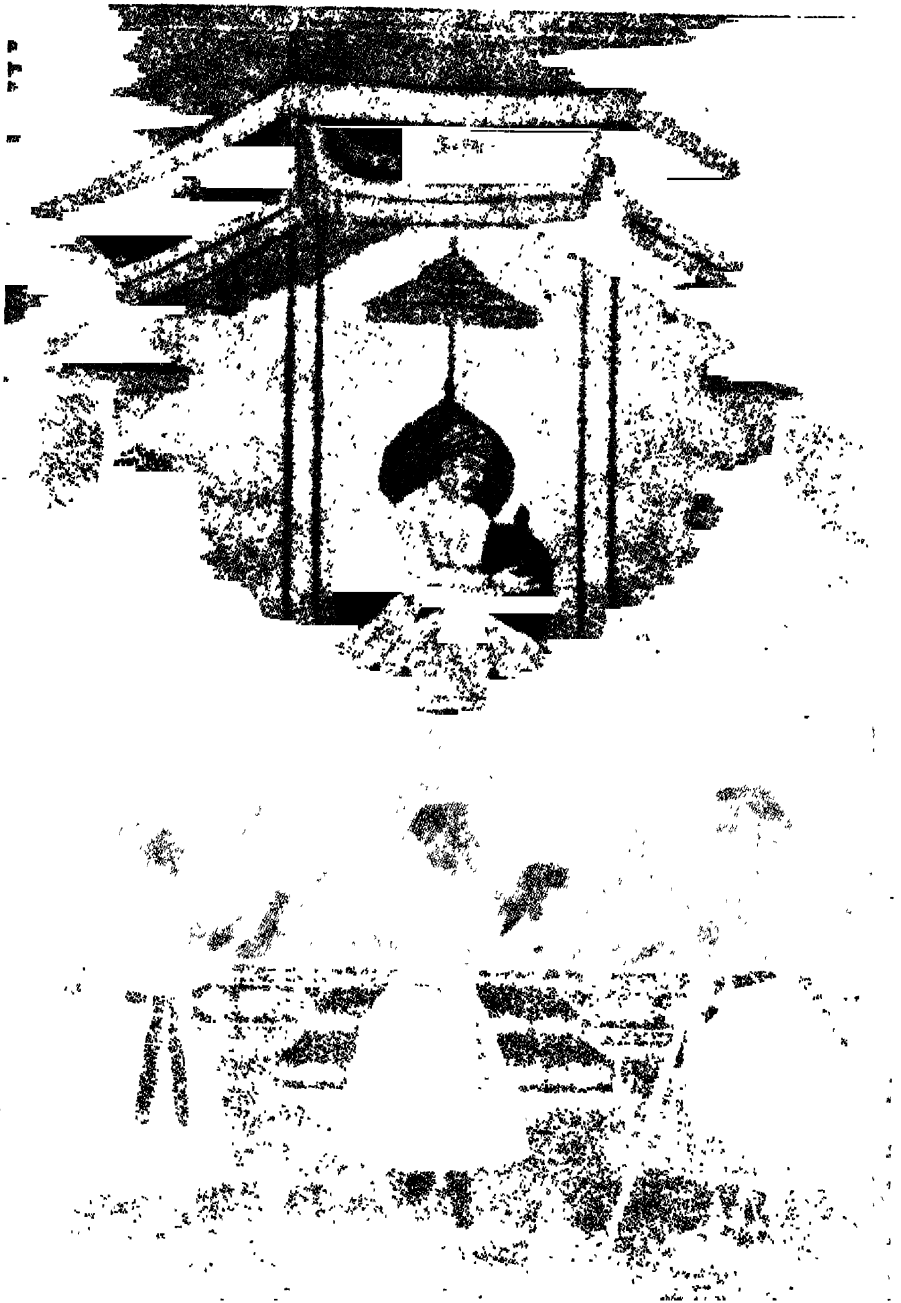
ইতমাদ্‌উদ্দৌলা, আসফখানের সহিত বাদশাহ আকবর,
জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান
(A. Chester Beatty Collection, London)

সম্রাট শাহজাহানের দরবারে (দিওয়ান-ই-আম) পারসিক দূতগণের আগমন

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত চিত্র

গৃহপালিত হরিণ—রাজপুত (কাঙাড়া) চিত্র, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত

মুঘল চিত্রকলা—আগ্রাদুর্গ (১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রিত)